নৈরাজ্যের নন্দন : হাংরি ‘প্রজন্মের’ সাহিত্য

গবেষক

অম্লান দেব

পি.এইচ.ডি. রেজিস্ট্রেশন নং – F.I. No. 239/ 13/ Arts

পি.এইচ.ডি (কলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক পবিত্র সরকার

প্রাক্তন অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১

Certified that the Thesis entitled

নৈরাজ্যের নন্দন : হাংরি 'প্রজন্মের' সাহিত্য Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Prof. Pabitra Sarkar, Retd. Professor, Bengali Department, Jadavpur University and that neither the Thesis nor any part of it has been submitted before for any degree ore diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Pabitra Sarkar
29.07.2021

Amlan Deb
29.07.2021

Supervisor : Prof. Pabitra Sarkar
Dated : 29.07.2021

Candidate : Amlan Deb
Dated : 29.07.2021

ভূমিকা

বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের যৌনতা বিষয়ে এম.ফিল স্তরে গবেষণার সময়ে আমি প্রথম হাংরি প্রজন্মের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হই। ক্রমশ বিষয়টি অভিনবত্বের দিক থেকে আমার কাছে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে এবং এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই পি.এইচ.ডি গবেষণার কাজ শুরু করি। ছয়ের দশকে বাংলায় সাহিত্যপাঠের এবং সাহিত্যরচনার যাবতীয় নিগড়কে ধূলিসাৎ করে হাংরি প্রজন্মের সাহিত্যিকরা নিয়ে এসেছিলেন বিকল্প প্রস্তাব। এই প্রজন্মের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা এবং বিতর্ক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমাট বেঁধেছে বাঙালি চেতনায়। ক্রমশ সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। সম্পূর্ণ গবেষণার কাজটিতে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বিদগ্ধ অধ্যাপক পবিত্র সরকারকে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। প্রত্যেকটি ভুল সংশোধন করে, প্রত্যেকটি সংশয় দূর করে তিনি আমায় সমৃদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের কাছে আমি যে সাহায্য পেয়েছি তা স্মরণ করা কর্তব্য। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার ছাড়াও, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি, নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে অপরিসীম সহযোগিতা পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিকদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা। সকলের আন্তরিক সাহায্য ছাড়া কাজটি সম্পূর্ণ হত না। যেটুকু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল, তার দায় একান্তই আমার এবং যেটুকু ইতিবাচকতা, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব উল্লিখিত মানুষগুলির।

ধন্যবাদান্তে,

জুলাই, ২০২১

অম্লান দেব
গবেষক
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

- **প্রস্তাবনা** **১ – ৪**
- **প্রথম অধ্যায়: নৈরাজ্য : ধারণা, ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতা** **৫ – ৪২**
  - ১. 'নৈরাজ্য' : ধারণা, ইতিহাস ৬ – ৩১
    - ১.১. চিন : তাও-এর পথ ৭
    - ১.২. উইলিয়াম গডউইন ১১
    - ১.৩. পিয়ের জোসেফ প্রুদঁ ১৪
    - ১.৪ ম্যাক্স স্টার্নার ১৮
    - ১.৫ মিখাইল বাকুনিন ২৩
    - ১.৬ পিটার ক্রপটকিন ২৯
  - ২. বাংলা সাহিত্যে নৈরাজ্যের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা ৩২ – ৪০
- **দ্বিতীয় অধ্যায়: নন্দনতত্ত্ব : ধারণা, ক্রমবিবর্তন এবং চর্চার ইতিহাস** **৪৩ – ৮২**
  - ১. নন্দনতত্ত্ব : ধারণা, ক্রমবিবর্তন ৪৪ – ৫০
  - ২. নন্দনতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস ৫০ – ৭৮
    - ২.১. পাশ্চাত্য ধারা ৫০
    - ২.২. প্রাচ্য ধারা ৬৫
- **তৃতীয় অধ্যায়: হাংরি জেনারেশন : ইতিহাস ও সাহিত্য** **৮৩ – ২১৪**
  - ১ ইতিহাস ৮৪ – ১৫৬
    - ১.১. শুরুর কথা ৮৪
    - ১.২. স্রষ্টা বিতর্ক ৯৬
    - ১.৩. প্রতিক্রিয়া ১০৬
    - ১.৪. মুখোশের মজা ১১৮
    - ১.৫. হাংরি চিঠি ১২৫
    - ১.৬. হাংরি মামলা ১৪৫
  - ২. সাহিত্য ১৫৭ –২০৮
    - ২.১. শৈলেশ্বর ঘোষ ১৫৭
    - ২.২. মলয় রায়চৌধুরী ১৬৪
    - ২.৩. ফাল্গুনী রায় ১৭০
    - ২.৪. অরুণেশ ঘোষ ১৭৬
    - ২.৫. প্রদীপ চৌধুরী ১৮২
    - ২.৬. বাসুদেব দাসগুপ্ত ১৮৮
    - ২.৭. সুভাষ ঘোষ ১৯৬
    - ২.৮. সুবিমল বসাক ২০২
- **চতুর্থ অধ্যায়: হাংরি জেনারেশন : নৈরাজ্যের নন্দন** **২১৫ – ২৪৭**
- **পঞ্চম অধ্যায়: হাংরি জেনারেশন আন্দোলন : উত্তরকালে প্রভাব** **২৪৮ – ২৮৩**
- **উপসংহার** **২৮৪ – ২৮৫**
- **গ্রন্থপঞ্জি** **২৮৬ – ২৯৩**

প্রস্তাবনা

১৯৬১-'৬২ সাল নাগাদ শুরু হওয়া হাংরি জেনারেশন আন্দোলন আমাদের গবেষণাপত্রের মূল কেন্দ্র। বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ আন্দোলনটি এবং এই আন্দোলনের ফলে তৈরি হওয়া একাধিক সাহিত্যিক নিদর্শনগুলোকে সামনে রেখে এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে অথবা এদের নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হিসেবে এই গবেষণাপত্রে আমরা নৈরাজ্যকে চিহ্নিত করতে চেয়েছি। এর আগে পৃথকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে কিংবা সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ভাবে নৈরাজ্য সম্পর্কে আলোচনা হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষত এই সাহিত্য আন্দোলনটির প্রসঙ্গে নৈরাজ্যের সম্পর্কের বিষয়ে কোনো আলোচনার উদাহরণ নেই। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যতম কবি ও গদ্যকার মলয় রায়চৌধুরীর হাংরি আন্দোলনের সমসময়ে লেখা কবিতা নিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি করেছেন বিষ্ণুচন্দ্র দে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. করেছেন স্বাতী ব্যানার্জী। হাংরি জেনারেশনের ইতিহাস ও সাহিত্য নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করেছেন উদয়শঙ্কর বর্মা। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওশিয়ানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করেছেন মার্টিনা রেজা। পরবর্তীকালে যার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও এই আন্দোলন হয়ে যাওয়ার পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে একাধিক সংকলন ও সম্পাদিত গ্রন্থ। নৈরাজ্য সম্পর্কে সাধারণভাবে আমাদের একটি বিরোধমূলক ধারণা থাকার জন্যই হয়তো এই সমস্ত গবেষণা ও গ্রন্থ হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের নৈরাজ্যমূলক প্রবণতা বিষয়ে নীরব। কিন্তু এই আন্দোলন নৈরাজ্য বিষয়ক দার্শনিক চর্চার পাশাপাশি একটি অন্যতম সাহিত্যিক নৈরাজ্যের উদাহরণ হতে পারে। এই লক্ষ্যেই আমাদের গবেষণাপত্র এগিয়েছে।

‘হাংরি’ শব্দটির অর্থ ‘ক্ষুধা’ অথবা ‘ক্ষুৎকাতর’ অথবা ‘ক্ষুধার্ত’। এই নিয়ে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট অনেকেই বিভিন্ন মত ও তত্ত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের বিচারে এর পাশাপাশি ‘জেনারেশন’ শব্দটিও গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে, বিশেষত ছয় এবং সাতের দশকে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের একটা গোটা প্রজন্ম যেভাবে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি এবং সিনেমায় প্রথাবিরুদ্ধ কাজ, প্রতিষ্ঠানকে না মানার এবং নতুন কিছু কথা বলে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন তাতে আমাদের পর্যবেক্ষণ, যে একটা গোটা প্রজন্মই আসলে নতুন সৃষ্টির ক্ষুধা নিয়ে এই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল। তাই শিরোনামে আমরা ‘প্রজন্ম’ শব্দটিকে ব্যবহার করেছি। বাংলা সাহিত্য পড়ার যে তথাকথিত নান্দনিক বোধ বা সৌন্দর্যচেতনা, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই সাহিত্য আন্দোলন কোনো নতুন সৌন্দর্যবোধের ধারণায় পৌঁছতে পারল কিনা, আমাদের গবেষণার এই মূল লক্ষ্য। সাধারণভাবে, নন্দন বা সৌন্দর্যকে আমরা যে অর্থে বুঝে এসেছি, সাহিত্যপাঠের অভ্যাস আমাদের যে সৌন্দর্যের সন্ধান দিয়েছে, ‘হাংরি জেনারেশন আন্দোলন’ তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের এই সৌন্দর্যের ধারণাকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল। তাই নৈরাজ্যের শব্দ শেষ পর্যন্ত কোনো সৌন্দর্যতত্ত্বে পৌঁছতে পারল কিনা এই গবেষণাপত্র সেই প্রশ্নকে ঘিরেই রচিত।

আলোচ্য গবেষণাকর্মের প্রস্তাবিত প্রথম অধ্যায় ‘নৈরাজ্য : ধারণা, ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতা’। এই অধ্যায়ের দুটি উপবিভাগ — প্রথম ভাগে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি নৈরাজ্য সম্পর্কিত দার্শনিক ধারণার কিছু অংশ এবং গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু নৈরাজ্যের ধারণার প্রবক্তার কথা। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা নৈরাজ্যের ধারণাকে সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা সাহত্যিকভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন তাঁদের ধারণাকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি যে ‘নৈরাজ্য’ শব্দটি কেবলমাত্র বিশৃঙ্খলা অথবা হিংসাত্মক কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। বরং নৈরাজ্য একটি বিকল্প, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষিত শর্ত। দ্বিতীয় উপবিভাগে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি ১৯৬১-’৬২-র ‘হাংরি জেনারেশন

আন্দোলন'-এর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত নৈরাজ্যের আর কী কী দৃষ্টান্তকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

আমাদের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় অধ্যায় 'নন্দনতত্ত্ব : ধারণা, ক্রমবিবর্তন ও চর্চার ধারা'। নন্দনতত্ত্ব নিয়ে সাধারণভাবে যে ধারণা প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের পাঠকৃতির অভ্যাসে আছে, তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এই অধ্যায়ের প্রথম উপবিভাগে আমরা পেশ করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় উপবিভাগে পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যে নন্দনতত্ত্ব চর্চার ধারা বিশদে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'হাংরি জেনারেশন : ইতিহাস ও সাহিত্য'। এই অধ্যায়টিতেও দুটি উপবিভাগ — প্রথমটিতে আমরা হাংরি জেনারেশনের ইতিহাসের রূপরেখা তৈরি করছি। স্বাভাবিকভাবেই আজ থেকে কয়েক দশক আগে ঘটে যাওয়া এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক সূত্রগুলিকে হাজির করার জন্য এই আন্দোলন সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, ইস্তেহার, মামলা-মোকদ্দমা এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক মানুষের মতামত সংক্রান্ত পারস্পরিক বিতর্ক এই উপবিভাগটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যের নমুনা হিসেবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক মানুষের কবিতা ও গদ্যের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা হাজির করার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায় 'হাংরি জেনারেশন : নৈরাজ্যের নন্দন'। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে নৈরাজ্য, নন্দনতত্ত্ব এবং হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য আমরা বুঝবার চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা অনুসন্ধান করেছি যে শেষ পর্যন্ত হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য কর্মগুলি নৈরাজ্যময় কোনো সৌন্দর্য তৈরি করতে পারল কি? চিৎকৃত অসুন্দরের কোন সৌন্দর্য সাহিত্যের ইতিহাসে বা ধারায় হাংরি জেনারেশন উপজাত কবিতা বা গদ্যগুলো রেখে গেল?

আমাদের প্রস্তাবিত পঞ্চম তথা শেষ অধ্যায় ‘হাংরি জেনারেশন আন্দোলন : উত্তরকালে প্রভাব’। ১৯৬১-’৬২-র পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলন ঘিরে যে মামলা-মোকদ্দমা ও উত্তেজনা তৈরি হয়, তাতে দেশে-বিদেশে এই আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়েই পর পর বাংলা সাহিত্যে একাধিক গল্প ও কবিতা বা গদ্য আন্দোলনকে আমরা সূচিত হতে দেখি যেখানে তথাকথিত নৈরাজ্যময় প্রবণতা, নতুন কথা বলার অথবা আবহমান ধারণাকে ভেঙে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিক তৈরি করার প্রেরণা জুগিয়েছিল।

প্রথম অধ্যায়

নৈরাজ্য : ধারণা, ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতা

১. নৈরাজ্যের ধারণা, ইতিহাস

'নৈরাজ্য' শব্দটির উৎস সন্ধান করলে দেখা যায় ইংরাজি 'anarchy' শব্দটির উদ্ভব গ্রিক 'anarchos' থেকে যার অর্থ এককথায় 'without a ruler'।[১] মধ্যযুগে ল্যাটিন ভাষাতে এই শব্দটির রূপ 'anarchia'। গ্রিক পরিভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল 'archos' অর্থে প্রথমত 'military leader' পরবর্তীতে 'ruler' এবং an অর্থাৎ 'without'।[২] সুতরাং নৈরাজ্য বা 'anarchy' নিজের শরীরেই without any leader বা ruler অর্থাৎ শাসকহীন বা শাসনহীন এক সামাজিক অবস্থার ইতিহাস বহন করছে।

শুরু থেকেই 'anarchy' বা 'নৈরাজ্য' শব্দটির সঙ্গে সদর্থক ও নেতিবাচক দুই ধারণাই ক্রমপ্রসারিত হয়েছে। নেতিবাচক হল এর বিশৃঙ্খলা ও অমান্যতার দিক আর সদর্থক হল এর শাসকহীন বা শাসনের প্রয়োজনহীন অবস্থার ধারণা। জনপ্রিয় কল্পনায় বা দৈনন্দিন ব্যবহারে যদিও এর নেতিবাচক দিকটিই প্রচারিত হয়েছে বেশি, অর্থাৎ 'নৈরাজ্য' এর ধারণা কেবলমাত্র ধ্বংস এবং অবাধ্যতার সঙ্গেই সংলগ্ন কিন্তু 'নৈরাজ্যের দর্শন' এ প্রকৃত অর্থে নিহিত আছে শান্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। বলা চলে, নৈরাজ্যের দর্শনের ইতিহাসে খুব কম, গুটিকয় প্রবক্তাই তাঁদের দার্শনিক প্রকল্পে হিংসা বা ধ্বংসের উল্লেখ করেছেন উল্টোপক্ষে ঐতিহাসিকভাবে নৈরাজ্যের দার্শনিক নির্মাতাদের বেশির ভাগই 'নৈরাজ্য'কে হিংসা বা সন্ত্রাসের প্রতিপক্ষ হিসাবে শান্তি, স্বাধীনতা ও সাম্যের উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন। তাই নৈরাজ্যের দর্শনের চর্চা আমাদের নৈরাজ্য সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রচলিত নেতিবাচক অর্থের বাইরে এক স্বপ্নের স্বাধীনতার ধারণায় পৌঁছে দেয় এবং 'স্বাধীনতা' এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের আত্মসচেতন করে তোলে। 'anarchy' বা নৈরাজ্যের দার্শনিক রূপরেখার ক্রমবিবর্তিত চেহারা আমাদের বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করবে।

সভ্যতার ইতিহাসে কবে কেমন করে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সম্পত্তি, ধর্মের নিয়মকানুন শাসন ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল তার দিন-তারিখ নির্ধারণ করা যায় না, কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের জীবনে যে সব বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিচয় পৃথিবীর প্রাচীন দার্শনিক ভাবনাগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে। অনেকেই নৈরাজ্যের দার্শনিক প্রতীতিকে কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের সঙ্গেই যুক্ত করে দেখতে চান কিন্তু প্রাচ্য দেশেও নৈরাজ্য তথা নিরাজ সমাজব্যবস্থার ধারণা ছিল এমন সন্ধান মেলে। সভ্যজীবনের বিধিনিষেধ ও ভেদবৈষম্যে ক্লান্ত ভাবুক মন রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় শাসন এবং আর্থিক অসাম্যের পীড়নের বাইরে প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে বাস করতে চেয়েছে, কল্পনা করেছে এক প্রাগৈতিহাসিক স্বর্ণযুগের।

১.১ চিন - তাও এর পথ :

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বিচারে প্রাচ্য মনীষীদের কোন রাষ্ট্রদর্শন ছিল না, অথবা প্রাচ্য দর্শনের ধ্যানধারণায় রাষ্ট্রের স্থান ছিল গৌণ। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজের উপর, জীবনের বাইরের উপকরণের চেয়ে আন্তরিক সম্পদের দিকে প্রাচ্য দর্শনের নজর বেশি। কিন্তু তা বলে প্রাচ্য দর্শনের ইতিহাসে রাষ্ট্রচর্চা একেবারেই গুরুত্ব পায় নি একথা ঠিক নয়। বরং নৈরাজ্যের ইতিহাসের সবরকম বিধিবন্ধনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম উত্থিত দার্শনিক মতবাদের সন্ধানে আমরা নজর রাখতে পারি আড়াই হাজার বছর আগের চিনের ‘তাও’ মতবাদে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, যখন চিনের মাটিতে রাজ্যে রাজ্যে লড়াই ছিল নিত্যদিনের ঘটনা, জীবন ছিল অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলাতে ভরপুর, সেইসময় চিনের চু রাজ্যে লাওৎসের জন্ম হয়। ইতিহাসের বিচারে লাওৎসে আর কনফুসিয়াস সমসাময়িক। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের চিনে বিশৃঙ্খলা আর স্বেচ্ছাচার থেকে কনফুসিয়াস নিষ্কৃতি খুঁজলেন সামাজিক নীতিবন্ধন ও ভদ্র

আচরণে, আর লাওৎসে দেখালেন 'তাও' এর পথ— সকল রকমের নীতি ও আইনের বন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃতির সহজ জীবনে ফিরে যাবার রাস্তা।

লাওৎসে অর্থাৎ 'বুড়ো দার্শনিক'। কথিত আছে যে তিনি মাথা ভর্তি সাদা চুল ও ভারিক্কি চেহারা নিয়ে জন্মেছিলেন, তাই তাঁর এরকম নামকরণ হয়। কর্মজীবনে লাওৎসে ছিলেন চাও রাজ্যের মহাফেজখানার জিম্মাদার। অবসর নেবার পর তিনি দর্শনচর্চায় মন দেন। তাঁর চিন্তাভাবনা রূপ পেয়েছে একাশিটি ছোট কবিতার একটি গুচ্ছে। নাম *তাও তে চিং* বা *পথের ঠিকানা*। যার মধ্যে দিয়ে লাওৎসে বলতে চেয়েছেন মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, যা আমরা সমাজের ও নীতির শাসন দিয়ে নষ্ট করেছি। ক্ষমতার লোভ, বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার, সভ্যতার আদবকায়দা ইত্যাদি এসে সহজ জীবনের মুক্তি, সৌন্দর্য ও আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। মানুষকে সেই আদিম মুক্ত অবস্থায় ফিরে যেতে হবে।

"কিছু করতে গেলেই ভণ্ডুল হবে;
আঁকড়ে ধরলেই ফস্‌কে যাবে।
জ্ঞানী কিছু করে না, তাই তার হাতে কিছু ভণ্ডুল হয় না,
সে কিছু আঁকড়ে ধরে না, তাই কিছু ফস্‌কায় না।"[৩]

সমাজের নিয়মকানুনের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য থেকে যা কিছু উচ্ছৃঙ্খলার সৃষ্টি। সভ্যতার চাপে পড়ে যা কিছু সৎ ও শুভ তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির বিচারবুদ্ধি যখন হারিয়ে যায় তখনই আসে ধর্ম, ন্যায়, পরোপকার, সহবত— এই সমস্ত কথার জালে সমাজকে ধরে রাখার চেষ্টা। তাই বিদ্যা, বিচার ও সহবতকে অস্বীকার করলেই ফিরে আসবে মানুষের জ্ঞান, ন্যায়বোধ ও সততা।

"সহজ সত্তায় ফিরে যাও,
আদিম প্রকৃতিকে মেলে ধর
স্বার্থচিন্তা দূর কর,
আকাঙ্ক্ষা থেকে নিবৃত্ত হও।"[৪]

ইউরোপীয় রেনেসাঁ ভোগ ও বিস্তারের যে জীবনবোধকে মানবধর্ম বলে সম্বোধন করে আসছিল তারই প্রেক্ষিতে লাওৎসে জীবনের গতি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে ধর্ম ও কর্তব্যকেও নাকচ করে দিয়েছেন। অর্থ ও ক্ষমতার সুখই যদি জীবনের ধর্ম হয় তা হলে ধর্ম ও কর্তব্যের প্রয়োজন কী?

> "বাতাস যেমন যেদিকে খুশী বয়, তেমন ধর্মও খুশী মত নিজেকে স্থাপন করুক। এত হৈ চৈ করে তার সন্ধান করা কেন, যেন ঢাক বাজিয়ে এক পলাতক আসামীর খোঁজ হচ্ছে ?"[৫]

রাজহাঁসকে রোজ স্নান না করালেও সে সাদাই থাকে আর কাকের গায়ে রোজ কালি না লাগালেও সে কালোই থাকে। প্রকৃতি নিজের নিয়মে চলে, সবরকম বিরুদ্ধ চেষ্টাকে ছাপিয়ে তার নিয়মই বহাল থাকে। বুদ্ধিমানের কাজ হল খোদার উপর খোদকারী না করে প্রকৃতির নিয়ম জানা এবং সেই নিয়মগুলোকেই অনুসরণ করা। লাওৎসের বক্তব্য 'মানুষকে শাসন করা ভগবানের কাজ', মানুষের নয়। সুতরাং সেই সরকারই ধন্য যার কোনো শাসন নেই। সেই যথার্থ প্রভু যে প্রভুত্ব করে না।[৬]

> "যারা শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা
> লোকে এইমাত্র জানে যে তারা আছে;
> যারা এর চেয়ে নিকৃষ্ট তাদের লোকে ভালবাসে, স্তুতি করে;
> আরো নিকৃষ্টদের তারা ভয় করে;
> সবচেয়ে যারা অধম তাদের তারা গালাগালি করে।"[৭]

লাওৎসের প্রায় আড়াইশো বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে তাঁর মতবাদের বিস্তার ঘটান তাঁর ভক্ত চুয়াংসে। দেশে দেশে কালে কালে প্রকৃতিবাদী স্বপ্নবিলাসীরা এক স্বভাবশুদ্ধ সমাজের কল্পনা করেছেন। লাওৎসের 'তাও'বাদ বা চুয়াংসের বক্তব্যেও সেরকম সমাজের আহ্বান ছিল। তথাকথিত মূল্যবোধ, আচার আচরণের বিধান এ সবই অর্থহীন ও কৃত্রিম।

ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের বোধই তাই অসাড়। লাওৎসের মত ছিল জনসাধারণ একটি শিশু। শিশুর মতই জনসাধারণকে তার স্বভাব মাফিক বাড়তে দিতে হবে। বিধি নিষেধ বা শৃঙ্খলার আইন এই বিকাশকে ব্যাহত করে। গুরুর মতকে উপকথা এবং বাক্যালাপের আকারে ব্যাখ্যা করেন চুয়াংসে। তাঁর মতে 'তাও' এর কথা ভুলে গেলেই আসে কর্তব্য ও নিয়মকানুনের কথা। স্বভাবসত্তা হারিয়ে গেলে হাজির হয় রাষ্ট্র। আর রাষ্ট্রের উৎপত্তিই সংশয় ও বিশৃঙ্খলার সূচনা করে। আইন ও শাসনের জোরে লোককে ভালো করার মতো হঠকারিতা আর নেই। মানুষের যেমন ভুলভ্রান্তি আছে, তাদের ভাল করার দায়িত্ব নেয় যে আইন ও সরকার, তারাও কম ভুল করে না।

> "ঠিক-এর বিপরীত ভুল, সুশাসনের বিপরীত কুশাসন। যারা বলে ভুলকে বাদ দিয়ে ঠিককে নেব, কুশাসনকে বাদ দিয়ে সুশাসনকে রাখব-তারা বিশ্বের নিয়ম জানে না, সৃষ্টির রহস্য বোঝে না। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে আকাশের কথা বলা, হাঁ-কে ছেড়ে না-র কথা ভাবা সমান অবাস্তব।"[৮]

লাওৎসে এবং চুয়াংসের এইরকম নিরাজ সমাজ ব্যবস্থার কল্পনাকে অনেকেই সমালোচনা করে 'দার্শনিক শূন্যবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এদের সমসাময়িক চিনের রাজনৈতিক অবস্থার অরাজকতার দিকে তাকালে 'তাও' এর চিন্তাভাবনাকে প্রগতির পরিপন্থী বলা যায় না। উনিশ শতকে ইউরোপীয় নৈরাজ্যবাদের চর্চা রাষ্ট্র সম্পর্কে যে নিষ্ক্রিয়তার কথা ভেবেছে- তাওবাদে তারই পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আধুনিক কালের নৈরাজ্যবাদীদের মতোই সে আইন, শাসন, নীতি ও ধর্ম এ সমস্ত ধ্বংস করতে চেয়েছে। সে জেনেছে এগুলি সভ্যতার বিকৃতি এবং প্রকৃতির দেওয়া সহজ সততাকে ফিরে পেতে হলে এগুলিকে সমূলে নাশ করতে হবে। নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস সন্ধানে তাই তাওবাদের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

১.২ উইলিয়াম গডউইন (১৭৫৬-১৮৩৬) :

১৭৫৬ সালে কেম্ব্রিজশায়ারের উইজবেক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত যাজক পরিবারে জন্ম নেওয়া উইলিয়াম গডউইনকে অনেকে নৈরাজ্যবাদের জনক বলেছেন। নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস চর্চায় গডউইন-ই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি ফরাসি বিপ্লব উত্তর সময়ে নৈরাজ্যবাদের ভাবনাকে সুস্পষ্ট রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লব গোটা পৃথিবী জুড়েই পুরনো রাষ্ট্র ও ধর্মব্যবস্থা সম্পর্কে ধ্যানধারণার পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। রাষ্ট্রশাসন কিংবা সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক বৈষম্য কীভাবে দূর হতে পারে তা নিয়ে ইউরোপের মননজগতে তর্ক, পাল্টা তর্ক, প্রস্তাবের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। কোন নীতি বা সূত্র আশ্রয় করে একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠিত হতে পারে সেই সন্ধানে দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পর ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত হয় গডউইনের *An Enquiry concerning political Justice, and its Influence on General Virtue and Happiness*।

গডউইন দেখতে পেলেন সমাজের বুকে যে দুঃখবেদনা জমে উঠেছে ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে প্রতিনিধি পাঠিয়ে কিংবা খাজনার হার কমিয়ে তার প্রতিকার সম্ভব না। সামাজিক সম্পর্কের বৈষম্যই সরকারি শাসন ও সেই সংক্রান্ত স্বৈরাচারের মূল কারণ। তাই মানুষের সামাজিক সম্পর্কেরই পুনর্বিন্যাস চাই এবং সে কারণেই রাষ্ট্র এবং তার আনুষঙ্গিক কোন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে রেহাই দেওয়া যাবে না। গডউইনের বিচারে যাবতীয় সমস্যার মূল প্রশ্নটি হল মানুষে মানুষে সম্পর্ক কী করে ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায়! কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত আচরণের মধ্যে দিয়েই মানুষ নিজে সুখী হতে পারে, অন্যকেও সুখী করতে পারে। আর এই ন্যায়ের বিধান নির্ণয় করা যেতে পারে কেবলমাত্র নিজের বিচারশক্তি খাটিয়ে। সমাজ বা আইন যেসব বিধান তৈরি করে তা ন্যায়ের বিধানের পরিপন্থী। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা,

প্রতিশ্রুতি পালন, শপথ গ্রহণ বা দেশপ্রেম প্রভৃতি নীতিবোধ বা নিয়ম কানুনের সঙ্গে ন্যায়ধর্মের কোনো সঙ্গতি নেই।

গডউইনের অভিধানে ন্যায়, সততা ও সত্য সমার্থক। সততার অবলম্বন বুদ্ধি, আইন-কানুন নয়। শাস্তি দিয়ে অসততা যেমন বন্ধ করা যায় না তেমনি পুরস্কার দিয়েও সততা বাড়ানো যায় না। সরকারের আইন আসলে জবরদস্তির আইন। আইন বানানোর অধিকার সমাজের নেই। সহজ আইন একমাত্র যা প্রকৃতির আছে, মানুষের উচিৎ তাকে অনুসরণ করা। প্রকৃতির আইনে কত বৈচিত্র্য, কত রূপান্তর — মানুষ তার বিস্তৃত বোধ ও জ্ঞান নিয়ে সে সবের পিছনে হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু সরকারি আইন সেখানে এনে হাজির করছে শাস্ত্রের কড়াকড়ি। আইনশাস্ত্র বরাবরই প্রাকৃতিক নিয়মের উল্টোদিকে সমস্ত বৈচিত্র্যকে একই ছাঁচে ঢালাই করতে চায়। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা আইন করে সম্ভব নয়, সরকারি শাসনের জোরেও সম্ভব নয়। সরকারের হুকুম মানলেই ন্যায়ের জয় হবে এ বড় আশ্চর্য কথা। সরকার প্রজার বুদ্ধির কাছে আবেদন করে না, প্রজার ওপর জোর খাটিয়ে সে শাসন চালায়। মানুষের মনও সে কারণেই সরকারি শাসনের বিপরীতধর্মী। মন গতিশীল, সরকার জগদ্দল। সরকার চায় জনগণকে চিন্তা করবার দায় থেকে মুক্ত করে জড়ভরত বানাতে। সরকার চায় জনগণ নিজের বিচারবুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায় বোধ বিসর্জন দিয়ে সরকারেরই তৈরি আইন মানবে, শপথ নেবে। তাহলে সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ কী? জনগণের সঙ্গে এদের সম্পর্কই বা কীরকম হওয়া উচিৎ? গডউইনের মতে মানুষের ঘাড়ে সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে না চাপিয়ে দিয়ে নিজের বিচারবুদ্ধির হাতে ছেড়ে দিতে হবে, তাহলেই মানুষ সত্যের পথ চিনে নিতে পারবে।[৯]

ফরাসি বিপ্লবের উত্তাল হাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে গডউইনের এইসব দার্শনিক বিচারের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মন্ত্রীসভায় তাকে গ্রেপ্তার করার কথা উঠলে প্রধানমন্ত্রী পিট তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন যে, তিন গিনি দামের বই গরিবরা কিনে পড়বে না এবং তা থেকে বিপ্লব হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বাস্তব হল এই, গরিব শ্রমিকেরা চাঁদা তুলে গডউইনের বই কিনেছিল এবং ক্লাস করে সেই বই পড়া হচ্ছিল। আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায়

Political Justice এর 'pirated edition' বিক্রি হচ্ছিল।[১০] বাধ্য হয়েই সরকারের কঠোর দমননীতি নেমে এল। সাহিত্য এবং সংবাদপত্রের মাথায় দেশদ্রোহের পরোয়ানা ঝুলতে লাগলো। এমনই পৃথিবীজোড়া দমন ও মুক্তির আবহে গডউইন ভবিষ্যত সমাজের নকশা পেশ করলেন।

এই কল্পিত নকশায় সমাজ ও রাষ্ট্র এক নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল পরস্পরের সাহায্যের জন্য। তখন তারা বোঝেনি মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক তাদের ওপর শাসন করবে। এই শাসনই যত নষ্টের মূল। মানুষের অগ্রগতি ও স্বাধীন চিন্তা শাসনের চাপেই রুদ্ধ। সরকার নামক একটি অপগ্রহ মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে দখল করে বসে আছে। মানুষের চেতনা বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অপগ্রহটাকেও দূর করতে হবে। "With his rejection of government and laws, godwin condemns any form of obedience to authority other than 'the dictate of the understanding'।"[১১] সম্পত্তি ও সরকারকে উচ্ছেদ করে সাম্য ও স্বাধীনতাকে আশ্রয় করে এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, সার্বভৌম কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র দূর হয়ে চালু হবে একটি বিকেন্দ্রিত বন্দোবস্ত, যেখানে কারো ওপর কারো শাসন চলবে না। এই ছিল গডউইনের স্বপ্ন।

অরাজকতার সঙ্গে একটা বিভীষিকার ধারণা জড়িয়ে আছে। রাষ্ট্রশাসন না থাকলে চারদিকে মারামারি, কাটাকাটি আরম্ভ হবে — অনেকেই এরকম আশঙ্কা করেন। যদি তা ঘটেও, স্বেচ্ছাচারী শাসকের হাতে যত লোক বলি হয়েছেন অরাজকতায় তত লোক মরতে পারেন না। গডউইনের ভাবনায় ন্যায়ের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের সুখবিধান। ধর্ম, আইন, সরকার ও সম্পত্তি এর প্রতিবন্ধক। স্বাধীনতা ও সাম্য হল ন্যায় সম্মত সমাজের ভিত্তি। এইরকম সমাজ গড়তে হলে রাষ্ট্রশাসন ও সম্পত্তিপ্রথা তুলে দিতে হবে। বল প্রয়োগ করে বা দল গঠন করে নয়, বিচার ও সমালোচনা করে যে সব অন্যায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সরকারি জুলুম মানুষকে বিহ্বল করে রেখেছে তাদের দূর করে প্রজ্ঞানের নৈরাজ্যকে আহ্বান করতে হবে। যখন প্রজ্ঞানশীল ন্যায়বোধ জাগরিত হবে তখন রাষ্ট্র ও সম্পত্তির বিধান ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, তৈরি হবে সাম্য ও স্বাধীনতার নিরাজ গণতন্ত্র।

১.৩ পিয়ের জোসেফ প্রুদঁ (১৮০৯-৬৫) :

নৈরাজ্যচর্চার ইতিহাসে প্রুদঁ-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি নৈরাজ্যকে 'disorder' এর সমার্থক বলে বিশেষায়িত করেন এবং স্বরোষিত নৈরাজ্যবাদী হিসেবে নিজের পরিচয় দেন। ১৮৪০ এ *What is Property?* তে প্রুদঁ বলেন -

> "...you are a republican, 'Republican, yes, but this word has no precise meaning. Res publica, that is, the public good. Now whoever desires the public good, under whatever form of government, can call himself a republican. Kings too are republicans. 'Well, then you are a democrat?' No. 'What, you cannot be a monarchist!' No. 'A constitutionalist?' Heaven forbid! 'Then you must be for the aristocracy.' Not at all. 'Do you want a mixed government?' Even less. 'What are you then?' I am an anarchist. 'I understand, you are being satirical at the expence of government.' Not in the least. I have just given you my considered and serious profession of faith. Although I am a strong supporter of order, I am in the fullest sense of the term, an Anarchist."[১২]

১৮৪৮ সালের প্যারি কমিউনের বিস্ফোরণের আগুন ইউরোপের দেশে দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে রাজতন্ত্রের পাল্টা শুরু হয়েছিল জাতীয়তা ও স্বাধীনতার যুগ। ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত সময়কালকে বলা যায় বিপ্লব ও সংঘাতের যুগ - যে সময় সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সারা পৃথিবীর স্থিতাবস্থার ভিতে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালে বিপ্লবের লীলাভূমি ফ্রান্সে প্যারি কমিউনের গণ অভ্যুত্থানের ফলে অর্লিয়ানিস্ট রাজতন্ত্রের পতন ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পতন হল। প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলনের ডামাডোলের মধ্যে জন্ম নিল শিল্পবিপ্লবের দান নতুন এক সমাজদর্শনের। স্যাঁ সিমঁ, ফুরিয়ে, লুই ব্লাঁক সমাজবাদী নিয়মের পরিকল্পনা করলেন। স্বাধীনতা ও জাতীয়তার মন্ত্র দিলেন

ম্যাট্‌সিনি, তার সংগ্রাম পরিচালনা করলেন গ্যারিবলডি- আর নৈরাজ্যবাদের বাণী উচ্চারণ করলেন প্রুদঁ, ম্যা স্টার্নার ও বাকুনিন।

১৮০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্তের বেসাঁসঁ শহরের উপকণ্ঠে এক গ্রাম্য পরিবেশে জন্মানো পিয়ের জোসেফ প্রুদঁ তাঁর প্রথম বই এই সবাইকে চমকে দিলেন। ১৮৪০ এ প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম ও প্রধান রচনা *What is Property?* (সম্পত্তি কী?)– বইয়ের নামকরণে যে প্রশ্ন এককথায় তাঁর উত্তর 'property is theft'– সম্পত্তি হল চোরাইমাল। ১৮৪৬ সালে হেগেলের দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে অর্থনীতি ও সম্পত্তির বিচার বিষয়ে প্রকাশিত হল *The Philosophy of Poverty*। ১৮৪৯ সালে একটি প্রবন্ধে ফ্রান্সের একনায়ক লুই নেপোলিয়নের সমালোচনা করার অপরাধে প্রুদঁ-র কারাদন্ড হয়। জেলজীবনের অবকাশে তিনি রচনা করলেন *Solution of the Social Problem* (১৮৪৯) এবং *General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century* (১৮৫১)। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় চার্চদ্রোহী বিখ্যাত গ্রন্থ *Of Justice in the Revolution and the Church*। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত *Principle of Federation* গ্রন্থে প্রকাশিত হল প্রুদঁর কল্পিত নিরাজ সমাজব্যবস্থার রূপরেখা।

সমকালীন রাষ্ট্র চিন্তার যে দুটি প্রধান ধারা ছিল তার কোনোদিকেই প্রুদঁ-র আকর্ষণ ছিল না। জাতীয়তা কিংবা গণতন্ত্র এই দুটির মধ্যে কোনোটিই প্রুদঁ-র আকাঙ্ক্ষিত নয়। ম্যাটসিনির জাতীয়তার তত্ত্বে যখন গোটা ইউরোপ আন্দোলিত তখন প্রুদঁ-র থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন। কেননা তাঁর মতে জাতীয়তার নেশা বড় মারাত্মক। আজকের নির্যাতিত পরাধীন জাতি কাল স্বাধীন হলে সেও এক কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্রগঠন করবে এবং নির্যাতনে হাত পাকাবে। তাহলে বিকল্প রাষ্ট্রব্যবস্থা কীরকম হতে পারে?

সমাজের যে সকল কাজকারবার তত্ত্বাবধানে চলছে সেগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেখানে যেমন দরকার সেখানে তেমনি আঞ্চলিক সভা গড়ে

উঠবে, তারাই স্থানীয় কাজকর্ম চালাবে। কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, অর্থ, বিচার, দেশরক্ষা ইত্যাদি যে সমস্ত কাজের দেখাশোনা এখনো সরকারী দপ্তর থেকে হয় সব তদারক করবে জনসাধারণ অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সরকারী কর্মচারী কিংবা সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি কোথাও থাকবে না। শৃঙ্খলা ও পরিচালনা থাকবে, আইনের কর্তৃত্ব উঠে যাবে।[১৩] কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদির পরিচালনার জন্য সমব্যবসায়ীরা নিজ নিজ সংঘ গড়ে তুলবে। সংঘের থাকবে আলোচনা সভা, কার্যকরী সভা, ও একজন নির্বাচিত সচিব। এরাই সব কাজ চালাবে। কী দরকার সরকারী কৃষি বা বাণিজ্য দপ্তরের? শিক্ষকরা নির্বাচিত হবেন পৌরসভা বা অঞ্চল সভা থেকে। ডিগ্রী দেবে বিশ্ববিদ্যালয়। নীচের ক্লাসে পড়িয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারলে তবে শিক্ষক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সুযোগ পাবেন। অর্থদপ্তরকেও করে তুলতে হবে লোকায়ত্ত। যে কোন সামাজিক কাজের জন্য টাকা দরকার এবং টাকা যোগান করদাতা। যারা টাকা দেয় তাদের হাতেই জমাখরচের হিসাব থাকা উচিত যারা টাকা ওড়ায় তাদের হাতে নয়। জনতার অর্থভাণ্ডার থেকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সরিয়ে দিলে অপচয়, ঘাটতি, দুর্নীতি কমবে এবং আয়ব্যয়ের নীতি ঠিক করবে দেশ, সরকার নয়।[১৪] জনস্বার্থের কাজগুলি একটি যুক্তসভা দ্বারা পরিচালিত হবে। এই যুক্তসভা রাষ্ট্রসভার জায়গা নেবে। এর কাজ হবে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা। এই ব্যবস্থায় এক দিকে থাকবে স্বাধীনতা ও লোকায়ত্ত সংগঠন অন্যদিকে তেমনি থাকবে দায়িত্বশীলতা ও কেন্দ্রীকরণ। জনতার স্বতস্ফূর্ত সমর্থনে রাষ্ট্রবিধানের চেয়েও শক্তিশালী বিধানে ফেডারেশন বা যুক্তকরণের নীতির উপর নির্মিত হবে প্রুদঁ-র স্বপ্নের নিরাজ সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্নসৌধ।

শুধুমাত্র সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনই নয়, প্রুদঁ-র বিচারে ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্র সম্পর্কেও প্রতিষ্ঠান বিরোধী বক্তব্য রয়েছে। *Of Justice in the Revolution and the Church* গ্রন্থে প্রুদঁ চার্চকে ধিক্কার দিয়েছেন দাসত্বের শিক্ষাগার বলে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা দূরের কথা ধর্ম এক তুরীয় আদর্শবাদের নামে মানবতাকেই অপমান করে এসেছে,

শ্রমকে বিধাতার অভিশাপ বলে অপমান করেছে। লোকোত্তর বাণী বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নয় সমাজ পরিচালিত হবে নতুন ন্যায়ের বিধানে যা মানবমূল্যে প্রতিষ্ঠিত। ফরাসি বিপ্লবের বয়ে আনা সামাজিক ন্যায়নীতির মধ্যে প্রুদঁ ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তা মুক্ত এক লৌকিক নীতির সন্ধান করলেন। প্রুদঁ-র এই নৈরাজ্যময় স্বপ্নরাজ্যে যে যার খুশি মতো কাজ বেছে নেবে। বাজারে অবাধ বিনিময় চলবে বিনা লাভে। কাজের পরিমাণ হবে বিনিময়ের হার। সমান পরিশ্রমের মাল সমানে সমানে বিনিময় হবে। যেখানে যে পণ্যের দরকার সেখানে সেই পন্য চলাচল করবে অবাধে। চাহিদাও সরবরাহ সমান হবে। রাষ্ট্রীয় জীবন অর্থনৈতিক জীবনে মিশে যাবে। ধর্মীয় ব্যাপার লোকায়ত ব্যাপার থেকে পৃথক থাকবে। সরকারী শাসন হবে অবান্তর। সমাজ নিজের শক্তিতেই চলবে, সেনাবাহিনী, বিচারব্যবস্থা বা আমলাতন্ত্র দিয়ে তাকে চালাতে হবে না। কেমন করে এই পরিবর্তন সম্ভব হবে? গডউইনের মতো প্রুদঁরও বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠলে আপনিই এই পরিবর্তন আসবে। জোর জবরদস্তি করে, হিংসাত্মক কাজ দিয়ে আচমকা সমাজের চেহারা বদলে দেওয়া যাবে না। ন্যায়ের সন্ধান যেমন করে আমাদের পৌঁছে দেয় সাম্যে তেমন শৃঙ্খলার খোঁজেই আমরা পৌঁছতে পারবো নৈরাজ্যে।

স্বঘোষিত নৈরাজ্যবাদী হিসেবে নিজের পরিচয় দিলেও প্রুদঁ-র আগেই আদর্শ সমাজ বিন্যাস হিসেবে ‘Anarchy’ শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন গডউইন। কিন্তু গডউইনের চিন্তাধারাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো আর কোনো দার্শনিকের উপস্থিতি নজরে পড়ে না। অন্যদিকে প্রুদঁ এমন এক জনশিষ্যকে দীক্ষিত করে গেলেন, উনিশ শতকের রাষ্ট্রচিন্তার পৃথিবী যার কথায় পরবর্তীতে মেতে উঠলো। ইনি বাকুনিন। নৈরাজ্যের সমাজ বহু বিভক্ত ছোট ছোট গ্রাম সভা ও পৌরসভার সমাবেশে গড়ে উঠবে, প্রুদঁ-র এই মডেল বাকুনিন গ্রহণ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব পরবর্তী পৃথিবীতে যে নৈরাজ্যের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন প্রুদঁ, বাকুনিন সময়ের ধারায় তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এই অগ্রসরমানতায় বিস্তৃত হল উনিশ শতকের নৈরাজ্যবাদ।

১.৪ ম্যাক্স স্টার্নার (১৮০৬-১৮৫৬) :

প্রুদঁর সময়েই রাইন নদীর অন্য পারে হেগেলের আর এক শিষ্য নৈরাজ্যবাদের দিগদর্শন রচনা করেছিলেন। প্রাচীন সময় থেকেই নৈরাজ্যবাদীদের যে সমাজপ্রতীতির দেখা মেলে স্টার্নার ঠিক সেই পথে হাঁটলেন না, শুধু যে ঈশ্বর ও রাষ্ট্রকে তিনি বাতিল করলেন তা নয় যাবতীয় সামাজিক নীতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে নাকচ করতে করতে তিনি এক নির্বকল্প ব্যক্তিসর্বস্বতায় উপস্থিত হলেন।

১৮০৬ সালের পঁচিশে অক্টোবর ব্যাভেরিয়ার বাইরয়েট শহরে জোহান কাসপের স্মিট-এর জন্ম হয়। তরুণ বয়সে হেগেলের অন্যান্য ভক্তদের মত তিনিও ধর্ম ও দর্শন নিয়ে মেতে ছিলেন। ১৮৪৫ সালে বার্লিনের একটি মেয়ের স্কুলে শিক্ষক থাকাকালীন প্রকাশিত হল তাঁর চমক-লাগানো বই- *The Ego and Its Own*। আত্মগোপনকালে এই লেখকেরই ছদ্মনাম হল ম্যাকস স্টার্নার এবং এই নামেই তিনি পরবর্তী কালে পরিচিত হলেন।

মানুষ মুক্তি চায়, কিন্তু বাস্তবতা এই যে মুক্তির নামে শেকল ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার নতুন শেকল বরণ করে। এক স্বর্গ ভেঙে সে গড়ে নতুন স্বর্গ। গ্রীকদের স্বর্গ বিনাশ করেছে ইহুদীরা, ইহুদীদের স্বর্গ খ্রীষ্টানরা, খ্রীষ্টানদের স্বর্গ প্রোটেস্ট্যান্টরা। এক স্বর্গ যায় আর এক স্বর্গ আসে।

বর্তমান যুগে মানুষের মুক্তি-আন্দোলন তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে- প্রথম রাষ্ট্রীয়, দ্বিতীয় সামাজিক, তৃতীয় মানবিক। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন মানুষকে মানুষের শাসন থেকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ব, একের ওপর অন্যের অধিকার অন্যের রাজত্বের অবসান করেছে রাষ্ট্রীয় মুক্তি। প্রত্যেক নাগরিক অন্যের হাত থেকে স্বাধীন হয়েছে তেমনি পাশাপাশি সে হয়েছে রাষ্ট্রের দাস। মানুষের উপর মানুষের হুকুম তো বন্ধ হয়েছে ঠিক তার বদলে মানুষের উপর চেপে বসেছে আইনের হুকুম।

> "কিন্তু যদ্যপি সকলে আইনত সমান হইয়াছে তথাপি সকলের স্বত্ব সমান হয় নাই। দরিদ্রের প্রয়োজন ধনীকে, ধনীর প্রয়োজন দরিদ্রকে। দরিদ্রের দরকার ধনীর ধন, ধনীর দরকার দরিদ্রের শ্রম। কেহ কাহাকেও মানুষ হিসাবে চায় না, চায় দাতা হিসাবে,- মালিক বা অধিকারী হিসাবে, তাহার কিছু দিবার আছে বলিয়া। কাজেই যাহার যাহা আছে তাহা দিয়া সে মানুষ। আর এই অধিকারগত বিষয়বস্তুতে মানুষ অসমান।
>
> সুতরাং সামাজিক মুক্তিবাদ সিদ্ধান্ত করে কাহারও কোন বস্তুতে অধিকার থাকিবে না, ঠিক যেমন রাষ্ট্রীয় মুক্তিবাদ বলে কেহ হুকুম চালাইতে পারিবে না। অর্থাৎ ইহাতে যেমন হুকুম করিবার ক্ষমতা বর্তায় কেবল রাষ্ট্রে, উহাতে তেমন বিত্ত ও শ্রমের অধিকারী হয় শুধু সমাজ।"[১৫]

স্টার্নারের মতে স্বাধীনতার নিজের কোনো দাম নেই। নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার কাজে স্বাধীনতাকে খাটাতে পারলে তবেই তার দাম। যে মুক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না তার জন্য মুক্তি একটি নিরর্থক অনুভূতি। লোকে মুক্তি চায় নিজের জন্য, কখন বা সে স্বেচ্ছায় বন্ধনও বরণ করে। প্রেমিক ভালোবাসার বন্ধনে বন্দী হয় তার প্রেমকে চরিতার্থ করার জন্য। স্টার্নার বলেন,

> "মুক্তির বাণী তোমাদিগকে শিখায় স্বাধীন হও, সকল বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুক্ত হও। ইহা শিখায় না তুমি কে। মুক্ত! মুক্ত! এই আহ্বানবাণী শুনিয়া তুমি ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছ আর স্বাধিকার হইতে মুক্ত হইতেছ, নিজ সত্তাকে বিসর্জন দিতেছ। আর আত্মবাদ তোমাকে ডাক দিতেছে নিজের কাছে, বলিতেছে 'আপনাতে ফিরিয়া এস'। মুক্তির দৌলতে তুমি অনেক কিছু হইতে মুক্ত হও আর এক নূতন পীড়ন তোমার উপর চাপিয়া বসে।...আপন মানুষ আজন্ম মুক্ত, তার শুরু হইতেই মুক্তি। আর মুক্ত মানুষ হইল স্বপ্নাবিষ্ট সম্মোহিত উৎসাহী যে মুক্তি খুঁজিয়া ফেরে।"[১৬]

মুক্তি এমনি এমনি পাওয়া যায় না আদায় করতে হয়। কেবল সেক্ষেত্রেই মুক্তিকে নিজের কাজে লাগানো যায়। জনমুক্তি বলে একটা কথা প্রচলিত আছে বটে কিন্তু অহঙ্কারি শাসকের এক ফুৎকারে জনমুক্তি উড়ে যায়।

> "মুক্তি পাওয়া মানুষ মুক্ত দাস বৈ কিছু নহে-একটা ছাড়া কুকুর যেমন শিকল টানিয়া টানিয়া চলে সেই প্রকার। সে স্বাধীনতার পোশাক পরা বন্দী, ঠিক যেন সিংহচর্মাবৃত গর্দভ।"[১৭]

আগেকার দিনে মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করত মানুষ, এখন করে নীতি ও বিশ্বাস। এই কর্তৃত্ব আরো কড়া। আগে ছিল রাজার প্রতি ভয়ভক্তি, এখন হয়েছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র ও আইনের কাঠামোকে কেউ ভাঙতে যায় না। বাবা-মা'র শাসন থেকে সন্তান মুক্ত হতে চেয়েছে, বাবা-মা'র প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে মুক্ত হতে সাহস করে না। নিয়ম ও প্রথাকে ভাঙা সহজ, নীতি ও সংস্কারকে ভাঙা সহজ নয়- আর এরাই নিয়ম ও প্রথার প্রাণ। খ্রিষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের জিম্মাদার ছিল চার্চ। রিফর্মেশনের পর এর জিম্মাদার হয়েছে ব্যক্তির বিবেক। সবরকম পীড়নের চেয়ে কঠোর হল বিবেকের পীড়ন। একে অমান্য করার সাহস কারোর নেই।

> "প্রোটেস্ট্যান্টবাদ মানুষের উপর আনিয়াছে গোয়েন্দা পুলিসের শাসন। 'বিবেক' নামক গোয়েন্দা মনের যাবতীয় গতিবিধির উপর আড়ি পাতিয়া আছে। সকল চিন্তা ও কাজ বিবেকের এখিতয়ারে অর্থাৎ পুলিসি হেফাজতে। যে মানুষকে ছিঁড়িয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বিবেকে দুই টুকরা করিতে পারিয়াছে সেই হইল প্রোটেস্ট্যান্ট।"[১৮]

অথচ বিবেকের শাসনে দেখা যায় অসঙ্গতি। বিবেকের দংশন এবং রাষ্ট্রের বিধান প্রায় মুখমুখি এসে দাঁড়ায়।

যতক্ষণ আইন আছে ততক্ষন রাষ্ট্র আছে, আইন না থাকলে রাষ্ট্রও নেই। লোকে মানলেই আইন আছে, না মানলেই নেই। যার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা আছে সে রাষ্ট্রের আইন ও বিধির তোয়াক্কা করে না। সুতরাং রাষ্ট্রের সবসময় সজাগ দৃষ্টি থাকে যাতে কারও কোনো স্বাধীন ইচ্ছা না জন্মায়। কোথাও তিলমাত্র স্বাধীন চিন্তার বা ইচ্ছার আভাস পেলে সে খড়গহস্ত। উদারনীতি ও সহনশীলতা রাষ্ট্রের স্বভাববিরুদ্ধ।

> "রাষ্ট্র মাত্রই স্বৈরাচারী-তা শাসক একজন অনেকে কিংবা সকলে যাই হোক না কেন। একে অন্যের উপর স্বেচ্ছাচার চালায়। যখন জনপরিষদের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া আইনের রূপ নেয় এবং সেই আইন ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত হয়, ব্যক্তি সেই আইন মানিতে বাধ্য হয়, তখনও তাহা একের উপর অপরের স্বেচ্ছাচার হইয়া দাঁড়ায়। যদি এমনও ধরা যায় যে প্রত্যেক ব্যক্তি একই ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছে এবং এক সম্মিলিত অভিপ্রায় আইনে মূর্তি পাইয়াছে তাহা হইলেও ব্যাপারটা একই রকম দাঁড়ায়। ইহাতে আমি কি আজ গতকালের ইচ্ছা দ্বারা আবদ্ধ হই না? আমার ইচ্ছা জমিয়া স্থির হইয়া যাইবে। আমার এক মুহূর্তের অভীপ্সা, যাহা আমার সৃষ্টি, সে হইবে আমার আদেষ্টা।... আমি যদি গতকাল নির্বোধ হইয়া থাকি তবে সারা জীবন আমাকে তাহাই থাকিতে হইবে।"[১৯]

কোনো সর্বজনীন আদর্শের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিকে দমন করা, বশ করা, পোষ মানানো, এ ছাড়া রাষ্ট্রের আর কোন লক্ষ্য নেই। তার পরমত সহিষ্ণুতা শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ পরমত তার পক্ষে নিরাপদ। পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে যে মানুষের ওপর কোন বাঁধন টিকে থাকে না, বাঁধন ছেঁড়া উচ্ছৃঙ্খলতা তার স্বভাব। তবুও মানুষ বারবার উদ্ভাবন করে নতুন নিয়ম, মনে করে একটি মুক্ত সংবিধান বা গণতান্ত্রিক কাঠাম গ্রহণ করে সে ঠিক নিয়মটিকে গ্রহণ করেছে। আদর্শবাদীর মস্ত বড় আশা প্রজাতন্ত্রে কোন সরকারী শাসন থাকবে না, থাকবে কেবল কার্যকরী ক্ষমতা যা জনতার হাত থেকে পাওয়া এবং জনতার অধীন। জনতার ভিতর থেকে উদ্ভূত হলেই কি ক্ষমতা জনতার বশীভূত থাকে ? মায়ের নাড়িছেঁড়া শিশু ভূমিষ্ট হবার পরও কি থাকে মায়ের জিনিস ?

মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র গড়েনি। রাষ্ট্র আছে আপন জোরে। সে চায় আমি তার নৈতিক শাসন মানবো, অপরের প্রতি আমার কর্তব্য সে স্থির করে দেবে । সে সমাজের অভিভাবক, সমাজকে আমি কি দেব না দেব সে বিচার তার।

> "আমি আত্মম্ভরি, আমার অন্তরে মানবসমাজের হিত চিন্তা নাই। আমি ইহার জন্য কোন ত্যাগস্বীকার করি না, বরং ইহাকে আমার কাজে লাগাই। আর ইহাকে কাজে

> লাগাইতে হইলে নিজের খুশিমত গড়িয়া লই, আমার বিষয়ে পরিণত করি। অর্থাৎ ইহাকে আমি ধ্বংস করিয়া ইহার জায়গায় একটি আত্মপরদের সম্মিলন গঠন করি।"[২০]

এ কাজ অসম্ভব নয়। যদি আমি কোন দায় গ্রহণ না করি, কোন আইন স্বীকার না করি, কোন বন্ধনে আত্মসমর্পণ না করি, তা হলে কোথায় থাকবে রাষ্ট্র, কোথায় থাকবে সমাজ? আমি অপরাধী হব। আইন ও অপরাধের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। রাষ্ট্রের জবরদস্তির নাম আইন, ব্যক্তির জবরদস্তির নাম অপরাধ। রাষ্ট্রের জবরদস্তিকে উৎখাত করতে হলে অপরাধ ছাড়া উপায় নেই।

লাওৎসের পর এমন সর্বান্তক বিদ্রোহের বাণী আর উচ্চারিত হয়নি। গডউইন ও প্রুদঁর পদ্মমধুর মৌতাতে পাঠক যখন ঝিমিয়ে পড়ে তখন স্টার্নারের চাবুক খেয়ে তার সুখস্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়, চোখ রগড়ে আবার খুলতে হয় পুরানো পাঠ, যাচাই করতে হয় পরীক্ষিত সত্য, বদ্ধমূল বিশ্বাস। জীবনের ভিত্তি নড়ে যায়, মূল্যবোধের মূলে টান পড়ে। তারপর যখন চারিদিক ঘিরে আসে অতল অন্ধকার নাস্তিবাদ, তখন থেমে যায় কম্পন, মন আবার স্থির হয় জীবনবেদের অটল বনিয়াদের ওপর। স্টার্নারের মত শক্ত ওঝাও মাথার ভূত নামাতে পারে না।

এই পরম বিদ্রোহী নিশ্ছিদ্র মহাশূন্যের মাঝে অহং-এর বিন্দু পরিমাণ স্থিতিস্থানের ওপর ম্যাকস স্টার্নার দাঁড়িয়েছেন নিঃসঙ্গ একাকী। রাষ্ট্র গেল, ধর্ম গেল, চিন্তা ও যুক্তি গেল, সমাজ ও ন্যায়বোধ গেল, গেল কর্তব্য, ভাল-মন্দর বিচার। 'আমি আমার সর্বস্ব স্থাপন করেছি নাস্তির ওপর'- আমার কাছে আমি ছাড়া সব মায়া। এই ধ্বংসাত্মক শূন্যবাদ থেকে জন্ম নিয়েছিল রুশ নিহিলিস্টরা। সমাজের বিকল্পে স্টার্নার দেখিয়েছেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চুক্তির মিলন। এই মিলনচুক্তি অবিরাম পরিবর্তনশীল। স্টার্নারের নেতি ও নাসকতার সামনে গডউইন ও প্রুদঁর নৈরাজ্যবাদকেও স্থিমিত ও নিষ্প্রভ লাগে।

স্টার্নারের মতামতকে অনেকেই লক্ষ্যহীন শূন্যবাদ বলে বাতিল করতে চাইলেও স্টার্নারের চিন্তা থেকে পৃথিবীর প্রাপ্তি কি শূন্য? বুদ্ধি ও ভালবাসার আবেদন দিয়ে যে সমাজ গড়া যায় না, সমাজের ভেতরে আছে আপসহীন স্বার্থের লড়াই, শক্তিহীনের পক্ষে যে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়- এসব কথা স্টার্নারের আগে চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখাননি। পরের মুখের দিকে না তাকিয়ে দরিদ্রদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, জোর করে আদায় করে নিতে হবে পাওনাগণ্ডা। স্টার্নারের এই নিদান আসলে ঘোষণা করেছিল শ্রেণিসংগ্রামের রণডঙ্কা। স্টার্নারের মতামত পৃথিবীতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচিত হবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

১.৫ মিখাইল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬) :

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে মিখাইল বাকুনিন এর জন্ম এক অভিজাত রুশ পরিবারে। বাবা ছিলেন কূটনীতিবিদ । পিটার্সবার্গের সমর বিদ্যালয়ে বাকুনিন যখন প্রবেশ করেন তখন তাঁর পনেরো বছর বয়স। আঠারো বছর বয়সে সেনা অফিসার হিসাবে তরুণ বাকুনিন সৈন্যদলে যোগ দেন। ১৮৩০ এর পোলিশ বিদ্রোহ তখন সবে মাত্র ধ্বংস হয়েছে, আতঙ্কগ্রস্ত পোলান্ডের ছবি তরুণ বাকুনিনের মনে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে তিনি এই ভাবনায় প্রাণিত হলেন যে স্বৈরাচার সব সময় ভীতিপ্রদ। ফলে সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে মস্কোয় ফিরে এলেন ১৮৩৪ সালে। দর্শন নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। সে সময় অনান্য দর্শনের ছাত্রদের মতন তিনিও হয়ে উঠেছিলেন হেগেল ভক্ত। ১৮৪০ এ পাড়ি দিলেন বার্লিনের উদ্দেশ্যে। ইচ্ছে ছিল দর্শন নিয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করে অধ্যাপক হবেন। কিন্তু পরবর্তিকালে তাঁর চিন্তায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে। এই বিশ্বে সবকিছু যুক্তিসঙ্গত-এই হেগেলীয় বীক্ষা মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হল না। আর্নাল্ড রুজের সঙ্গে পরিচয় তাঁকে বিদ্রোহী হতে অনুপ্রাণিত করল। ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়ে পালাতে হল সুইজারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ডে আলাপ হয় জার্মান কমিউনিস্টদের একটি

দলের সঙ্গে। পুলিসের তৎপরতায় এখান থেকেও পালাতে হল প্যারিস। প্যারিসে গিয়ে বাকুনিন পরিচিত হলেন প্রুদঁ-র সঙ্গে। মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও এই শহরেই।

> "বাকুনিন লিখেছেন প্রচুর তবু তাঁর চিন্তার থৈ পাওয়া যায় না। অজস্র ভাবনা মাথায় উজিয়ে উঠত, কাজের তাড়ায় সেগুলিকে গুছিয়ে তোলা হয়ে উঠত না, অসমাপ্ত লেখার মধ্যে থেকে যেত অসঙ্গতি। লেখার চেয়েও তাঁর বক্তৃতা ছিল গরম। কিন্তু তাঁর লিখিত অথবা ভাষিত কথন থেকে তাঁর দর্শনকে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁর দর্শনের ভাষ্য তাঁর ব্যক্তিত্ব। বিরাট বলিষ্ঠদেহ, প্রকান্ড মাথা ঘিরে ঘন অসম্বৃত কেশরাশি, কণ্ঠে বজ্রের নির্ঘোষ-মানুষটি যেন মূর্তিবান বিপ্লব। এক বস্ত্রে দিনের পর দিন দিবারাত্র কেটে যাচ্ছে, কখন হয়ত খোলা আকাশের নীচে রাত্রিবাস, যে দিকে ঝড় সে দিকে তৎক্ষণাৎ তাঁর গতি। যারা সংস্পর্শে আসত তারা এই দুর্দম আত্মভোলা প্রকৃতির প্রভাব এড়াতে পারত না।"[২১]

রাষ্ট্র, রাজনীতি ও আইন সম্পর্কে বাকুনিনের ধারণার মৌলিকত্ব তথা নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক উৎঘাটন করার জন্য বাকুনিনের রচনা, চিঠিপত্র এবং বক্তৃতাদির বিশ্লেষণ জরুরী। কিন্তু বাকুনিনের সমস্ত লেখাই খুব দ্রুত সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর লেখন পদ্ধতিও অনেকটাই নৈরাজ্যিক। ওঁর প্রচারিত বিখ্যাত লেখাগুলি শুধুমাত্র ছিন্ন, খন্ড লেখামাত্র। বাকুনিনের মতে, রাষ্ট্র হল চূড়ান্ত সংকোচন, সর্বসাধারণের স্বার্থ ও কল্যাণের নামে প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে নাকচ করা। ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস ও রাষ্ট্রের উপরে বিশ্বাস আদতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট করেছে। যেখানে রাষ্ট্রের শুরু সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অবসান, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সেখানে রাষ্ট্রের অবসান।

> "রাষ্ট্র সমাজ নয়। এটি শুধু ইতিহাসগত ভাবে সমাজের রাষ্ট্রিক রূপ। যা সব অর্থে পাশবিক ও নৈর্ব্যক্তিক। ইতিহাসের ক্রম নিয়মে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে ধ্বংস ও হিংসার মাধ্যমে-যেখানে শুধু রিরংসা ও লুণ্ঠন, যুদ্ধ ও বিজয়। এর ক্রমপর্যায়ে ঈশ্বর সৃষ্টি হয়েছে জাতিগুলির ধর্মীয় ও অবাস্তব ধারণায়। তাই সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত রাষ্ট্র হল পাশবিক শক্তির ঐশ্বরিক অনুমদন-অসাম্যের জয়গাঁথা।"[২২]

ভলতেয়ার বলেছিলেন ঈশ্বর যদি নাও থাকেন মানুষকে নিজের দরকারে তাকে সৃষ্টি করতে হয়। বাকুনিন তার কথা উল্টে দিয়ে বললেন 'ঈশ্বর যদি থাকেও তাহলে তাকে বাতিল করা দরকার।'[২৩] বাতিল তাকে হতেই হবে। ধর্ম, দর্শন ও আইনের শাস্ত্র যত মিথ্যা আমদানি করেছে সে সমস্ত কিছুর মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বুদ্ধি। আর বুদ্ধি শাণিত হয়েছে বিজ্ঞানে। তাই বিজ্ঞান বিদ্রোহীর অবর্থ্য হাতিয়ার। মুষ্টিমেয় বিদ্যাবিলাসীর হাত থেকে এই হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তুলে দিতে হবে জনতার হাতে। এই হাতিয়ারের বলেই মুক্তবুদ্ধি জনতা চড়াও হবে স্বর্গের উপর। লুঠ করবে স্বর্গ। প্রুদঁ-র মত বাকুনিনের ছিল সংবিধান ও আইনসভায় বিতৃষ্ণা। ইউরোপের পার্লামেন্ট ও কংগ্রেসগুলিতে জনপ্রতিনিধিদের কার্যকলাপ দেখে বাকুনিন হতাশ হয়েছিলেন। এদের দলাদলি, বাকবিতণ্ডা এবং কথা ও কাজের ফারাক দেখে তিনি বুঝেছিলেন এরা জনতার মানুষ নয় এবং পার্লামেন্টারি শাসন আসলে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশধারী স্বৈরশাসন।

নৈরাজ্যবাদী হিসেবে বাকুনিনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। তবে এর মূলটা ছিল ইতিহাসের অনেক গভীরে। ১৯০১ সালে নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র নামক থিসিস গুলিতে লেনিন উল্লেখ করেন যে, নৈরাজ্যবাদ এপর্যন্ত শোষণের সাধারণ বুলি ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। এই বুলিগুলি দু-হাজারেরও বেশি বছর ধরে চালু আছে। কিন্তু শোষণের কারণ অনুসন্ধান, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সৃজনী শক্তি হিসাবে শ্রেণিসংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া সমাজ বিকাশের বোধ নৈরাজ্যবাদের প্রচারকদের ছিল না। লেনিন বলেন, নৈরাজ্যবাদের ভিত্তি হল 'উল্টিয়ে ধরা বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ'।[২৪] ব্যক্তির স্বাধীনতা বিষয়ে বাকুনিনের অবস্থান দেখে অনেকেই বাকুনিনের মতামতকে 'নৈরাজ্যবাদী যৌথবাদ' বলেছেন। অনেকের মতে আবার নাশবৃত্তির সঙ্গে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ মিলিয়ে রচিত হয়েছে বাকুনিনের বিপ্লববাদ।

> "বিপ্লব মানে যুদ্ধ আর যুদ্ধ মানে মানুষ ও বস্তুর বিনাশ। বড়ই দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত অগ্রগতির কোনো শান্তিপুর্ণ উপায় আবিষ্কার হয় নাই, রক্তস্নানের মধ্য দিয়া

> ইতিহাস তার প্রত্যেকটি পা ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ইহার জন্য প্রতিক্রিয়া বিপ্লবের দোষারপ করিতে পারে না কারণ, বিপ্লবের অপেক্ষা প্রতিক্রিয়ার হাতে রক্তপাত হইয়াছে বেশি।"[২৫]

১৮৬৯ সালে রাশিয়ার তরুণ পলাতক বিপ্লবী সার্জী নেচাএভ এর সঙ্গে বাকুনিনের দেখা হয়। দু'জনের বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ রচিত হয় তিনটে বেনামী ইশতেহার। বিপ্লবের প্রশ্ন কি আকারে আসিয়াছে', 'বিপ্লবের নীতিকথা', এবং 'বিপ্লবের বিতর্কিকা'। তিনখানি ইশতেহারে আছে নাশকতার পাঠ, নির্মম নির্বিবেক হিংসাত্মক কাজের ফিরিস্তি। প্রথমটিতে রুশ কিষাণদের চিরাচরিত দস্যুবৃত্তির বন্দনা,

> "দস্যুবৃত্তি রুশ জাতীয় জীবনের অতি সম্মানীয় বৈশিষ্ট্য।...একমাত্র খাঁটি বিপ্লবী রুশের দস্যু। যে গরম কথার ও কেতাবি বিদ্যার বিপ্লবী নয়, আপোসহীন ক্লান্তিহীন দুর্দমনীয় বিপ্লবী।"[২৬]

দ্বিতীয় ইশতেহারের নির্দেশ,

> "আমরা নাশকার্য ছাড়া অন্যকাজের মূল্য বুঝি না। অবশ্য আমরা স্বীকার করি এ কাজ নানাআকার লইতে পারে- যথা, বিষ, ছুরি, দড়ি ইত্যাদি। এই যুদ্ধের যাবতীয় কুকর্ম বিপ্লবের ছোঁয়ায় পবিত্র হইয়া যায়।"[২৭]

সব মিলিয়ে বাকুনিনের ফরমান রাষ্ট্রের বিনাশ। সরকারি দপ্তর, আইনসভা, আদালত, সেনা, পুলিস, চার্চ, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, সম্পত্তির দলিল সব দূর করতে হবে। আইনের বিধান, নিয়ম, আদালতের রায় কেউ মানবে না। প্রজারা খাজনা দেবে না। পুঁজি ও কলকারখানা শ্রমিক সংঘের হাতে চলে আসবে এবং সামুদায়িক উদ্যোগে ব্যবহৃত হবে। চার্চ ও সরকারের সম্পত্তি এবং ব্যক্তির জমানো সোনা-রূপা সব বাজেয়াপ্ত হবে। সরকারের নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলা হবে।

আধুনিক নৈরাজ্যবাদের জনক বাকুনিনের জীবন ও রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মার্কসের সাথে তার পরিচয়, বন্ধু ও বিবাদের ইতিহাস।

> "স্বভাবচরিত্রে ও চিন্তাভাবনায় দুজনায় ছিলেন ঠিক বিপরীত। বাকুনিন ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, আবেগপ্রবণ, কর্মচঞ্চল। মার্কস ছিলেন ধীর স্থির হিসেবী, দল ও আদর্শের সংগঠনে একাগ্র। বাকুনিনের কথায় ও কলমে আগুন ছুটত, আর পতঙ্গের মত তিনিও ছুটতেন আগুনের দিকে। মার্ক্স হাতাহাতি লড়াই এড়িয়ে চলতেন, পড়তেন আর লিখতেন মত প্রতিষ্ঠার জন্যে। বাকুনিন ছিলেন এনার্কিজ্‌ম-এর যোদ্ধা, মার্ক্স ছিলেন কমিউনিজ্‌ম-এর গুরু। বাকুনিনের মৃত্যুর পর রইল তাঁর কাহিনী ও উপকথা। মার্ক্স-এর মৃত্যুর পর রইল তাঁর মতবাদ ও দলীয় আদর্শ।"[২৮]

মার্কস বা বাকুনিন কারোরই প্রতিনিধিমূলক সরকারে আস্থা ছিল না। মার্কস মনে করতেন যে, ভোট ব্যবস্থা বুর্জোয়াদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখবার একটা ফিকির। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মত গণতন্ত্রও একশ্রেণির প্রভুত্ব। বাকুনিনের ধারণাও তাই, একারণেই বাকুনিনও চেয়েছেন সবরকম তন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে। বাকুনিনের মতে, মার্কস কথিত 'সর্বহারার একনায়কত্ব' আর 'বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র' এদুটো একই জিনিস। 'অধিক সংখ্যক লোক মূর্খ ও অল্প সংখ্যক লোক বুদ্ধিমান এই অজুহাতে সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুদের শাসন।'[২৯]

সর্বহারার একনায়কত্ব সম্পর্কে আপত্তির পাশাপাশি বাকুনিনের আক্রোশ রাষ্ট্র ও শাসনের উপর। মার্কসের মতে রাষ্ট্র বুর্জোয়ার হাতে শোষণের কল, রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিকের হাতে গেলে এই শোষণ বন্ধ হবে। বাকুনিনের মতে রাষ্ট্রের ধর্মই হল শোষণের সংরক্ষণ। মার্কসের বিশ্বাস ছিল একনায়কত্বের ফলে শ্রেণিভেদ ঘুঁচে যাবে এবং রাষ্ট্র নিজে থেকেই লোপ পাবে। বাকুনিনের আশঙ্কা ছিল রাষ্ট্র ক্রমশ শক্তিশালী হবে এবং নতুন সুবিধাবাদী শ্রেণি গজিয়ে উঠবে। নীতির বিবাদ, ভাবনার বিবাদ আরও স্পষ্ট রূপ নেয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার প্রশ্নে। শেষপর্যন্ত বাকুনিন 'আন্তর্জাতিক' থেকে বিতাড়িত হন কিন্তু বিরোধ শেষ হয় না। মার্কস ও বাকুনিনের এই পরিচয় ও বিরোধিতার মধ্যে নিহিত আছে উনিশ শতকের প্রধান দুই সমাজগঠন তত্ত্ব। একদিকে মার্কসের শ্রেণিসচেতন সর্বহারার সংগ্রাম অন্যদিকে বাকুনিনের

সংহারময় বিদ্রোহের আশা। মার্কস তার চিন্তাকে সুসংহত রূপ দিয়ে পরবর্তীকালের বিচার বিশ্লেষণের জন্য রেখে যেতে পেরেছেন। অপরদিকে বাকুনিনের উচ্ছৃঙ্খলতা অগোছাল হঠকারি স্বভাব তাঁকে পৃথিবীর দর্শন চর্চার ইতিহাসে অভিশপ্ত নায়কে পরিণত করেছে।

সৃষ্টির অন্তরালে আছে চিরন্তন বিবর্তন। সমাজ বিপ্লবের গতিও তাই অবিরাম। এইরকম তত্ত্ব দিয়েই বাকুনিন তার নাশকতার চিন্তাকে দার্শনিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নৈরাজ্যবাদী সমাজ কীরকম হবে সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট রূপরেখা বাকুনিনের চিন্তায় ছিল না। যে সামাজিক দায়িত্ব কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো বহন করে, প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়ার আগে জনতা সে দায়িত্ব গ্রহণ করবে কীভাবে, নতুন অভ্যাস নীতি মূল্যবোধ-ও বা গড়ে উঠবে কীভাবে বাকুনিনের চিন্তায় এসবের কোনো হদিশ মেলে না।

> "এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন যদি তাঁর সকল স্বপ্ন সফল হয় তা হলে তিনি কি করবেন। তিনি জবাব দেন, 'আমি তৎক্ষণাৎ আমার গড়া জিনিসগুলো ভাঙতে শুরু করব'।"[৩০]

বাকুনিন যতটা ধ্বংসের কথা বলেছেন ততটা সৃষ্টির কল্পনা করেননি। যতটা নাশ ও ষড়যন্ত্রের কল্পনা করেছেন ততটা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেননি - বাকুনিন সম্পর্কে এই অভিযোগের তীর থাকলেও উনিশ শতকের নৈরাজ্যবাদের দর্শনে এবং আরও বৃহৎ পরিসরে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তায় বাকুনিনকে অস্বীকার করার উপায় নেই। নৈরাজ্যবাদকে পণ্ডিতদের বিদগ্ধ আলোচনার টেবিল থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে, দর্শনের কূট-জটিল পরিভাষার আওতা থেকে পথে-পল্লীতে মহল্লায় নামিয়ে এনেছিলেন বাকুনিন। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে ছিল বিপ্লবের বাণী, ধ্বংসের আহ্বান এবং এক পৃথিবী আশা — 'সাম্রাজ্য নিপাত হবে, রাজমুকুটগুলি খসে পড়বে, ধনীর বিত্ত আসবে গরীবের ঘরে, চাষী পাবে মুক্ত জীবন, ছোট ছোট স্বাধীন গণতন্ত্রের স্বেচ্ছাকৃত সম্মিলনে সৃষ্টি হবে নতুন সমাজ,'[৩১] দুনিয়া জানবে "The urge to destroy is also a creative urge."[৩২]

১.৬ পিটার ক্রপটকিন (১৮৪২-১৯২১) :

নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসে 'নৈরাজ্য' শব্দটি যখন আরও বেশি করে 'সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছিল' সেই সময় সমাজের অনুসঙ্গ থেকে 'নৈরাজ্য' কে মুক্ত করে নৈরাজ্যবাদকে একটি কমিউনিস্ট দার্শনিক মাত্রায় যিনি উত্তীর্ণ করতে চেয়েছিলেন তিনি পিটার ক্রপটকিন। নৈরাজ্যের ইতিহাসকারেরা এই মানুষটি সম্পর্কে 'The Revolutionry Evolutionist' এই আখ্যা ব্যবহার করেছেন।

রাশিয়ার অভিজাত পরিবারে জন্মানো ক্রপটকিন ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক জমিদারির মাঝে বসে হতভাগ্য ভূমিদাসদের দুর্দশা এবং পতনোন্মুখ অভিজাত শ্রেণির দম্ভ প্রত্যক্ষ করেন। সেন্টপিটার্সবার্গে সামরিক শিক্ষা নেওয়ার পর সেনাবাহীনিতে যোগ দিয়ে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নেন সাইবেরিয়ায়। রুশ সরকারের বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের বিদ্রোহ, সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত বিদ্রোহীদের ব্যর্থ অভ্যুত্থান ক্রপটকিনকে প্রভাবিত করলে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেন্টপিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটিতে এসে অঙ্ক ভূগোল নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সাইবেরিয়ার অনেক অজানা অঞ্চলে অভিযান করে অনেক মূল্যবান ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার করার পর আরও উচ্চস্তরের ভৌগোলিক গবেষণার বা লেখাপড়ার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। সাইবেরিয়ার অনেক অজানা অঞ্চলে অভিযান করে অনেক মূল্যবান ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার করার পর আরও উচ্চস্তরের ভৌগোলিক গবেষণা বা লেখাপড়ার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, যখন চারদিকে শুধু দুঃখদারিদ্র এবং এক টুকরো রুটির জন্য মানুষ লড়াই করেছে তখন গবেষণার সুখ বা যশের গৌরব ক্রপটকিনের আকাঙ্ক্ষিত নয়।

ক্রপটকিনের লেখার প্রাঞ্জলতা, যুক্তি ও তথ্যের মিশেল তাঁকে সাধারণের বোধগম্য করে তুলেছে। বাকুনিনের মত গরম কথায় লোককে তাতিয়ে তোলার রাস্তায় তিনি হাঁটেননি। তাঁর আবেদন ছিল মানুষের বুদ্ধি ও নৈতিক চেতনায়। ১৮৭৩ এর নভেম্বরে প্রকাশিত *Must We*

Occupy Our Selves এবং *Examination of the Ideal of a Future System?*-এই ক্রপটকিনের সমাজধারণা বিবৃত হয়েছিল। অনেকের মতে নৈরাজ্যবাদী দর্শনে তাঁর প্রধান অবদান একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টা করার প্রয়াস। নৈরাজ্যের সমাজ কল্পনার আকাশ থেকে নেমে আসবে না। জনসাধারণের চেতনার বিকাশের জন্যও বসে থাকবে না। সমাজবিকাশের অব্যর্থ নিয়মেই নিরাজ সমাজ তৈরি হবে। সমাজের ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করে অসংখ্য যুক্তি ও তথ্য পেশ করে ক্রপটকিন দেখিয়েছেন যে সমাজের গতি শাসনহীন যুথকেন্দ্রিক সমাজের দিকে। মানুষের সমাজ প্রকৃতির মতই নিয়ম অনুসরণকারী। সমাজের সজীব, সহজ সামঞ্জস্যের জায়গায় যখন রাষ্ট্র বা আইনের অচলায়তন স্থাপন করবার চেষ্টা করা হয় তখন বিপ্লব হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। এই বাস্তব বিবর্তনের অনিবার্য সত্যতার ওপরই বৈজ্ঞানিক নৈরাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত।

Law and Authority এবং *State : It's Historic Role* এই দুটি বইতে ক্রপটকিন রাষ্ট্র ও আইনের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন। আদিম সমাজে আইন ছিল না, ছিল অভ্যাস ও প্রথা। তাতেই শান্তি এবং সামঞ্জস্য বজায় থাকত। কারোর কোনো সম্পত্তি ছিল না তাই সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বা সম্পত্তি রক্ষার আইনেরও দরকার ছিল না। যাযাবর জাতি কৃষিকাজ শিখে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলল। একাধিক জাতির মিলনে মিশ্রণে তৈরি হল গ্রামসমাজ। আদিম যৌথ জীবনে জমিজমার মালিক সারা গ্রাম আর সমাজবিধির রক্ষক পঞ্চায়েত। সে সময় আইনের শাসন ছিল না কিন্তু ছিল কুসংস্কার অন্ধ গতানুগতিকতা ভয়। যেসবের সুযোগ নিয়ে স্বার্থসন্ধানীরা এসে আধিপত্য বিস্তার করল, পঞ্চায়েতের জায়গা নিল কাজীর বিচার, রাজদণ্ড আর সেই দণ্ড বলবৎ করবার জন্য পাইক, লাঠিয়াল, বরকন্দাজ। ক্রপটকিন সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসকে আমাদের সামনে রেখে দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে ও কেন নৈরাজ্যবাদী সমাজই আমাদের ভবিতব্য এবং একসময় নিরাজ সমাজেই আমরা শান্তি ও স্বতঃস্ফূর্তিতে ভালো ছিলাম।

> "রাষ্ট্র শাসন চালায় আইনের মাধ্যমে। স্বৈরাচারের যুগে আইনের মাহাত্ম ছিল না, রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন, রাষ্ট্রের নীত। স্বৈরাচারের উচ্ছেদ করল মধ্যবিত্ত শ্রেণি- ফরাসি বিপ্লবের কাল থেকে তাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করল এবং আইনশাস্ত্র রচনা করে তার বলে শাসনের গদিতে কায়েম হয়ে বসল।"[৩৩]

পাশাপাশি যন্ত্রশিল্প ও ধনতন্ত্র তৈরি করল নিদারুণ ধনবৈষম্য। সম্পদ তৈরি করে শ্রমিক কিন্তু উৎপাদনের যন্ত্র ধনবানের করায়ত্ত। শাসকেরাও বড়লোকের কথাই শোনে। ধনতন্ত্র চার্চ কিংবা রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্র দিয়ে এই বৈষম্য দূর করা যাবে না। নৈরাজ্যের সমাজই একমাত্র সমাজবিধান। যেখানে মানুষ শ্রেণি শোষণ ও রাষ্ট্র শাসনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। ১৯০৭ সালে *Russian Revolution and Anarchism* বইতে ক্রপটকিন দাবি করেন চাষীর হাতে জমি চাই, মজুরদের ইউনিয়নের হাতে চাই কারখানা, খনি, রেলপথ ইত্যাদি। *রুটির জয়* বইতে ক্রপটকিন পেশ করেছেন নিরাজ সমাজের অর্থনৈতিক নকশা। নিরাজ সমাজে সকলে সমান হবে, কাউকে কোন মালিকের কাছে শ্রম অথবা বুদ্ধি বিক্রি করে খেতে হবে না। সকলে যার যার সমিতির মারফৎ উৎপাদনের কাজে বুদ্ধি এবং শক্তি নিয়োগ করবে, সমিতিতে কোন জোর জুলুম নেই। ব্যক্তির কর্তৃত্ব কোথাও থাকবে না কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির উদ্যম ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকবে যথেষ্ট।

> "ক্রপটকিন নৈরাজ্যবাদের অর্থনৈতিক রূপায়নে সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য এনেছেন। তাঁর হাতে শুধু যে প্রুদঁ ও বাকুনিনের যুক্তকরণের নীতি বিস্তারিত হয়েছে তা নয়, এ নীতির সঙ্গে গোটা সমাজ দর্শনের ঐক্য সাধন হয়েছে। গডউইন ছিলেন ব্যক্তিপ্রবণ, কোন প্রকার সহযোগীতার কল্পনাকে তিনি আমল দেননি। প্রুদঁ ব্যক্তিপ্রবণ হলেও পারস্পরিক যুক্তি ও যুক্তকরণের উপর জোর দিয়েছেন। বাকুনিন ছিলেন যৌথবাদী, ফেডারেশনের পিরামিডে তিনি পেয়েছেন একতা ও স্বাধীনতার সমন্বয়। ক্রপটকিন এই নকশার ফাঁক পূরণ করলেন প্রয়োজন অনুসারে অবাধ বিতরণের বিধি এনে এবং শ্রমকে শ্রমিকের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে। এই হল এনার্কিস্ট কমিউনিজম বা নিরাজ সাম্যবাদের ছবি যাকে কল্পনা থেকে নামিয়ে এনে বৈজ্ঞানিক আকার দিয়েছেন ক্রপটকিন।"[৩৪]

নৈরাজ্যের ধারণা এবং ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর এবার আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এই ধারণাটির যোগসূত্র কী সেই প্রসঙ্গে প্রবেশ করব।

২. বাংলা সাহিত্যে 'নৈরাজ্য' ধারণার প্রাসঙ্গিকতা

নৈরাজ্য সম্পর্কে যে সমস্ত দার্শনিকরা আলোচনা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই বক্তব্যের সারমর্ম এই যে নৈরাজ্য শব্দটির সঙ্গে বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর ইত্যাদি অনুষঙ্গ জড়িত থাকলেও নৈরাজ্যের দর্শন কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীতে একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলে। বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বা যা চলে এসেছে তাকে ভেঙে নতুনের পরিকল্পনাই নৈরাজ্যের অন্যতম শর্ত। এই সিদ্ধান্তকে মাথায় রেখে আমরা দেখবার চেষ্টা করবো যে বাংলা সাহিত্যে ছয়ের দশকে হাংরি জেনারেশনের আন্দোলনের আগে আরও কোথাও এমন কোনও চিহ্ন রয়েছে কিনা যা ছয়ের দশকে বাংলা কবিতা, গদ্য তথা সামগ্রিক সাহিত্যে এহেন ভাঙচুর তথা দিক পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।

যদি আমরা উনিশ শতকের বাংলার দিকে তাকাই, দেখতে পাবো, সে সময় তৎকালীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে তথাকথিত নবজাগরণের আন্দোলন চলছে। সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যে নতুন বিষয়, নতুন ফর্ম নিয়ে যে মানুষটি আমাদের বিদ্রোহের পাঠকে প্রথম সঞ্জীবিত করেছিলেন, তাঁর নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অধ্যাপক ডা. শিশির কুমার দাস *মধুসূদনের কবিমানস* গ্রন্থে লিখেছেন, —

> "বাংলাদেশের রোম্যান্টিক আন্দোলনের নায়ক মধুসূদন। যে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য জাতির চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছিল, তারই প্রকাশ সেখানে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব সেদিনের সাহিত্য চিন্তায়, দর্শনে, সমাজভঙ্গীতে দেখা দিয়েছিল — আধুনিক কাল পর্যন্ত সে ধারাই চলেছে। সেই ব্যক্তিত্ব খুঁজেছে সুন্দরকে, রহস্যময়কে, ঐশ্বর্যকে, রাবণের মতো elemental শক্তিকে।"[৩৫]

আন্দোলনের নায়ক মধুসূদন। কেন? উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে কলকাতার বড়লোকদের সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা, জীবনধারার বিভিন্ন কুৎসিত প্রকাশের বিপরীতে যে নতুন চেতনা বয়ে এনেছিল তথাকথিত নবজাগরণ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার পাল তুলেছিলেন মাইকেল মধুসূদন

দত্ত। ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা ইংল্যণ্ডের গণতান্ত্রিক বিপ্লব গোটা পৃথিবী জুড়ে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উচ্ছ্বাস তৈরি করেছিল, যেন তারই বলে বলীয়ান হয়ে মাইকেল প্রথম লিখলেন বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের গুণগান। খেয়াল করলে দেখব, মাইকেলের দুটি মহাকাব্যই আসলে দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাহিনি। *তিলোত্তমা সম্ভব* কাব্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুই দানব। আর *মেঘনাদ বধ* কাব্যে গোটা উত্তর ভারত যাঁর পায়ে প্রণত, আমাদের সংস্কারে ও ঐতিহ্যে যিনি প্রণম্য, সেই অবতার রামের বিরুদ্ধে লঙ্কার যুদ্ধের কাহিনি। কার্তিক-শিব-পার্বতী-মহামায়া প্রভৃতি দেবদেবীরা যাঁরা মেঘনাদ হত্যায় সাহায্য করেছিল, সেই সমস্ত দেবতাদের বিরুদ্ধেও রাবণ ও মেঘনাদ যুদ্ধ করেন। "দেবতার বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের আইডিয়াই আসলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দান বিশ্বসাহিত্যে।"[৩৬] উল্লেখ্য, রেনেসাঁর কালে আমরা যে মানবিক দ্বন্দ্বগুলোর মুখোমুখি হচ্ছিলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি যে যুক্তি ও তর্কের অনুশীলন চলছিল নিরন্তর, তা দিয়েই যেন এই প্রশ্ন উঠেছিল যে দেবতারা অন্যায় করতে পারেন কি না। আর তাই *মেঘনাদ বধ*-এ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদকে লক্ষ্মণ যেভাবে হত্যা করেন তাতে নৈতিকতা এবং অনৈতিকতার প্রশ্ন জুড়ে দেন মধুসূদন। বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম দেবতাকে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতার সূচনা হয়। ১৮৬৬ সালের ২৬ জুন লণ্ডন থেকে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে লিখছেন —

> "আমার যা আছে তা নিয়ে যা খুশি করার অধিকার আমার আছে... এজগতের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতন আমিও বাজি খেলব এবং নিজের হৃদয় ও মন যতটা শক্তি জোগাবে, ততদূর পর্যন্ত লড়ে, হয় দাঁড়াবো, নাহয় ধরাশায়ী হব।"[৩৭]

এই বাজি ধরতে গিয়েই মধুসূদন তাঁর একাধিক রচনায় মূল চরিত্র হিসেবে তুলে আনলেন পুরাণের একাধিক নারী চরিত্রকে। নিজেদের আকাঙ্ক্ষা, আশা-নিরাশা নিয়ে উনিশ শতকে

বাংলার সমাজে চিত্রিত হলো নারীর অবস্থান। *বীরাঙ্গনা* কাব্যে 'সোমের প্রতি তারা' পত্রটিতে তারার মুখে মধুসূদন বলালেন, —

"কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য কহ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একা সনে!
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি!
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা মণি!"[৩৮]

উনিশ শতকের খিস্তি-খেউরময় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে নারীর এহেন স্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ মধুসূদনের তৈরি নারীচরিত্রগুলোকে পৌঁছে দিয়েছে অন্য মাত্রায়, যেখানে নারীর অবস্থান শুধুমাত্র পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য নয়, স্বাতন্ত্র নিয়ে নিজের অধিকার অথবা আকাঙ্ক্ষার কথা সে বলে উঠতে পেরেছে মধুসূদনের কলমে। শুধুমাত্র বিষয়ের নির্বাচনেই নয় বা বিষয়ের উপস্থাপনেই নয়, সেই বিষয়কে উপস্থাপন করার ভঙ্গিতে, নতুন ছন্দ আমদানীতে অথবা শব্দের ব্যবহারে মধুসূদন আমাদের আবহমান সংস্কার এবং সাহিত্য বিষয়ক অভ্যাসকে প্রথম ধাক্কা দিয়েছিলেন উনিশ শতকে। আমাদের বিচারে নতুন শব্দের খোঁজ অথবা নতুন সাহিত্যের বাঁক বদল যা নৈরাজ্যময় সাহিত্যের অন্যতম চিহ্ন হতে পারে, মধুসূদনের আবির্ভাব এবং মধুসূদনের সাহিত্যকীর্তি নিঃসন্দেহে তার অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বাংলা সাহিত্যে।

বিদ্রোহের যে সুর বেঁধে দিয়েছিলেন মধুসূদন তাই-ই যেন আরও ব্যপ্ত চেহারা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে উঠে এলো বিশ শতকের প্রথম লগ্নে। মহাযুদ্ধের ক্লিন্নতা, ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব, এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হয় ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব। *By*

Interpretetion Of Dreams এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। একে একে *The Psychology Of Everyday Life*, *On Dreams* প্রকাশিত হতে থাকে ১৯১৪-য়। যুদ্ধের পর গোটা ইউরোপে এবং আমাদের দেশেও ফ্রয়েডের এই সব গ্রন্থ ও গ্রন্থবাহিত চিন্তাভাবনা মহাযুদ্ধের অবসাদগ্রস্ত তরুণ যুবকদের নতুন উত্তেজনা ও কৌতুহল সঞ্চারিত করেছিল। বিশেষত ফ্রয়েড অনুসারীদের মতে মানুষের যে অবচেতনা, যা মানব মনের নিয়ন্ত্রক, সেই অবচেতনার ক্ষেত্রটি একটি চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার লীলাভূমি। শুধু তাই নয়, এই অবচেতনার উৎস সেক্স বা যৌনানুভূতি। এহেন তত্ত্বকে সামনে রেখে *কল্লোল* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল তরুণ সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন, যাঁদের সামনে সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও কথাসাহিত্যের প্রতি বাস্তবতার অভাবের অভিযোগ তুলে বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও প্রকরণকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করতে চাইলেন অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব বসুরা। আমাদের বিচারে ছয়ের দশকে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা অথবা বাংলা সাহিত্যে অভ্যাসের বাইরের বিষয়কে আমদানি করার যে চীৎকৃত প্রচেষ্টা তার ভিত্তিভূমি তৈরিতে *কল্লোল* পত্রিকা গোষ্ঠীর অবদান কম নয়। —

> "আমাদের দেশে যাঁহারা কথাসাহিত্য লেখেন, তাঁহাদের দরিদ্র জীবনের অভিজ্ঞতা নাই।... তাই সহানুভূতি সত্ত্বেও তাঁহারা দরিদ্র জীবনের করুণ মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকিতে পারেন না।"[৩৯]

কিংবা অচিন্ত্যকুমারের মতে, —

> "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাথে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।"[৪০]

যৌন মনস্তত্ত্ব, দারিদ্রের অভিজ্ঞতা — রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে এ-দুয়ের অভাব চিহ্নিত করে দরিদ্র জীবনের করুণ ছবি পৃথিবীর অপজাত, অবজ্ঞাত মানুষের কথা সাহিত্যে তুলে আনতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন কল্লোলের তরুণরা। যে ধারায় বাংলা সাহিত্য এগিয়ে যাচ্ছিল গল্প অথবা কবিতায়, তার মধ্যে যেন মানুষের ভেতরকার গভীর, গহীন, গোপনতম অন্ধকারকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তুলতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন এঁরা। তাই *কল্লোল* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আমরা পেলাম যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদ, মোহিতলাল মজুমদারের বলিষ্ঠ দেহাত্মবাদ, নজরুলের বেপরোয়া বিদ্রোহী যৌবন ধর্ম — আর এভাবেই যেন বাংলা সাহিত্য সরে আসতে চাইল রবীন্দ্রনাথের ধারা থেকে। একদিকে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের আর্থিক সঙ্কট, অন্যদিকে বিবাহ অতিরিক্ত যৌন সম্পর্ক কিংবা বোহেমিয়ান জীবনের প্রতি টান — এসময়ের বিভিন্ন লেখকের রচনার বিষয় হয়ে উঠল। দেশ, জাতি, সমাজ, প্রথা সবকিছুকে প্রবলভাবে অস্বীকারের প্রবণতা নিয়ে তাঁরা হয়ে উঠলেন প্রতিবাদ, আঘাত ও বিদ্রোহের প্রতীক। আলোচকদের মতে কল্লোল গোষ্ঠীর নয়টি গুণ আমাদের সাহিত্যের ধারায় সঞ্চারিত করেছিল। এক, নবীনতা সাধনা; দুই, প্রচলিত সমাজের ধর্ম, নীতি ও প্রেমের আদর্শবাদী ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; তিন, কথাসাহিত্যের বিষয়সীমার প্রসার; চার, বাস্তবতার নতুন মাত্রা দান, যৌনতা ও প্রকৃতিবাদের প্রতিষ্ঠা; পাঁচ, বাস্তবতার সঙ্গে রোম্যান্টিকতার সংমিশ্রণ; ছয়, কথাসাহিত্যে গণচেতনার প্রসার; সাত, পথের ভিখারী থেকে বস্তিবাসী, কুলিকামিন, মধ্যবিত্ত বেকার যুবক — সবাইকে সাহিত্যের মলাটে জায়গা করে দেওয়া; সাত, পঙ্কিল নগর চেতনা — প্রধানত কলকাতার ক্লিন্ন নগরজীবন; আট, আঞ্চলিক জীবনবোধ; নয়, প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা। ছয়ের দশকে হাংরি জেনারেশন ইস্তেহার লিখে প্রথাগত লেখালেখির ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার কথা জানিয়েছিল আমাদের। অথচ তার কত আগে কল্লোলের সাধনা হয়ে উঠেছিল নবীনতার সাধনা। কারণ কল্লোল আধুনিকতাকে আহ্বান করছিল —

"আধুনিক মানেই প্রগতিপন্থী। প্রগতি মানেই প্রচলিত মতানুগত না হওয়া।"[৪১]

প্রচলিত সমাজের ধর্ম, নীতি, প্রেম সম্পর্কে আদর্শবাদী চিন্তাধারার উল্টোদিকে সংশয়ী এবং নাস্তিক্য বুদ্ধি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন একদল সাহিত্যিক। দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুলচন্দ্র নাগ, শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, মণীন্দ্রলাল বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যুবনাশ্ব, বুদ্ধদেব বসু, অজিত কুমার দত্ত — এঁদের প্রত্যেকের বিদ্রোহের অন্যতম পরিচয় হয়ে ওঠে — অপজাত, অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের কথাকে বাংলা সাহিত্যে চিৎকৃত ভাবে প্রকাশ করা। একাধিক অভিভাষণে ও লেখায় রবীন্দ্রনাথ এই চিৎকারকে সাহিত্যের বাজারে 'হট্টগোল' বলতে চাইলেও 'কল্লোল'-কালের মতে —

> "আধুনিকতা যে শুধু দেশ ও জাতিকে মানে না তা নয়, পরিবার — প্রথাকেও সে অস্বীকার করে। অন্তত কাজের বেলায় তাই দেখা যাইতেছে। কাজেই সবটা মিলিয়া দাঁড়াইয়াছে এই যে, মানুষ মনে মনে যাযাবর হইয়া পড়িয়াছে।"[৪২]

যে বোহেমিয়ান জীবনযাপনের ইতিহাস হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যিকদের রচনায়, স্মৃতিচারণে পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে, হয়ত তারই উৎসভূমি তৈরি করে দিয়েছিল কল্লোল এবং কল্লোলের এই বিদ্রোহ ও কল্লোলের সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য আলোচনায় একাধিক ক্ষেত্রে মূল বিষয় হয়ে উঠে এসেছে যৌনতার প্রতি তাঁদের বিশেষ মনোযোগ অথবা তাঁদের লেখালেখির ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে যৌনতা। কিন্তু হাংরি জেনারেশনের আবির্ভাবের কত আগে আধুনিক যৌবনের স্থূলতা বিকৃতিকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর রচিত উপন্যাসের নায়ক বলে ওঠে —

> "আধুনিক যৌবনের লক্ষণ হচ্ছে একটা অগভীর, চিন্তাহীন সুখবাদ ; যখন যা-ভালো-লাগে-তাই করো, gather-ye-rosebuds-while-ye-may... সমস্ত বিষয় উচ্ছৃঙ্খল হতে হবে ; কোনো নিয়মের অধীনে না থেকে চলতে হবে খেয়ালের বশে, যৌন স্পৃহা মুহূর্তের জন্য চুলবুল করে উঠলেই যে করে হোক সেটা মেটাতে হবে ; কোনো

> কাজ যদি করতেই হয়, তাতে ফাঁকি দেয়া, সেটা ভালোমতে না-করাটাই গৌরবের।"[৪৩]

যৌনতা বিষয়ে অথবা আধুনিক যৌবন বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর চরিত্রের এই বক্তব্য হাংরি জেনারেশনের একাধিক লেখার সঙ্গে সমাপতিত হয়ে যায় নিমেষেই। নৈরাজ্য যা আসলে প্রথাগত যাবতীয় মূল্যবোধ এবং আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে, নৈরাজ্যের ধারণা, যা চিরাচরিত অভ্যাসকে ভাঙতে চায়, তার ধারা খুঁজতে গেলে বাংলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশনের তথাকথিত চীৎকৃত বিদ্রোহের আগে কল্লোলের আবির্ভাব তথা কল্লোলের সাহিত্যিক ক্রিয়াকর্মকে অস্বীকার করা যাবে না।

কল্লোল-এরই সূত্র ধরে আমরা এবার পৌঁছে যেতে পারি ১৩৪২ বঙ্গাব্দে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত *কবিতা* পত্রিকার কথায়। সমসাময়িক যেসব বাণিজ্যিক, আধা-বাণিজ্যিক বা অ-বাণিজ্যিক পত্রিকা প্রকাশ পেত সেই সব পত্রিকায় কবিতা বিষয়ক কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না। উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধের সঙ্গে নিতান্তই তাচ্ছিল্য কিংবা বদান্যতায় প্রকাশিত হত কবিতা। বাংলা সাহিত্যে কবিতাকেন্দ্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে —

> "বলা যায় কবিতা পত্রিকা কে কেন্দ্র করেই প্রথম কবিতা আন্দোলন সংগঠিত হলো।"[৪৪]

বিদেশী কাব্যভাবনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কবিতার অনুবাদ বিদেশী কবিদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিল এই পত্রিকা। আলাদা করে কোনো ইস্তেহার বা কবিতা বিষয়ক আন্দোলনের বক্তব্য প্রকাশিত না হলেও এই পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতা ছিল, যা প্রকাশিত হত সম্পাদকীয় মন্তব্যে। দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় বলা হয়েছে —

> "রাজনীতির যে প্রেরণা, ভাবালোকের, তা থেকে যে কবিতা রস আহরণ করেছে তাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু যে রচনা শুধু সেকেলে গতানুগতিকতার বদলে এনেছে গতানুগতিকতার সমষ্টি, তাকে আমরা বর্জন করার দিকেই লক্ষ্য রেখেছি।..."[৪৫]

আমরা বাংলা সাহিত্যে হাংরি আন্দোলনের তথাকথিত নৈরাজ্যময় সাহিত্য প্রকাশের পূর্বসূরী কিছু ধারার সন্ধান করছি এবং সেক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন থেকে শুরু করে কল্লোল হয়ে কবিতা কেন্দ্রিক আলোচনার *কবিতা* পত্রিকার পাশাপাশি উল্লেখ করতে হবে বাংলা গল্প বিষয়ক প্রথম আন্দোলনের কথা। ঠিক আন্দোলন হিসেবে সংগঠিত না হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলা গল্পের গতিপ্রকৃতি কী হবে, কিংবা রবীন্দ্রনাথের হাতে তৈরি হওয়া বাংলা ছোটোগল্পের যে সুবিন্যস্ত চেহারা বাংলা সাহিত্য দেখেছিল, তার পরবর্তী সময়ে একাধিক বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিভিন্ন উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা গল্পের পরিবর্তিত রূপটি কী হতে পারে, সে বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন ১৯৫৮-৫৯ সালে বিমল কর। ছোটোগল্পের একটি সিরিজ তিনি প্রকাশ করেন, যার নাম *ছোটোগল্প নতুন রীতি*। প্রথম চারটি সংখ্যায় ছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিহির গুপ্তের গল্প। নতুন রীতি শব্দটির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। ছোটো গল্পের ক্ষেত্রে এই নতুন কিছু আনবার চেষ্টা করছিলেন বিমল কর। আর তাই হাংরি জেনারেশনের তথাকথিত নতুন কথা বলবার পৃষ্ঠভূমি হিসেবে ছোটোগল্পের নতুন রীতিও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। বাংলা গল্পের নতুন রীতির দুনিয়া খুঁজতে গিয়ে কি বলেছিলেন বিমল কর? প্রথাগত বাংলা গল্পের আলোচনায় গল্প কাকে বলে, এই সমস্ত সংজ্ঞা আমাদের সামনে দেওয়ার পর ছোটোগল্পের নতুন রীতি বলে—

> "গল্পকথার প্রচলিত যে ব্যাখ্যা, আমরা তার সমর্থন করি না কিংবা বলা ভালো, বাহ্য ঘটনা পরম্পরা দিয়ে যে কাহিনি গ্রন্থণ, আমরা তাকে শিল্পময় গল্প বলতে কুণ্ঠিত। মানুষ মাত্রেরই গল্প শোনার লোভ প্রচুর। মাত্র এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে গিঁটে গিঁটে কৌতুহল উদ্রেক এবং রমণ চরিতার্থতার মতন এক সময় সমস্ত উত্তেজনার নিরসনকে যদি গল্প বলতে হয়, তবে সাহিত্যে একমাত্র গোয়েন্দা গল্পেরই স্থান থাকা উচিত, অথবা ওই ধরনের গল্পের।"[৪৬]

এবং —

> "আধুনিক জীবন আমরা সকলেই যাপন করি—যেহেতু এযুগে আমরা সকলেই জন্মেছি। কিন্তু সব লেখকই আধুনিক নন — এযুগে জন্মানো সত্ত্বেও। আধুনিক লেখক তিনিই যিনি তাঁর যুগের বিষয়ে সচেতন, তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন। নতুন ধারনা বা ভাবনা, নতুন ভাবে জানা অভিজ্ঞতা পুরোনো রীতির বোতলে ঢোকানো যায় না।... গল্প, ঘটনা, নাটকীয় মুহূর্ত, চরিত্র, সময়ের ঐক্য, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব ধারণার সঙ্গে বর্তমান ধারণার অনেক গরমিল..."[৪৭]

আর গরমিল বলেই যেন আধুনিক সময়ে ছোটোগল্পের আধুনিক প্রকরণকে আহ্বান করছিল ছোটোগল্পে নতুন রীতি। ১৯৬২-৬৩ তে ফালি কাগজে ইস্তেহার লিখে কিংবা হাংরি জেনারেশন পরবর্তীকালে *ক্ষুধার্ত, জেব্রা, উন্মার্গ, উঃ* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথার বিরুদ্ধে গল্প অথবা কবিতা লিখে যে হাংরি জেনারেশনের পথ চলা, তার প্রাক্-চিহ্ন হিসেবে বাংলা সাহিত্যের এই একাধিক ঘটনা তথা সাহিত্যকর্মকে আমরা উদ্ধৃত করতে চাই। কারণ নৈরাজ্যময় সাহিত্য আসলে তাই যা প্রথা, ধারাকে অস্বীকার করে নতুনের সন্ধানে তৈরি হয়।

> "Anarchism, then, really stands for the liberation of human mind from the domination of religion ; the liberation of the human body from the domination of the property ; liberation of the shakels and restraints of government. Anarchism stands for a social order based on the free grouping of individuals for the purpose of producing real social wealth, an order that will gurantee to every human being free access to the earth and full enjoyment of the nessecities of life, according to individual desires, tests, and inclinations."[৪৮]

আর এই কারণেই রাষ্ট্রের থেকে, ধর্মের থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত বিধিবদ্ধতার শেকল থেকে নৈরাজ্য মুক্তি চায়। তাই হাংরি জেনারেশন আন্দোলন যে নৈরাজ্যের সাহিত্য তৈরি করল, তার প্রকাশকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী এই সমস্ত ইতিহাস তথা ঘটনা।

তথ্যসূত্র :

১. Marshall, peter, 2008 : 3

২. I bid : 3

৩. বসু, অতীন্দ্রনাথ, ১৯৬৯ : ৩

৪. তদেব : ৫

৫. তদেব : ৬

৬. তদেব : ৬

৭. তদেব : ৬

৮. তদেব : ১৩

৯. তদেব : ৭৮

১০. Marshell, peter, 2008 : 191

১১. Ibid : 208

১২. Ibid : 234

১৩. বসু, অতীন্দ্রনাথ, ১৯৬৯ : ১০৬

১৪. তদেব : ১০৭

১৫. তদেব : ১১৭

১৬. তদেব : ১১৯

১৭. তদেব : ১১৯

১৮. তদেব : ১২০

১৯. তদেব : ১২৪

২০. তদেব : ১২৫

২১. তদেব : ১৪০

২২. সেন, সব্যসাচী, ২০১১-১২ : ২৮

২৩. বসু, অতীন্দ্রনাথ, ১৯৬৯ : ১৪৮

২৪. ভৌমিক, ননী, ২০১৪ : ৮০

২৫. বসু, অতীন্দ্রনাথ, ১৯৬৯ : ১৫৭

২৬. তদেব : ১৫৭

২৭. তদেব : ১৫৮

২৮. তদেব : ১৬৭-১৬৮

২৯. তদেব : ১৬৯

৩০. তদেব : ১৭৭

৩১. তদেব : ১৭৬

৩২. Marshell, Peter, 2008 : 263

৩৩. বসু, অতীন্দ্রনাথ, ১৯৬৯ : ২০৯

৩৪. তদেব : ২২৬

৩৫. মজুমদার, উজ্জ্বল (সম্পা,), ২০০৪ : ৪৪৪

৩৬. দত্ত, উৎপল, :

৩৭. তদেব : ৭৯

৩৮. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, ২০১১ : ১৩৭

৩৯. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, ২০১৪ : ১৫৬

৪০. তদেব : ১৫৮

৪১. তদেব : ১৭৬

৪২. তদেব : ১৭৮

৪৩. তদেব : ২০৬

৪৪. দত্ত, সন্দীপ, ১৯৯৩ : ১

৪৫. তদেব : ২

৪৬. তদেব : ৩০

৪৭. তদেব : ৩২

৪৮. Antliff, Allan, 2007 : 12

দ্বিতীয় অধ্যায়

নন্দনতত্ত্ব : ধারণা, ক্রমবিবর্তন এবং চর্চার ইতিহাস

১. নন্দনতত্ত্ব : ধারণা ও ক্রমবিবর্তন

নন্দনতত্ত্ব একটি প্রাচীন শাস্ত্র। এর উৎপত্তি শিল্পসৃষ্টির প্রথম তৎপরতার সমসাময়িক কালেই। যদিও কোনো শিল্পকে শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট তত্ত্বের পরিধিতে বেঁধে ফেলা যায় কিনা সে তর্ক আছে, তবু গত কয়েকশো বছরের শিল্প সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে নন্দনতত্ত্ব শিল্প বা সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করার পৃথক দর্শন বা বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। যেহেতু বিস্তৃত পরিধি জুড়ে এই আলোচনার বিস্তার তাই নন্দনতত্ত্বের সর্বজন স্বীকৃত অভ্রান্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সহজ নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন নন্দন তাত্ত্বিক দের অভিমত অনুসরণে আমরা নন্দন তত্ত্বের সংজ্ঞা ও ক্রমবিবর্তিত ধারণা পেশ করার চেষ্টা করব।

নন্দনতত্ত্ব বা Aesthetics শব্দটি গ্রিক 'aisthesis' থেকে এসেছে। গ্রিক 'aisthesis' শব্দটির অর্থ 'Sense Perception' বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষতা।[১] এই অর্থে নন্দনতত্ত্বকে প্রত্যক্ষণ শাস্ত্রও বলা যেতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃতে যাকে বীক্ষা শাস্ত্র বলা হয়। 'বীক্ষণ' যার অর্থ 'বিশেষ ভাবে দেখা'। এই সূত্রে গ্রিক প্রত্যক্ষণ আর সংস্কৃত 'বীক্ষণ' একই কর্মকাণ্ডের পরিচায়ক।[২] সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সংস্কৃত 'ইক্ষ' ধাতুর সঙ্গে গ্রিক 'aisthetikos' এর সাদৃশ্য উল্লেখ করেছেন—

> "Aisthetikos' ধাতুটি প্রধানতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে বুঝায় এবং গৌণতঃ যে কোন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এমনকি মানসিক সংকলন বা সংকল্প পর্যন্ত বুঝাইয়া থাকে।"[৩]

আবার *Penguin Dictionary of Literary Trms and Literary Theory* -তে পাচ্ছি –

> "aestheticism : A complex term 'pregnant' with many connotations. The actual word derives from Greek aistheta 'thing perceptible by the senses' , and Greek aisthetes denotes 'one who perceives".[৪]

'Aestheties' এই পরিভাষাটি প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন তা নিয়েও বিতর্ক আছে। *Encyclopaedia Britanica* উল্লেখ করছে –

> "The history of aesthetics puzzles the student by its paradoxes. Aesthetics as a branch of philosophical inquiry was constituted under its now familiaer name as late as 1750 by Alexander Baumgarten (1714-62) author of Aesthetica, a book in latin which was never reprinted or translated in modern language. If aesthetics is regarded as beginning with the publication of this highly successful little-read treatise, it will seem to be a modern invention and its history a relatively short one."[৫]

বাউমগার্টেন ১৭৫০ সালে *Meditationes philosophicae de nonullis ad poema pertinentibus*–বইয়ে প্রথম 'Aesthetics' শব্দটির আধুনিক অর্থ সীমাবদ্ধ করে দেন। বাউমগার্টেন-ই প্রথম তাঁর গ্রন্থে 'Aesthetics' শব্দটিকে একটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন।[৬] ১৭৯০ এ প্রকাশিত *Critique of Judgement* বই এ 'aesthetics' শব্দটি ব্যবহার করেন ইমানুয়েলকান্ট।[৭] ১৮৪৩ সালে F.T. Vischer তাঁর *Aesthetik oder Wissen Schaftdes Schonen* গ্রন্থে শব্দটি ব্যবহার করেন।[৮]

'Aesthetics' শব্দটির উৎস সন্ধানের পাশাপাশি আমরা দেখব এর চর্চার ইতিহাস গড়ে উঠেছে প্লেটো অ্যারিস্টটলের পরম্পরাবদ্ধ তাত্ত্বিক দার্শনিকদের হাতে, হোরেস, লঙ্গাইনাস প্রভৃতি হয়ে লেসিং-হেগেল-কান্ট-ক্রোচের ধারায়। বাংলায় 'Aesthetics' এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'নন্দনতত্ত্ব' কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন তা নিয়েও পন্ডিতমহলে তর্ক আছে। আলোচক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে 'Aesthetics' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেছিলেন।

> "নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজরা পৌন্ডের একটি কথা আছে। - ১৩৩৯ এর বৈশাখে '*আধুনিককাব্য*' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'The Study in Aesthetics' শীর্ষক এজরা পৌন্ডের একটি বিশিষ্ট কবিতার উল্লেখ করেছিলেন এইভাবে। সুতরাং

> 'Aesthetics'-এর প্রতিশব্দরূপে 'নন্দনতত্ত্ব' কথাটি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেছিলেন।"[৯]

আবার কারোর মতে –

> "নন্দনতত্ত্ব শব্দটা আমরা য়ুরোপীভাষার 'এসথেটিকস্' –এর পারিভাষিক বাংলা হিসেবে ব্যবহার করছি। কেউ কেউ 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' শব্দটিও এই অর্থে ব্যবহার করেন। এসথেটিকস্ কিন্তু সৌন্দর্য বা আনন্দের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়, ব্যাপক অর্থে এসথেটিকস্ এর বিষয় সর্ববিধ মানবিক অনুভূতি, বোধ এবং চেতনা। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীকে অচৈতন্য করে বা অঙ্গ বিশেষের অনুভূতি অসাড় করে যে অবস্থা আনা হয় তার বৈজ্ঞানিক নাম 'অ্যান-এস-থেসিয়া'।"[১০]

অর্থাৎ বাংলায় 'Aesthetics' এর প্রতিশব্দ কী হবে তার পাশাপাশি সেই শব্দের পরিধি বা অর্থের বিস্তৃতি কতটা হবে তাও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

> "এসথেটিকস্ মানুষের অনুভূতির সজাগ অবস্থার কার্যকারণ ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান। মানুষের সুখবোধ দুঃখবোধ, অনুরাগ বিরাগ, সংবেদন নির্বেদ, ভালো-লাগা, খারাপ লাগা, বহু বিচিত্র অনুভব ও আবেগ– সবই এ বিদ্যার অন্তর্গত হতে পারে।"[১১]

সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান দর্শনচর্চায় 'এসথেটিকস্' শব্দটির বহুব্যপ্ত অর্থকে সংকোচিত করে আধুনিক কালের নির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ ও ব্যবহার শুরু হয়। সেকারণেই 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটি 'এসথেটিকস্' শব্দের সেই সংকোচিত অর্থেরই পরিভাষা।

> " 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' শব্দটি ওই অর্থকে আরো একটু সঙ্কুচিত ক'রে ফেলে বলে মনে হয়। তার বদলে 'নন্দনতত্ত্ব' বেশী উপযোগী শব্দ।"[১২]

কাজেই প্রচলন অনুযায়ী নন্দনতত্ত্বকে দর্শনের একটি শাখা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি যা সৌন্দর্য উপলব্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অনেকের মতে শিল্পে এর প্রকরণ বহু প্রকার। আবার বিংশ শতাব্দীর মানসচেতনা অনুযায়ী এটি একটি বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত; যা শিল্পের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়জাত ও অতিন্দ্রীয় অনুভূতির সৌন্দর্য নিরূপণে মানব জীবনযাত্রার প্রেক্ষিতে নিরীক্ষা

চালায়। এখন যেহেতু নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় 'সুন্দর' একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় সে কারণেই নন্দনতত্ত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণে সুন্দরের ধারণাও গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বাউমগার্টেনের মতে যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য আর নান্দনিক জ্ঞানের লক্ষ্য সৌন্দর্য। 'পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত অংশগুলোর সুশৃঙ্খল বিন্যাস এবং সমগ্রের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য সম্পর্কই সৌন্দর্য।'[১৩] Winckelman-এর মতে — সৌন্দর্যশিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেই সৌন্দর্য মঙ্গল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং মঙ্গল নিরপেক্ষ। তাঁর মতে সৌন্দর্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়– ১) গঠনগত সৌন্দর্য, ২) কাব্যের সৌন্দর্য, ৩) প্রকাশের সৌন্দর্য। এদের মধ্যে প্রকাশের সৌন্দর্যই শিল্পের চরম লক্ষ্য।[১৪] কান্টের মতে আত্মনিষ্ঠ হয়ে দেখলে সৌন্দর্য সেই বস্তু যা সাধারণভাবে এবং অনিবার্য গতিতে যুক্তিকে এড়িয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে কোন প্রকার সুবিধা-নিরপেক্ষ শুধুমাত্র আনন্দ দান করে।[১৫] শীলারও কান্টের মতোই মনে করতেন যে শিল্পের লক্ষ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। সে সৌন্দর্যের উৎস বাস্তব লাভ নিরপেক্ষ আনন্দ। শেলিং এর দর্শন অনুযায়ী শিল্প জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আর আদি রূপের মধ্যে বর্তমান বস্তুর যথার্থ স্বরুপের অনুধ্যানই সৌন্দর্য।[১৬] হেগেলের মতে ঈশ্বর সৌন্দর্যরূপে প্রকৃতি এবং শিল্পে নিজেকে প্রকাশিত করেন। ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন দুটি উপায়ে–বস্তুতে এবং যেমন বস্তুতে গ্রহণ করে তার মধ্যে প্রকৃতিতে এবং আত্মায়। বস্তুজগতের মধ্যে ভাবব্রহ্ম যেভাবে উদ্ভাসিত হয় সেই জ্যোতির্ময় রূপেরই নাম সুন্দর। আত্মা এবং আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুমাত্রই সুন্দর।[১৭]

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন –

> "সৌন্দর্য একটি বিশেষ সামঞ্জস্য বা পরিচয়ের বোধ। বিশেষাত্মক এবং বিশিষ্টবোধ বলিয়া ইহার স্বরূপ লক্ষণ দেওয়া সম্ভব নহে। লাল কি, নীল কি, সবুজ কি, মধুর কি, তিক্ত কি, ইহার কোনও স্বরূপলক্ষণ দেওয়া সম্ভব নহে। প্রত্যেক রঙ বা স্বাদ বিশ্লেষাত্ম এবং বিশিষ্ঠাত্মক ; লালে লালে অসংখ্য ভেদ, আকারে রসের মধুরতা, চিনির মধুরতা, মধুর মধুরতা, গুড়ের মধুরতা ইহারা পরস্পর বিভিন্ন। এই

বিভিন্নতাকে লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে ; আবার ইহাদের প্রতেকের মধ্যেই নানা গুনঘটিত বা ঘটনাঘটিত বিশিষ্টতা থাকিলেও প্রত্যেকেই একটি স্বতন্ত্র বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়। সেই বিশেষের এমন কোনো সামান্য রূপ বা সাধারণ ধর্ম পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা কোনও সামান্য লক্ষণে তাহাদের প্রতীতি জন্মানো যায়। তাহাদের প্রত্যেকের বেলাই লক্ষণ করিতে গেলে বলিতে হয় চক্ষুরিন্দ্রিয়গত বা জিহ্বেন্দ্রিয়গত বিশিষ্ট হ্লাদজনকতাবচ্ছিন্ন জাতিবিশেষ। অথচ এরূপ লক্ষণের দ্বারা তাহাদের স্বরুপ কিঞ্চিমাত্রও বুঝাইতে পারা যায় না। সৌন্দর্যবোধও সেইরকম মনের একটি বিশেষবোধ– সেই বোধের সঙ্গে জড়িত আছে জ্ঞান আহ্লাদ এবং ক্রিয়াত্মকবৃত্তি। এই জন্য তাহার তটস্থ লক্ষণ দেওয়া সম্ভবপর কিন্তু স্বরূপলক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়।”[১৮]

সৌন্দর্যের সন্ধানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর্যবেক্ষণ —

“পন্ডিতের সামনে এসে সুন্দর দায়গ্রস্থ হলো- প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠল সুন্দরকে নিয়ে – তুমি কেন সুন্দর, কিসে সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি। সৌন্দর্যে সুন্দর বলেই সুন্দর, মনে ধরল বলেই সুন্দর, এ সহজ কথা সেখানে খাটলোনা, পন্ডিত সেই সুন্দরকে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন – কী নিয়ে সুন্দরের সৌন্দর্য। সেই বিশ্লেষণের একটি মোটামুটি হিসেব করলে দাঁড়ায় – ১. সুখদ বলেই তিনি সুন্দর, ২. কাজের বলেই সুন্দর, ৩. উদ্দেশ্য এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি দেন বলেই সুন্দর, ৪. অপরিমিত বলেই সুন্দর, ৫. সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর, ৬. সুসংহত বলেই সুন্দর, ৭. বিচিত্র-অবিচিত্র সম-বিষম দুই নিয়ে ইনি সুন্দর। এই সব প্রাচীন এবং আধুনিক পন্ডিতগণের মতামত নিয়ে সৌন্দর্যের সার ধরাবার জন্য সুন্দর একটি জাল বুনে নেওয়া যে চলে না তা নয়, কিন্তু তাতে করে সুন্দরকে ঠিক যে ধরা যায় তার আশা আমি দিতে সাহস করিনা।”[১৯]

‘সুন্দর’ এর ধারণার এইরকম বিভিন্নতাই বুঝিয়ে দিচ্ছে নন্দনতত্ত্বের আওতার বিষয় কী হবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এমনকি নন্দনতত্ত্বকে সৌন্দর্যতত্ত্ব হিসেবেও গ্রহণ করতে সকলে রাজী নন।

“সৌন্দর্যের বোধ কোনো অখন্ড, সার্বভূমিক, শ্রেণি-উত্তীর্ণ, ঊর্ধ্বায়িত ও নির্বিশেষ ধারণা নয়, বরং তা শ্রেণিতে শ্রেণিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সমাজে সমাজে – এমন

> কী হয় তো ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কমবেশি পৃথক। আমার সুন্দর আপনার সুন্দর পুরোপুরি না-ও হতে পারে। আমাদের সুন্দরের খানিকটা আপনাদের সুন্দর, বাকীটা নয়। সারা পৃথিবীর নাগরিক, মধ্য ও উচ্চবিত্ত লেখাপড়া করা সেই মানবসমাজ ও যে- সৌন্দর্যতত্ত্ব গড়ে তুলেছে, সেই নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে হুবহু এক হবে না গ্রামীন নিরক্ষরের নন্দনতত্ত্ব ; শ্রমিকের নন্দনতত্ত্ব পৃথক হবে মালিকের নন্দনতত্ত্বের থেকে, এমনকি দেশে দেশে সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে হয়ে যাবে নন্দনতত্ত্বের বিভাজন।"[২০]

অনেকে নন্দনতত্ত্বকে আনন্দতত্ত্ব বলেছেন। তাঁদের মতে শিল্পের জন্ম আনন্দ থেকে। শিল্পী আনন্দের অনুভূতিকেই শিল্পে ব্যক্ত করেন। আনন্দ দেওয়াই শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই 'Beauty is objectified pleasure'।[২১] আবার কারোর মতে নন্দনতত্ত্ব হচ্ছে Expression of feeling, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশ। এঁদের মতে ভাবকে প্রকাশ করার প্রেরণা থেকেই শিল্পের জন্ম, ভাবকে আস্বাদ্য করে তোলাই শিল্পের উদ্দেশ্য। এঁরা রসবাদী।[২২] নন্দনতত্ত্বকে প্রকাশের তত্ত্ব বলেছেন অনেকে। এঁদের মতে শিল্পের প্রেরণা থাকে আত্মার প্রকাশবৃত্তি এবং জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে। কল্পনাই শিল্পের আত্মা এবং কল্পনাবৃত্তি চরিতার্থ করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। তাই নন্দনতত্ত্ব হল — 'science of expression and general linguistics'। এই প্রকাশবাদীদের মতোই আরেকদল নন্দনতত্ত্বকে 'বীক্ষণতত্ত্ব' বা 'বীক্ষাশাস্ত্র' ভেবেছেন। এঁদের মতে শিল্প হল বিশেষ ধরণের বীক্ষণ। 'Art is experience… and expression of heightened experience'।[২৩]

এই সমস্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে নন্দনতত্ত্বের সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করার মতোই নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী তা এককথায় নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। নন্দনতত্ত্বকে সৌন্দর্য, আনন্দ, রস, প্রকাশ, বীক্ষণ- যে তত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত করা হোক না কেন- এর প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমিটি দার্শনিক সংস্কার দিয়েই তৈরি। আর এই ভিত্তির বৈশিষ্ট্যেই অধিবিদ্যামুলক (metaphysical), মনস্তত্ত্বমূলক (psychological), বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক

(experimental, speculative aesthetic, inductive aesthetic), সমাজবিজ্ঞান মূলক (sociological) – ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধি নন্দনতত্ত্বের উপর আরোপিত হয়েছে।

মানব চিন্তার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে দেখা যায়, আমাদের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক ধারণাটুকু একটি ছবি অথবা একটি কবিতার মতোই নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। যখন এই দার্শনিক ধারণার মধ্যে অঙ্গাঙ্গি যোগ স্থাপিত হয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা থেকেই নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। তাই বলা যায়, শিল্প- সৃষ্টির মধ্যে দার্শনিকতার বোধ আরোপ করাই নন্দনতত্ত্বের উদ্দেশ্য। শিল্প ও দর্শনের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এর বিস্তৃতি।

১.২ নন্দনতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস

১.২.১ পাশ্চাত্য ধারা

নন্দনতত্ত্বের সংজ্ঞা, পরিসরের পাশাপাশি এর ইতিহাসের আলোচনাও আমাদের কাছে জরুরি। কোন সময় কীভাবে নন্দনতত্ত্বের উন্মেষ এবং এর ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তনের রূপরেখায় আজ পর্যন্ত কত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, তর্ক এসে মিলেছে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করবে।

> "শিল্পতত্ত্বকে (এস্থেটিক) প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞান বলা হবে কি না এই প্রশ্ন নিয়ে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। শিল্পতত্ত্বের প্রথম উদ্ভব কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে? অথবা তার আগেই গ্রীসে রোমে শিল্পতত্ত্বের উৎপত্তি ঘটেছে? এই হচ্ছে প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটি শুধুমাত্র তথ্যের প্রশ্ন নয়, মানদণ্ডের প্রশ্ন। উত্তর কে কি বলবেন তা নির্ভর করবে শিল্পতত্ত্বের কি ধারণা তিনি পোষণ করেন তার উপরে, কারণ ঐ ধারণাকেই তিনি বিচারের মানদণ্ড হিসেবে প্রয়োগ করবেন।"[২৪]

নন্দনতত্ত্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে সবাই তাঁদের নিজ নিজ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই নন্দনতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ, যাঁর কাছে সৌন্দর্যতত্ত্বই নন্দনতত্ত্বের মুখ আলোচ্য, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, সৌন্দর্য চেতনার উন্মেষ থেকেই নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস সূচিত হয়েছে— তেমনি আনন্দবাদী বা প্রকাশবাদীরও নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী নন্দনতত্ত্বের উৎস ও বিকাশের অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন।

> "গ্রীসের শিল্পচিন্তার (নন্দনতত্ত্ব) উদ্ভব ঘটেছে — ভাস্কর্য, চিত্র ও কবিতা সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, কবিতার রচনাকালে কবিতার ভালোমন্দ বিচার করতে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তার মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর রচনাশৈলী সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার মধ্যে এবং কাব্য ও চিত্রের যে তুলনা সাইমোনাইডস ও সোফোক্লেস্ করেছেন তার মধ্যেও নন্দনচিন্তা উদ্ভবের বীজ রয়েছে। অনেকে আবার 'মাইমেসিস' বা অনুকরণ কথাটির আবির্ভাবের সঙ্গেও শিল্পচিন্তা উদ্ভবের কথা বলেছেন। অনেকে আবার শিল্পের উৎপত্তি কালকে পিছিয়ে নিয়ে যায়, সেই যুগে যখন প্রথম যুগের প্রকৃতিবাদী ও নীতিবাদী দার্শনিক বা কবিদের কাহিনী কল্পনা ও নীতির বিরুদ্ধে সমালোচন করেছিলেন, যখন হোমারের এবং অন্যান্য কবিদের সুনাম রক্ষা করার জন্য তাদের রচনার গূঢ় অর্থ বা রূপক আবিষ্কার করার চেষ্টা হয়েছে এবং যখন থেকে দর্শন ও কবিতার সেই বহু পুরাতন বিবাদ দেখা দিয়েছে।"[২৫]

অর্থাৎ নন্দনতত্ত্ব বা শিল্প চিন্তার উন্মেষের সময়কে অনেকেই প্রাচীন গ্রিসের শিল্পচিন্তার সময়ের পাশাপাশি রাখতে চেয়েছেন। ক্রোচের মতে প্লেটো (খ্রিঃপূঃ ৪২৮-৩৪৭) এর সময় থেকেই নন্দনতত্ত্বের আবির্ভাব।

প্লেটোর শিল্পসংক্রান্ত আলোচনার দুটো দিক আছে। একদিকে হল শিল্পের অধিবিদ্যক সংজ্ঞা এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও প্রসঙ্গ চিন্তা। প্লেটোর মতে শিল্পকর্ম হচ্ছে অনুকরণের অনুকরণ। একজন শিল্পী কী করেন? প্লেটোর ভাষায় স্পষ্টতই তিনি 'ইমিটেট' বা অনুকরণ করেন। কাকে অনুকরণ করেন? তিনি আইডিয়ার অনুকরণ করেন না,

প্রকৃতির অনুকরণ করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগত, যে জগতের বর্ণ আছে, গন্ধ আছে, সে জগতের অবিকল প্রতিরূপ এঁকে যান। সুতরাং শিল্পকর্ম নিঃসন্দেহে অনুকরণের অনুকরণ এবং শিল্পকর্ম যেহেতু অনুকরণের অনুকরণ সেজন্য তা সত্য থেকে তিন গুণ দূরে।[২৬] মানুষের শিল্পচিন্তার ইতিহাসে দেখা যায় — মানুষ তার প্রথম নৃত্যবাদ্যসংবলিত গানে সামাজিক মানুষেরই নানা আবেগের তথা আচরণের অনুকরণ করেছে। ভাস্কর্যে ও চিত্রে ব্যক্তি ও বস্তুর মূর্তি গড়ার চেষ্টা হয়েছে। বাঁশিতে বা বীণায় মানুষের ব্যক্তি আবেগকেই শব্দধ্বনিতে অনুকরণ করার চেষ্টা রয়েছে। গল্পে-কাব্যে দেবতা ও মানুষের যে সব কাহিনি রচিত হয়েছে, তাতেও শব্দ-সংকেতে জীবনের রূপকেই অনুকরণ করা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রথম যুগের শিল্প দার্শনিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন শিল্প হচ্ছে অনুকরণ (mimesis)। প্লেটো তাঁর অনুকরণ তত্ত্বের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম শিল্পতত্ত্বের মূল সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন এবং শিল্পকে দর্শনের পটভূমিকায় স্থাপন করে নন্দনতত্ত্বের বীজ রোপণ করেছেন। সুতরাং তিনিই প্রাচীন গ্রিসের প্রথম সচেতন নন্দনতাত্ত্বিক।

প্লেটোর পরই আসে তাঁরই শিষ্য অ্যরিস্টটল (খ্রিঃপূঃ ৩৮৪-৩২২) এর কথা। এথেন্সে নিজের স্কুল লূকেয়াম্ বা লাইসিয়াম এর ছাত্রদের পড়াতে গিয়েই আনুমানিক ৩৩০ খ্রিঃপূঃ নাগাদ তিনি তাঁর কাব্যতত্ত্ব বা *Poetics* বইটি রচনা করেন।

> "'রচনা করেন' বলাটা সম্ভবত ভুল হল। বইটি মনে হয় ক্লাস নোটের খসড়া, পড়ানোর সময় বিস্তৃত ব্যাখ্যা করতেন।...এই পুস্তিকাই ইয়োরোপের শিল্প ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রথম স্বাধীন আলোচনা। তার পর থেকে প্রায় তেইশ শো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তা সত্ত্বেও এই বইকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া সম্ভব হয় নি।"[২৭]

শিল্প কী? এই প্রশ্নের উত্তরে অ্যারিস্টটল বললেন — শিল্প স্বভাবকে অনুকরণ করে (Art imitates nature)। শিল্পকে অ্যরিস্টটল অনুকরণ বললেন বটে কিন্তু অনুকরণ সংক্রান্ত তর্ক

তাতে মিটলো না। বিশেষত এই অনুকরণকে কেন্দ্র করেই শিল্পের প্রতি মিথ্যাচারের অভিযোগ এনেছিলেন প্লেটো। অ্যারিস্টটল প্লেটোর নীতিনির্ভর আপত্তির জবাব দিয়েছিলেন এইভাবে — শিল্প অনুকরণ এবং অনুকরণ স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক। যা স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক তা ক্ষতিকর কেন হবে? পাশাপাশি, অনুকরণ শিল্পের সাধারণ লক্ষণ, কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিল্পকে চেনার জন্য তিনটি মাত্রা বা মাপকাঠি গড়ে তুললেন অ্যারিস্টটল।

১. অনুকরণের বাহন (medium of imitation)

২. অনুকরণের বিষয় (object of imitation)

৩. অনুকরণের প্রকার (manner of imitation)[২৮]

অ্যারিস্টটল শিল্পকে স্বাধীন ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। তাঁর মতে শিল্পের লক্ষ্য আনন্দ। শুধু তাই নয়— প্রত্যেক শিল্পের উপভোগের আনন্দ আলাদা।

প্লেটো-অ্যারিস্টটলের পরে নন্দনতত্ত্বের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা খুব একটা না এগোলেও, শিল্পের আনুষঙ্গিক ও অপরিহার্য ধর্ম, সুষমা, সৌন্দর্য প্রভৃতির সংজ্ঞা বিষয়ে নতুন নতুন ধারণা তৈরি হয়েছে। ৩২০ খ্রিঃপূঃ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিষয়ে 'স্টোয়িকপন্থী' ক্রাইসিপ্পাস, পোসেইকোনিয়াস, 'এপিকুরাসপন্থী' ফিলোডিমাস, প্রমুখদের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন রোমে একই সঙ্গে কবি ও কাব্যতাত্ত্বিক হিসেবে হোরেস (খ্রিঃপূঃ ৬৫ অব্দ - খ্রিঃপূঃ ৮ অব্দ) বহুল পরিচিত। কবি ও কবিতার আলোচনা দিয়ে হোরেস শিল্প-আলোচনাই করেছেন। সামর্থ্য অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন এবং বিষয়ের গভীর অনুধ্যান থেকে কেউ হয়ে ওঠেন কবি। কিন্তু কবি তো বাণী-শিল্পী। তাই প্রজ্ঞা, মনন ও চিন্তনের সমবায়ে 'কবিতা' যখন ক্রমশ হয়ে ওঠে তখন কবিকে ভাবতে হয় তার প্রকাশযোগ্য ভাষা নিয়ে। প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের মতো শুধু সৌন্দর্যের সন্ধান নয় হোরেস 'মনোরম' এর প্রয়োজনও স্বীকার করেছেন। হোরেস-ই

নন্দনতত্ত্ব চিন্তার আদিযুগের সেই বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি বিশ্বাস করতেন— "If you want to move me to tears, you must first feel yourself."[২৯] এবং "Choose a subject that is suited to your abilities, you who aspire to be writters : give long thought to what you are capable of undertaking, and what is beyond you."[৩০] নিজে কবি বলেই হোরেস কবির শব্দ ব্যবহারের কৌশল জানতেন। অ্যারিস্টটল পাঠকের দিক থেকে শব্দ বা কাব্য-ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন। দৈনন্দিনের ভাষায় কবি কি করে জলতরঙ্গের ধ্বনি সৃষ্টি করবেন তার হদিস দিতে পারেন তিনিই- যিনি একই সঙ্গে কবি ও কাব্যতাত্ত্বিক। তাই হোরেসের মতে —

> "A man who chooses a subject within his powers will never be at a loss for words, and his thoughts will be clear and orderly."৩১

পরিচিত শব্দে কবিকে আনতে হয় অপরিচিতের দ্যোতনা- কবিতা সম্পর্কে এই নন্দনতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটি হোরেসের। ব্যবহারে ব্যবহারে কোনো শব্দ চালু হয়, তারপর ক্রমাগত ব্যবহারেই ক্ষয় পায় তার ঐশ্বর্য— এই সত্য মেনে নিয়েই নতুন শব্দ সৃষ্টিতে মন দেবেন কবি। একই সঙ্গে হোরেসের মতে কবিতায় শব্দের ব্যবহার হচ্ছে মানুষের যৌবনে অর্জিত শক্তি ও সামর্থ্যের বিকাশের মত।

> "As the woods change their foliage with the decline of each year and the earliest leaves fall, So words die out with old age; and the newly born ones thrive and prosper just like human beings in the vigour of youth."[৩২]

Roman Classicism-এর দুই কৃতী পুরুষ হিসেবে হোরেস এর প্রায় পাশাপাশিই উচ্চারিত হয় লঙ্গিনুস এর নাম। যদিও লঙ্গিনুস এর পরিচয় ও আবির্ভাবকাল নিয়ে বিতর্ক আছে। *On Sublime* নামের বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা লঙ্গিনুসের 'hypsos' শব্দটির প্রতিশব্দ রূপে 'Sublime' শব্দটি ব্যবহার করেও T.S. Dorsch নামক এই বইয়ের অন্যতম অনুবাদক

বলেছেন, একালে Sublime বলতে যা বোঝায় লঙ্গিনুস ঠিক সেই অর্থে hypsor শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি hypsor বলতে নাকি বুঝিয়েছিলেন 'excellence of expression' (প্রকাশের উৎকর্ষ) যার সাহায্যে কোনো কবি লাভ করেন অমর গৌরব।[৩৩] যে লেখা পাঠককে সেভাবে স্পর্শ করে না এবং পাঠকের অন্তরেও প্রতিক্রিয়া জাগায় না তা কোনোভাবেই sublime নয়। Sublime রচনা সমস্ত মানুষকে চিরকালের জন্য আনন্দ দেয়। অর্থাৎ যাকে আমরা সহজে চিরায়ত রচনা বলে থাকি, তাকেই লঙ্গিনুস sublime বলতে চেয়েছেন। লঙ্গিনুস এর মতে শিল্পকে আমরা তখনই সুন্দর বলি যখন তা 'নেচার' সদৃশ এবং 'নেচার' তখনই চিত্তাকর্ষণ করে যখন সে তার অভ্যন্তরস্থ আর্টকে লুকিয়ে রাখে। নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে কোনো নতুন সিদ্ধান্তের কথা না বললেও অ্যারিস্টটল উত্তরকালে শিল্পের মহত্ত্ব নিরুপণের যে চেষ্টা লঙ্গিনুস করেছেন তা উল্লেখযোগ্য।

নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে প্লুতার্ক (খ্রিঃপূঃ ৫০-১০০) 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য' এবং 'শিল্পের সৌন্দর্য' — এই দুই ধরনের সৌন্দর্যের ধারণাকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে যা বস্তুত কুৎসিত তা কখনোই সুন্দর হতে পারে না। সুন্দর বলে প্রশংসিত হয় কেবল অনুভূতি হিসেবে রচনার শক্তিটুকু। নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি আমাদের কোনো গভীর তত্ত্বকথা দিতে পারেন নি। তাঁর তুলনায় ক্রাইসোসস্তোম (খ্রিঃপূঃ ৩য় শতাব্দী) একাধিক তত্ত্ব দিয়েছেন। ক্রাইসোসস্তোম এর মতে শিল্প কোনো বাঁধাধরা আইডিয়ার অনুকরণ নয়, সৃজন ব্যাপার আসলে মনের মধ্যে উদ্ভূত ধারণাকে বাস্তব আকার দেওয়ার চেষ্টা। তিনি কাব্য ও অন্যান্য নির্মাণকলার ঐক্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন — কাব্যকলার ক্ষেত্র অন্যান্য কলার চেয়ে অনেক ব্যাপক, কাব্যকলা রূপের জগৎ ও ভাবের জগতকে সমানভাবে প্রকাশ করতে পারে, দেশ-কালের উর্ধ্বেও তার অধিকার অনেক বেশি।

প্রায় একই সময়ের (খ্রিঃপূঃ- ৩য় শতাব্দী) ফিলাসট্রেটাস নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। অনুকরণের কথা গ্রহণ করেও এর মতে শিল্প শুধুই অনুকরণ নয়, শিল্প নতুন নতুন রূপের উদ্ভাবন ঘটায়। তার মতে অনুকরণের উপরেও আরও একটি বৃত্তি আছে যা অদৃষ্টের রূপ তৈরি করে। এই বৃত্তির নাম কল্পনা। যদিও ফিলাসট্রেটাস কল্পনাতত্ত্বের আদলে নন্দনতত্ত্বের কোনো নতুন রাস্তার হদিস দিয়েছিলেন এমন নয় তবু একথা বলতেই হবে যে, কল্পনাবৃত্তির স্বভাব নির্ধারণ করার চেষ্টা করে, তিনি চিন্তাক্ষেত্রকে কিছু পরিমাণে পরিষ্কার করে চিন্তাকে বেশ এগিয়ে দিয়েছেন।[৩৪]

প্লেটো যেখানে শিল্পকে অনুকরণ এবং অনুকরণ বলেই মিথ্যা এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেখানে প্লোটিনাস (খ্রিঃপূঃ ২৯৫-২৭০) প্লেটোর আইডিয়া এবং ঈশ্বর-সত্ত্বার সংযোগে এমন এক দার্শনিক দৃষ্টিকোণ তৈরি করেছিলেন যাতে শিল্পকে মিথ্যা বা মায়া বলা যায় না। প্লোটিনাসের মতে প্রকৃতির অপূর্ণতাকেই শিল্পীরা পূর্ণ করেন শিল্পের মাধ্যমে। ভাবের আবেগে, বা যে কোনো চিন্তার দ্বারা এই প্রক্রিয়া যদি সংগঠিত হত তাহলে যে কোনো মানুষই শিল্প সৃষ্টি করতে পারতো, কিন্তু আদতে তা হয় না। প্লোটিনাসের মতে সৌন্দর্য তিনরকম— ১. মানবীয় প্রজ্ঞার সৌন্দর্য, ২. মানবাত্মার সৌন্দর্য ও ৩. প্রাকৃত সৌন্দর্য।[৩৫] নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে প্লোটিনাসের গুরুত্ব এখানেই যে তিনিই প্রথম যিনি শিল্পের জগতকে এবং সুন্দরের জগতকে এক করে দেখতে চেয়েছেন, শিল্পচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনাকে আধ্যাত্মিক আবেগের সঙ্গে একাকার করে দেখেছেন।

ইউরোপের ইতিহাসে যে সময় বা যুগ মধ্যযুগ ও রেনেসাঁ নামে চিহ্নিত তার নন্দনতত্ত্ব চিন্তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়, এই সময়ে শিল্পতত্ত্ব চিন্তায় উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে ক্রোচের মতামত — মধ্যযুগে এবং রেনেসাঁসে, প্রাচীন গ্রীক-রোমের সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।[৩৬] সপ্তদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে

ক্রোচের আরো পর্যবেক্ষণ যে এই শতাব্দীতে কয়েকটি নতুন শব্দের তাৎপর্য নিয়ে শিল্প সমালোচকেরা মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু নন্দনতত্ত্বের মূল কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন নি।[৩৭] পাশাপাশি দর্শনের ক্ষেত্রে এই যুগেই বুদ্ধিবাদ (intellectualism) এবং প্রত্যক্ষবাদের (empiricism) এর জন্ম হয়। বুদ্ধিবাদীরা সৌন্দর্যকে 'reason in the form of feeling' হিসেবে এবং প্রত্যক্ষবাদীরা সৌন্দর্যকে বিশেষ রসোপলব্ধি বা কাব্যের অভিব্যক্তি হিসেবে দেখেছেন। সার্বিক বিচারে বলা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর নন্দনতত্ত্বের ধারণা অতীত চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারে নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বাউমগার্টেন (১৭১৪-১৭৬২)। তিনিই প্রথম ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'Aesthetics' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে *Aesthetics* নামের গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[৩৮] এই শতকে নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে আরেকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ভিকো (১৬৬৫-১৭৫০) ইতালীয় নন্দনতাত্ত্বিক ভিকো সম্পর্কে ক্রোচের বক্তব্য —

> "যে প্রকৃত বিপ্লবী সম্ভাব্যতার ধারণাকে পাশে সরিয়ে রেখে এবং কল্পনাকে নতুনভাবে ধারণা করে কাব্যের ও শিল্পের যথার্থ প্রকৃতিটি অর্থাৎ শিল্পতত্ত্ব বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি হলেন ইতালীয় জা বত্তিস্তা ভিকো।"[৩৯]

ক্রোচের মতে নন্দনতত্ত্বের জনক বাউম্‌গার্টেন নন, ভিকো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নতুন বৈপ্লবিক চিন্তা দিয়ে ভিকোই নন্দনতত্ত্বকে সংহত রূপ দেন। তিনি মনে করতেন, চিন্তাকে ছন্দোবদ্ধে প্রকাশ করা যেতে পারে কিন্তু তা করলে কাব্য রচনা করা যায় না। তত্ত্বকথা ছন্দে লেখা হলেও তত্ত্বই থাকে। যে সব কবি নারীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য সম্বন্ধে মননাত্মক শ্লোক রচনা করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক, তাঁরা ছন্দবদ্ধ ভাষাতে যুক্তিবিন্যাস করেন। ভিকোর মতে কবিতা ও ইতিহাস মূলত একই। প্রথম কবিই ছিলেন প্রথম ঐতিহাসিক। তাঁর কবিতার কাহিনি ছিল বাস্তব ঘটনারই বিবরণ। কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক — এঁরা সকলেই সত্যকে

প্রকাশ করেন। কবিতা দেয় কল্পনাময় চিত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন দেয় বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্য এবং ইতিহাস দেয় সত্যের চেতনা।

টলস্টয়ের *What is Art* (বাংলা অনুবাদে 'শিল্পের স্বরূপ') থেকেও আমরা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর নন্দনতাত্ত্বিকদের সম্পর্কে জানতে পারি। টলস্টয় বাউমগার্টেনকেই নন্দনতত্ত্বের জনক বলেছেন এবং তারপর বাউমগার্টেনের অনুগামীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। মেইয়ের, এশনবুর্গ, এবেরহার্ড প্রমুখ অনুগামীরা বাউমগার্টেনের মতামতকে কিছুটা সংশোধন করেছিলেন। এদের পরে আরও যাঁরা নন্দনতাত্ত্বিক ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুলৎসার, মেনডেলসন্, মরিৎস্ প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য। এদের কারো কারো বক্তব্যে বাউমগার্টেনের মতের বিরোধিতাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন সুলৎসারের (১৭২০-১৭৭৭) মতে যা মঙ্গলময় একমাত্র তাই সুন্দর। মেনডেলস ও (১৭২৯-১৭৮৬) একইরকম ভাবে সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করতে চান।[৪০] সৌন্দর্যের বিকাশই শিল্প এবং যতক্ষণ তা সত্য ও মঙ্গলের রূপ লাভ না করে, তা আমাদের অনুভূতির কাছেও স্পষ্ট না। শিল্পের লক্ষ্যই হল নৈতিক পরোৎকর্ষ।

প্রায় সমসাময়িক লেসিং (১৭২৯-১৭৮১) সৌন্দর্য বলতে জড় সৌন্দর্যকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ Laokoon–এ লেসিং উল্লেখ করেন, কবিতা দিয়ে ছবির মতো বাহ্য সৌন্দর্য প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ওই সৌন্দর্য আমাদের মনে কেমন প্রভাব উৎপন্ন করে তার বর্ণনা দিয়ে কবি বাহ্য সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারেন। কবিতা এবং ছবির কাজ আলাদা এবং Art এর উদ্দেশ্য নিষ্প্রয়োজনের আনন্দ।

> "The aim or arts is pleasure which is not indispensable; and it may, therefore, depend upon the law-giver to decide and what degree of every kind he would allow."[৪১]

টলস্টয়ের মতে এই সময়ে ইংল্যন্ড, ফ্রান্স, ইতালিতে নতুন নতুন নন্দনতাত্ত্বিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল এবং এই মতবাদগুলো সবই বাউম্‌গার্টেনের অনুসারী না হলেও অস্পষ্ট ও স্ব-বিরোধিতায় পূর্ণ।

ইংল্যন্ডে বাউম্‌গার্টেনের সমকালে বা কিছু আগে স্যাফটস্‌বেরি, হাচিসন, হোমস্‌, বার্ক হোগার্থ এবং আরো অনেকে শিল্পতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। স্যাফটসবেরি (১৬৭০-১৭১৩)-র মতে যা সুন্দর তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমানুপাতিক, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমানুপাতিক তাই সত্য এবং যা একই সঙ্গে সুন্দর ও সত্য তা পরিণতিতে প্রীতিপদ ও শুভ। ঈশ্বরই পরম সুন্দর এবং ঈশ্বরই পরম মঙ্গলময়। হাচিসন (১৬৯৪-১৭৪৭)-এর মতে শিল্পের লক্ষ্য সৌন্দর্য এবং সে সৌন্দর্যের মর্মবস্তু আমাদের মনে সমতা ও বৈচিত্র্যের বোধ তৈরি করে।[৪২] সৌন্দর্য যে সবসময়ই মঙ্গলবাচক তা নয়, সৌন্দর্য কখনো মঙ্গলবিচ্ছিন্ন এমনকি কখনো কখনো মঙ্গল বিরোধী। হোমস্‌-এর মতে সৌন্দর্য তাই যা প্রীতিপ্রদ। বার্কের মতে সুন্দর ও মহীয়ানকে রূপ দেওয়াই শিল্পের লক্ষ্য, আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি এবং সমাজের প্রেরণার মধ্যেই সৌন্দর্যচেতনা ও মহত্ত্ব নিহিত থাকে।

সমকালীন ফরাসি শিল্প তাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পিয়ের আঁন্দ্রে এবং বাতু। এঁদের পরে দিদেরো, আলঁবের এবং ভল্‌তেয়ার। পিয়ের আঁন্দ্রের মতে সুন্দর তিন প্রকার — ১. স্বর্গীয় সৌন্দর্য, ২. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ৩. কৃত্রিম সৌন্দর্য। বাতুর মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুকরণই হল শিল্প এবং যার উদ্দেশ্য উপভোগ, দিদেরোর-ও একইরকম বিশ্বাস ছিল। আলঁবের এবং ভল্‌তেয়ার ইংরেজ নন্দনতাত্ত্বিকদের মতোই সৌন্দর্যকে রুচি সাপেক্ষ বলে মনে করেছেন।[৪৩]

এই সময়ের ইতালীয় নন্দনতাত্ত্বিক পাগানোর মতে—প্রকৃতিতে বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য রাশিকে সম্মিলিত করাই শিল্পের লক্ষ্য। রস ও রুচির সামর্থ্য থাকলেই তা করা সম্ভব। সুন্দর ও মঙ্গল

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতালির অন্যান্য নন্দনতাত্ত্বিক মুরাতোরি, স্পালেত্তি — এঁদের মতে শিল্প হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক এবং সমাজরক্ষামূলক আচরণের অভিব্যক্তি।

এরপর আমরা অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্টের নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার কথা বলবো। টলস্টয়ের মতে কান্ট নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে 'new aesthetic theory'-র সূচনা করেন, বোসাংক-এর মতে কান্ট সৌন্দর্যের স্বরূপকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করতে সক্ষম হন।[৪৪]

টলস্টয়ের অনুসরণে বলা যায় কান্টের বক্তব্য হল, মানুষ নিজের অস্তিত্বের বাইরে অবস্থিত নিসর্গকে যেমন জানে, তেমন নিজের অস্তিত্বকেও আবার ওই নিসর্গের অন্তর্গত বলে জানে। নিজের অস্তিত্বের বাইরের নিসর্গলোকে সে খোঁজে সত্য; এবং নিজের মধ্যে খোঁজে মঙ্গল। প্রথমটি বিশুদ্ধ বুদ্ধির ব্যাপার, দ্বিতীয়টি ব্যবহারিক বা নৈতিক বুদ্ধির ব্যাপার। এই দুটি ছাড়াও আর একটি বৃত্তি আছে তার, তা হচ্ছে বিচারবৃত্তি। এই বৃত্তির কাজ বিনা যুক্তি-তর্কে বিচার করা এবং নিষ্কাম আনন্দ দান করা। মূলত এই বৃত্তিই শিল্পচেতনার ভিত্তি। কান্টের মতে বোধের দিক দিয়ে সুন্দর হচ্ছে তাই যা বিকল্প ছাড়া এবং বিনা প্রয়োজনে আনন্দ দেয় এবং বস্তু হিসেবে সুন্দর হচ্ছে সেই বস্তু যার শর্তহীন ভাবে আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা আছে।[৪৫]

কান্টের অনুবর্তী শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) কান্টের মতোই মনে করতেন যে শিল্পের লক্ষ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। সেই সৌন্দর্যের উৎস বাস্তব লাভ নিরপেক্ষ আনন্দ। সুতরাং শিল্পকে একটি ক্রীড়া বলে অভিহিত করা যায়, যে ক্রীড়া কোনো লঘু ব্যপার নয় বরং জীবনেরই নানা সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্যোগ এবং সৌন্দর্যসৃষ্টিই যার একমাত্র উদ্দেশ্য। কান্ট পরবর্তী সময়ে আরও কিছু লেখকেরা এলেন যাঁরা নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন- ফিক্‌টে (১৭৬২-১৮১৪), এর মতে জগৎ অর্থাৎ প্রকৃতির দুটি দিক আছে। তা আমাদের সীমাবদ্ধতার এবং স্বাধীন আদর্শবাদী ক্রিয়ার যোগফল।[৪৬] প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থাৎ জগতের সীমাবদ্ধতায় প্রত্যেকটি বস্তুই সীমাবদ্ধ, বিকৃত, অবরুদ্ধ — ফলে আমরা দেখি বিকৃতি; দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা অনুভব

করি জগতের অন্তর্নিহিত সামগ্রিকতা, সজীবতা, নবজন্ম এবং এর ফলেই আমরা সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করি। তাই সৌন্দর্যের অস্তিত্ব বহির্জগতে নয়, এর অস্তিত্ব থাকে দ্রষ্টার আত্মায়। ফিক্‌টের অনুসরণেই শ্লেগেল এবং মুলার সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯) মনে করতেন প্রকৃত সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করে শিল্প, প্রকৃতি এবং ভালোবাসার ঐক্যে।[৪৭] মূলার (১৭৭৯-১৮২৯) এর মতে সৌন্দর্যের রূপ দুই প্রকার— একটি সাধারণ সৌন্দর্য যা সব মানুষকে আকর্ষণ করে, অন্যটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সৌন্দর্য— যার উদ্ভব ঘটে দ্রষ্টার সৌন্দর্যকে আকর্ষণের মাধ্যমে।[৪৮]

ফিকটে এবং তাঁর অনুগামীদের পরে এলেন সমসাময়িক কালের আরেক প্রখ্যাত দার্শনিক শেলিং (১৭৭৫-১৮৪৫)। আমাদের যুগের নান্দনিক ধারনার ওপর এঁর প্রভাব খুবই প্রবল। এঁর মতে সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতিই সৌন্দর্য এবং শিল্পকর্মের মুখ্য বৈশিষ্ট্য নির্জ্ঞান সীমাহীনতা। আত্মনিষ্ঠের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠের, প্রকৃতির সঙ্গে বুদ্ধির, নির্জ্ঞানের সঙ্গে সজ্ঞানের মিলনই শিল্প।[৪৯] শেলিং-এর অনুবর্তীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সল্‌গার ও ক্রাউজ। সল্‌গার (১৭৮০-১৮১৯) এর মতে পৃথিবীতে আমরা মৌলিক ধারণার কেবল বিকৃতিই লক্ষ্য করি। কিন্তু কল্পনার সাহায্যে শিল্প সে ধারনার শীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম। সেই কারণে শিল্প সৃষ্টিরই স্ব-গোত্রীয়। ক্রাউজ (১৭৮১-১৮৩২)-এর মতে মানুষের মুক্ত আত্মার জগতে যে অবস্থান শিল্প তাকে বাস্তবে পরিণত করে।[৫০]

এর পর আমরা দার্শনিক হেগেল এর উল্লেখ করবো - যিনি ১৭৭০-১৮৩১ সালের মধ্যে নিজের নন্দনতাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তার বিস্তার ঘটান। হেগেলের মতে ঈশ্বর সৌন্দর্য রূপে প্রকৃতিতে এবং শিল্পে নিজেকে প্রকাশ করেন। বস্তুজগতের মধ্যে যে ভাবব্রহ্মের উদ্ভাস ঘটে সেই রূপেরই নাম সুন্দর।[৫১] প্রকৃতির সৌন্দর্য মূলত আত্মার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব। সৌন্দর্যের মধ্যেই বিধৃত থাকে আধ্যাত্মিক সারবস্তু তবে এই আধ্যাত্মিক সারবস্তুকে অবশ্যই হতে হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

হেগেল আরো মনে করেন, আত্মার ইন্দ্রিয় সচেতন অভিব্যক্তিই মূর্তি (Schein) এবং এই মূর্তিই সুন্দরের একমাত্র বাস্তব সত্ত্বা। হেগেলকে অনুসরণ করে তাঁর বহু অনুবর্তীর আবির্ভাব হয়, যেমন, ভাইসের, আর্নল্ড রুগে, রোজেনক্রান্তস্, থিয়োডোর ফিসার প্রমুখ।

জার্মানিতে হেগেলীয় তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে এবং সমকালে এর বিরোধী মতবাদও গড়ে ওঠে। হার্বাট এবং সোপেনহাওয়ার হেগেলীয় তত্ত্বকে শুধু অস্বীকার করেন নি, ব্যঙ্গও করেছেন।[৫২] হার্বাট (১৭৭৬-১৮৪১) এর মতে সৌন্দর্য নামক স্বনির্ভর কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই।[৫৩] সৌন্দর্যের যে অস্তিত্বের কথা বলা হয় তা আসলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই অনেক সময় কোনো কোনো বস্তু যা আদৌ কিছু প্রকাশ করে না, অথচ তা আমাদের কাছে সুন্দর হয়ে উপস্থিত হয়। সোপেনহাওয়ার বলেন — পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর পর্যায়ে এষণা (will) বস্তুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যক্তির অস্তিত্ব বিসর্জন এবং এষণার অভিব্যক্তির যে কোন একটি পর্যায়ের অনুধ্যানই মানুষের মনে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।[৫৪] ভাবব্রহ্মকে বিভিন্ন পর্যায়ে বস্তুরূপ দেবার ক্ষমতা সব মানুষেরই থাকে। আর শিল্পীর প্রতিভায় এই ক্ষমতা আরও বেশি থাকে। এজন্যই শিল্পী উচ্চতর সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারেন।

উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসি নন্দনতাত্ত্বিকরা হলেন কুজ্যাঁ, জুফ্রয়, পিক্টে প্রমুখ। জার্মান আদর্শবাদের অনুসারী কুজ্যাঁর (১৭৯২-১৮৬৭) মতে সৌন্দর্যের সব সময়ই একটা নৈতিক ভিত্তি থাকে। শিল্প যে অনুকৃতি এবং আনন্দদায়ক এবং সুন্দর এই মতের তিনি বিরোধিতা করেন। কুজ্যাঁর পর নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে মতামত দেন জুফ্রয় (১৭৯৬-১৮৪২)। তাঁর মত অনুসারে সৌন্দর্য হচ্ছে দৃষ্টির অগোচর অভিব্যক্তি, যার প্রকাশ ঘটে কতগুলি স্বভাবগত লক্ষণের মাধ্যমে।[৫৫]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে অধ্যাত্মবাদের উপর মানুষের ঝোঁক কমতে থাকলে, বিজ্ঞানের উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের মনে বস্তুবাদী চিন্তা জায়গা পেতে থাকে। নন্দনতত্ত্বের

দর্শনেও পরিবর্তন আসে। নন্দনতত্ত্ব ক্রমে জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়। ডারউইন বিবর্তনবাদের প্রেক্ষিতে শিল্পব্যাখ্যা করতে চাইলেন। পাখিদের বাসা বানানোর কৃৎকৌশলকে সামনে রেখে তিনি বলতে চাইলেন যে সৌন্দর্য এমন একটি অনুভূতি তা শুধু মানুষের মধ্যে নয়, পশুর মধ্যেও থাকে।[৫৬]

হার্বার্ট স্পেনসার বলেন — নিম্নতম প্রাণীদের মধ্যে জীবনীশক্তি ব্যয় হয়ে যায় জীবনধারণ ও বংশ রক্ষার প্রয়োজনে। এই সমস্ত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও মানুষের মধ্যে শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে। সেই শক্তি যা খেলায় ব্যবহৃত হয় তা ক্রমে শিল্পে পরিব্যপ্ত হয়। খেলা যেমন কাজের অনুকৃতি তেমনি শিল্পেরও অনুকৃতি। আর এই কারণেই শিল্পের উৎস খেলা।[৫৭] গ্রান্ট এলেন-ও জীববিজ্ঞানের ধারায় নন্দনতত্ত্ব চিন্তা করেছেন। *Physiological Aesthetics* গ্রন্থে তিনি মত প্রকাশ করেন যে সৌন্দর্যের একটি দৈহিক উৎস আছে।[৫৮] সৌন্দর্যের অনুধ্যান থেকে আসে নান্দনিক আনন্দ, তবে সৌন্দর্যের ধারণা লাভ করা যায় একটি দেহতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে। শারীরবিদ্যার পাশাপাশি আরো বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও শিল্পতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টার নিদর্শন এই সময় পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তির ধারায় 'পরীক্ষণ-ভিত্তিক শিল্পতত্ত্ব', 'ঐতিহাসিক নন্দনতত্ত্ব' প্রভৃতি ধারণা নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে যুক্ত হয়।

১৮৯৬ সালে টলস্টয়ের *What is Art* প্রকাশিত হয়। টলস্টয়ের মতে শিল্প অলৌকিক রহস্যময় কোনো সৌন্দর্যসত্ত্বা নয় কিংবা ঈশ্বরের অভিব্যক্তিও নয় অথবা মানুষের বাড়তি শক্তির খেলাও নয় অথবা আনন্দের প্রকাশও নয়। শিল্প হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সেতু যা একইভাবে সকলকে ভাবিত করে। টলস্টয়ই প্রথম শিল্পকে সামাজিক মানুষের ভাব সঞ্চারের উপায় হিসাবে দেখেন। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাধীন কল্পনার আওতা থেকে শিল্পকে মুক্ত করে তিনি সামাজিক মানুষের জীবন যাপনের প্রচেষ্টা বা সামাজিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত করে দেখতে চান।[৫৯]

বিশ শতকের নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই এই শতাব্দীর একদম শুরুতেই বেনিদেত্তো ক্রোচের (১৮৬৬-১৯৫২) বিশ্ববিখ্যাত *Esthetic* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আধুনিক নন্দনতত্ত্বের অভিনব আবিষ্কারের জন্য এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদক ডগলাস আইনস্‌লি ক্রোচে-কে কলম্বাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৬০] বস্তুতপক্ষে ইউরোপের নন্দনশাস্ত্রে শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে এত গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনা দুর্লভ। ক্রোচে মূলত দার্শনিক। একারণেই তাঁর নন্দনতত্ত্বে নিগূঢ় দার্শনিক উপলব্ধি এত প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে তাঁকে প্লেটো-অ্যারিস্টটলের সমসাময়িক কোনো চিন্তানায়ক বলে ভুল হয়।

Esthetic-এ ক্রোচে দুধরনের জ্ঞানের কথা বলেছেন। Intuitive knowledge বা প্রতীতিনির্ভর জ্ঞান এবং Logical knowledge বা তর্কনির্ভর জ্ঞান। প্রথম জ্ঞান লাভ হয় কল্পনার সাহায্যে, দ্বিতীয়টির উৎস মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি। বহু দার্শনিকই নিজেদের বিশ্বাসমতো সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রত্যেকে নিজের ব্যাখ্যাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। ক্রোচের ব্যাখ্যা এদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিশিষ্ট। তাঁর মতে সৌন্দর্য কোন মানসিক মূর্তি বা মূর্তিসমূহের নির্মাণমাত্র, যা উপলব্ধ বস্তু নির্যাসকে তুলে ধরে। সৌন্দর্যের জগৎ অন্তর্নিহিত মূর্তির জগৎ, বাইরের জগতের যে বস্তুর মধ্যে তা রূপ লাভ করে তাতে সৌন্দর্যের সন্ধান মিলবে না। যে নন্দনতাত্ত্বিক চেতনাকে আমরা সৃষ্টিকর্ম না বলে ধ্যান বলি তাও অন্তর্মনের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা যখনই কোন সুন্দর সৃষ্টিকর্ম উপভোগ করি তখন আমরা সবসময়ই নিজেদের প্রতীতিরই (Intuition) অভিব্যক্তি দিই। শিল্পী যখন সৃষ্টি করেন কিংবা দর্শক যখন সৌন্দর্যের অনুধ্যান করেন, তার নান্দনিক রহস্য অভিব্যক্ত মূর্তিতেই নিহিত থাকে। সুতরাং সৌন্দর্যকে বলা চলে পর্যাপ্ত অভিব্যক্তি এবং যেহেতু পর্যাপ্ত না হলে কোন অভিব্যক্তিই বাস্তব রূপ প্রাপ্ত হয় না, সে কারণে ক্রোচে 'সৌন্দর্য' কে এককথায় 'অভিব্যক্তি' বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[৬১]

বিশ শতকের নন্দনচিন্তায় ক্রোচের এই মতামতের পাশাপাশি এই সময় জুড়েই সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতেও শিল্পকে ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। এই শতকেই নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা ফ্রয়েড ও ইয়ুং এর নাম উল্লেখ করতে পারি। শিল্পীর আবেগের সঙ্গে যে শিল্পরসিকের আবেগের একাত্ম হওয়া প্রয়োজন, শিল্পসৃষ্টি যে কেবল subjective ধারণা নয় বরং subject ও object–এর সামঞ্জস্য নির্ধারণ — মনোবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় এইসব পর্যবেক্ষণ উঠে আসে। Max Dessior 'Aesthetics and General Science of Art' নামে তত্ত্ব প্রকাশ করে বিজ্ঞান ও নন্দনতত্ত্বকে একসঙ্গে বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। সামগ্রিক ভাবেই জ্ঞানচর্চার আরো বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকেই নন্দনতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা বিশ শতকের সময়কালের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

এছাড়াও এই শতাব্দীতে ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে আরও যেসব চিন্তাবিদ নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে জঁ পল সার্ত্রে, ব্রেশট, আলবের কামু, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, মিশেল ফুকো, রোলাঁ বার্ত, নোয়াম চমস্কি প্রমুখ মানুষেরা উল্লেখযোগ্য।

১.২.২ প্রাচ্য ধারা

নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনায় পাশ্চাত্যের পর এবার আমরা ভারতবর্ষের দিকে তাকাবো। প্রাচীন ভারতের কি শিল্পতত্ত্ব আলোচনার ইতিহাস আছে? চিত্রকলা, মূর্তিকলা, সঙ্গীতকলা নিয়ে প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন সময় অনেক সূত্র ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তেমনি শিল্পের সংজ্ঞা, স্বরূপ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার ইতিহাস খুঁজলে দেখবো প্রাচীন ভারত শুধু যে শিল্পতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করেছে তা নয়, বেশ কিছু ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নন্দনতাত্ত্বিকদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পভাবনার মিলও রয়েছে। প্রাচীন গ্রিসে শিল্পকে বলা হত অনুকৃতি আর বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে,

চিত্রসূত্রে লেখা হয়েছে "যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা" — ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও নাটককে বলা হয়েছে — 'লোকবৃত্তানুকরণম্'।[৬২]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিকবির মুখনিঃসৃত প্রথম শ্লোকের সময়কালই কাব্যরচনার সূচনালগ্ন হিসেবে চিহ্নিত। ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব বিয়োগের শোকে বাল্মীকির মুখ থেকে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' ইত্যাদি বাক্য উৎসারিত হলে- "বীক্ষণশীল মুনির হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল, শকুনির শোকে শোকার্ত হয়ে এই যে আমি উচ্চারণ করলেম — এ কী!"[৬৩]

> "রামায়ণকার আদিকবির মুখ দিয়ে যে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, সেটি কাব্যরসিক মানবমনের সাধারণ কৌতূহল। মহাকবিদের প্রতিভা এই- যে অপূর্ব মনোহর শব্দগ্রন্থনের সৃষ্টি করে, 'কিমিদম্' — এ কী বস্তু। এর স্বরূপ কী। তার উত্তরে যে আলোচনার উৎপত্তি, আমাদের দেশের প্রাচীনেরা তার নাম দিয়েছেন অলংকার শাস্ত্র।"[৬৪]

আনুমানিক খ্রিস্ট পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে প্রায়োগিক তত্ত্ব হিসেবে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের বিকাশ শুরু হয়েছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলেখগুলি থেকেও অনুমিত হয় যে অধিকাংশ প্রশস্তিলেখকই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে আবির্ভূত ভরত ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে সর্বজনমানিত।[৬৫] তাঁর নাট্যশাস্ত্রে তিনি 'বিভাবনুভাব ব্যভিচার সংযোগ রসনিস্পত্তি' সূত্রে রসবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মতে শিল্প হচ্ছে ভাবেরই রূপ। ভরতের সময় থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কাব্যশিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে একাধিক শিল্পশাস্ত্র রচিত হয়েছে। ভরতের আলোচনাকে ভিত্তি করে একদিকে যেমন রসবাদ গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনই অলংকার-রীতি, বক্রোক্তি, ধ্বনি ইত্যাদিকে আশ্রয় করে নতুন নতুন মতবাদ গড়ে উঠেছে। পঞ্চম শতাব্দীতে ভামহের কাব্যালংকার, ভামহ-পরবর্তী দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, অষ্টম শতাব্দীর বামনের কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি, সমসাময়িক উদ্ভটের কাব্যালঙ্কার

সংগ্রহ, নবম শতাব্দীর ধ্বন্যালোক, একাদশ শতাব্দীর মম্মটভট্ট-কৃত কাব্য প্রকাশ, ভোজরাজের সরস্বতী কাঠাভরণ, দ্বাদশ শতাব্দীর রুচক-এর অলংকার সর্বস্ব, হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসন, চতুর্দশ শতাব্দীর বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ, সপ্তদশ শতাব্দীর জগন্নাথের রসগঙ্গাধর ইত্যাদি ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব বা শিল্পচিন্তার এই ধারা উল্লেখ করেই আমরা নন্দনতত্ত্বের আলোচনাকে এনে দাঁড় করাবো একেবারে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের মানচিত্রে। সাহিত্যের ইতিহাসের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে আমাদের বিচারে সেসময় বাংলা ভাষায় আলাদা করে কবিতা কী, সাহিত্যে শিল্পের নান্দনিক বোধ, ঔচিত্য নিয়ে স্পষ্ট তর্ক বা প্রস্তাব পেশ করার ক্রান্তিকাল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, সাহিত্য রচনাকালে স্রষ্টার মনের শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কিত ভাবনা কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হলেও এ বিষয়ে কোনো সচেতন গভীর উল্লেখযোগ্য আলোচনা নেই।[৬৬] উনিশ শতকের কবি ঈশ্বর গুপ্ত রসবর্জিত রচনাকে কাব্য বলেননি — "সেই লেখা লেখা নয়, যার নাই রস।"[৬৭] কবি রঙ্গলাল পদ্মিনী উপাখ্যান এর ভূমিকায় এবং ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে বীটন সোসাইটিতে পঠিত 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-তে যা বলেছেন তাতে তিনি একদিকে যেমন রসবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে সমকালীন সমাজ চিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের কথা বলে পাশ্চাত্যের আদর্শকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৬৮] মধুসূদন দত্ত চতুর্দশ কবিতাবলী-র 'কবি' কবিতায় লিখেছেন—

"সেই কবি মোর মতে কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী ভানুপ্রভা সদৃশ বিতরি
ভাবের সংস্রে তার সুবর্ণ কিরণ"[৬৯]

বন্ধু গৌরদাসকে একটি চিঠিতে মধুকবি লিখেছেন, "a man's style is the reflection of his mind"।[৭০] কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছেন, "In reading over my poem you must look- 1st to the imagery, 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed"।[৭১]

বিক্ষিপ্ত ভাবে এই সব মতামত উদ্ধৃত করতে পারলেও বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে যিনি এই যুগে প্রথম স্পষ্ট চেহারা দিয়েছিলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। কাব্যগ্রন্থকে আমরা কীভাবে পড়বো এপ্রসঙ্গে তিনি জানান,

> "এক একখানি প্রস্তর পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। এক একটি বৃক্ষ পৃথক পৃথক দেখিলে উদ্যানের শোভা বর্ণনা করা যায় না। এক-একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্য মূর্তির অনির্বচনীয় শোভা বর্ণনা করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগর মাহাত্ম্য অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না। সেই রূপ কাব্য গ্রন্থের।"[৭২]

সাহিত্যের উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও সমাজের হিতসাধন। 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'আর্যজাতির সূক্ষ্মদর্শন' ইত্যাদি বেশ কিছু প্রবন্ধ থেকে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত ভাবনার পরিচয় পেতে পারি।

এরপর আমরা যার শিল্প-সাহিত্য তত্ত্বের কথা বলবো, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যিনি আমাদের সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনার এক সংযমী, সহিষ্ণু আদর্শ ও নন্দনতাত্ত্বিক রসবোধ উপহার দিয়েছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। শিল্পের কাজ বা উদ্দেশ্য কী এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

> "এই কথাটি জানতে হবে- মানুষ কেন ছবি আঁকতে বসে, কেন গান করে। কখনো কখনো যখন আপন মনে গান গেয়েছি তখন কীটসের মতোই আমাকেও একটা গভীর প্রশ্ন ব্যাকুল করে তুলেছে-জিজ্ঞাসা করেছি, এ কি একটা মায়ামাত্র না এর কোনো অর্থ আছে। গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের

> মূল্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। যা অকিঞ্চিতকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল। কেন। কেননা গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সত্যের ছোটো বড়ো সকল রূপই যে অনির্বচনীয় তা আমরা অনুভব করতে পারি নে। নিত্য-অভ্যাসের স্থূল পর্দায় তার দীপ্তিকে আবৃত করে দেয়। সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের নিয়ে যায়-সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাওয়ার পথ কেউ চোখে দেখে নি।"[৭৩]

রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হচ্ছে মানুষের আত্মিক শক্তির বিকাশ। তিনি শিল্পকে 'মায়া' বলে চিহ্নিত করেছেন, শিল্পের অসংজ্ঞেয় স্বভাবটুকু নির্দেশ করার জন্য। শিল্পকে মিথ্যা বলতে তিনি রাজি নন। যা মানুষের আত্মিক শক্তির স্পর্শধন্য তা তাঁর মতে কখনো মিথ্যা হতে পারে না। তিনি মনে করেন শিল্প হচ্ছে প্রকাশ। শিল্পী, জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে আত্মস্থ করে তার বর্ণ বৈচিত্র্যে নিজের সৃষ্টিকে উজ্জ্বল ও বর্ণময় করে তোলে। আমাদের চারপাশের আলো-হাসি-অন্ধকার ভরা পরিবেশ শিল্পী মানসকে উদ্দীপ্ত করে, কবির অনুভূতিকে আলোড়িত করে, এই আলোড়নের পরিশোধিত অস্পষ্ট প্রতিধ্বনিই শিল্পকে প্রাণ দেয়। পাশাপাশি "সৌন্দর্য প্রধানত সামঞ্জস্য নির্ভর এবং এই সামঞ্জস্য শুধু সুন্দরের প্রতিটি অংশে নয়, সমস্ত জগতের সঙ্গে।"[৭৪]

রবীন্দ্রনাথের সমকালেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) শিল্প দর্শনের ক্ষেত্রে আরেকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', 'শিল্পায়ন' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর শিল্পদর্শনের ধারণা পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ সেই শিল্পসৃষ্টির কথা বলেন, যা প্রকৃতির ঐশ্বর্যের অন্তস্থলে প্রবেশ করে তার স্বরূপ উদঘাটন করতে পারে। শিল্পীর দৃষ্টি ও তার সৃষ্টির পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন—

> "সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি- এইটুকুই ভাবুকের সাধনার চরম হল তা তো নয়, সৃষ্টির বাইরে যা তাকেও ধরবার জন্যে ভাবুক আরও এক নতুন নেত্র খুললেন — খুবই প্রখর দৃষ্টি যার এমন যে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র তাকেও হার মানালে মানুষের এই মানস-নেত্র, চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না, — দূরবীক্ষণের

> দূরদৃষ্টিরও অগম্য যে স্থান। মানুষ এই আর এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীয়ান হয়ে নিজের মনের দেখা দিয়ে বিশ্ব-রাজ্যের পরপারেও সন্ধানে বেরিয়ে গেল — সেই রাজত্বে যেখানে সৃষ্টির অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করে স্রষ্টা রয়েছেন গোপনে — 'যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে যথাপস্যুৎপরিব/তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।"[৭৫]

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বস্তুর হুবহু অনুকরণের থেকে তিনি শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপের মাধ্যমে বস্তুর মহত্ত্ব প্রকাশ করতে চাইতেন বেশি। তিনি মনে করতেন : যদি শিল্প শুধু বস্তুর অনুকরণ হত, তাহলে photography হত সবচেয়ে বড় শিল্পকর্ম ও হরবোলার বুলি হত সঙ্গীতের রাজা। কিন্তু এই ধরণের অনুকৃতিকর্মে শিল্পীর স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। তাই তিনি এদের শিল্পলোকে প্রবেশ করতে দিলেন না। *ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ* গ্রন্থে তাঁর মতামত- যথার্থ শিল্পীর জন্য কোনো বিধি বিধান নেই; তবে বিধি বিধান থাকে শুধু শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্য। মূলত শিল্পী সৃষ্টি করেন আপন আনন্দে। শিল্প আনন্দ উৎস থেকে সঞ্জাত এবং শিল্পের লক্ষ্যই আনন্দ।

সৌন্দর্য প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনুসারী অর্থাৎ সৌন্দর্যকে তিনি ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে তুলনা করে দেখতে চান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> "একটা কথা কিন্তু মনে রাখা চাই, সাজগোজ পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু ওলট-পালট সময়ে সময়ে যে হয়ে আসছে তা ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি থেকেই আসছে। সুতরাং সব দিক দিয়ে সুন্দর-অসুন্দরের বোঝা-পড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে।"[৭৬]

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮) ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমকালীন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক। তাই ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনচিন্তায় মিলেমিশে আছে কবিতা ও দর্শন। কবিতার বিচার সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন, কাব্যের বিচার হবে মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত জীবনদর্শন পরিকল্পনার কষ্টিপাথরে। বিশ্ব সংসারকে দেখার একান্তরূপে ব্যক্তি-আশ্রিত যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই কাব্যের বিচার করতে হবে। শিল্প নির্ণয়ের এই মানদণ্ডকেই

তিনি জীবন-সমালোচনার মাপকাঠিও বলেছেন - যাকে তিনি বলেন : 'criticism of life'। ব্রজেন্দ্রনাথের ভাবনায় শিল্পের বোধ আনন্দকে অসীমে ছড়িয়ে দিতে চায়।

নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে আরেকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২)। নন্দনতত্ত্বচিন্তায় অদ্বৈতবাদী এই মানুষটি মনে করতেন রসই কাব্যের প্রাণ। বিবেকানন্দের মতে রসলোক এবং আনন্দলোক সমার্থক। তাঁর নান্দনিক ভাবনায় এই তত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা। তাঁর মতে সুন্দরের উপাসনা হল অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা, পরম সুন্দরের উপাসনাই হল অমৃতের তপস্যা। এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনাতেই আবার ঐ পরম সুন্দরের উপাসনার জন্য আসন পাতা হয়। তাঁর মতে, এই পরম সুন্দরই হলেন কবি এবং সকল মানবকর্মের নিয়ন্তা। ব্রহ্মদর্শনের প্রেক্ষিতে সৌন্দর্যদর্শনের কল্পনাকে প্রয়োগ করে তাই তিনি লেখেন :

> "এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই একটি চিত্র স্বরূপ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকার বোধ থাকিবে না। তখন ঋণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর চিত্রের মত। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মতো সুন্দর কথা আমি-আর কোথাও পাই না; তিনিই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি- সমগ্র জগৎ তাহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনা ত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ করিয়া সম্ভোগ করিতে পারিবো। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে।"[৭৭]

নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০)ও উল্লখেযোগ্য। নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে *The future poetry* যেখানে শিল্প প্রসঙ্গে অরবিন্দ বলেছেন :

> "মহান শিল্প শুধুমাত্র প্রকৃত তথ্যকে উপস্থিত করে কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারে না কারণ সেই তথ্য যে নিতান্তই বাহ্যিক। শিল্প সর্বদাই কোনও গভীরতর এবং মৌলিক সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। যে সত্য সাধারণ জ্ঞান এবং যুক্তির দ্বারা

> পরিমাপ করা যায় না। সেই শিল্পের আত্মা হলো অপ্রত্যক্ষ সত্য যা তার নিজস্ব আকারে এবং আচারণে উপস্থিত থাকে না কিন্তু থাকে আপন মহিমায়।"[৭৮]

এছাড়াও নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে *সৌন্দর্যতত্ত্ব* বইতে বক্তব্য রেখেছেন আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫২)। তাঁর সুন্দরের ব্যাখ্যা ও কিছু সংজ্ঞা এইরকম—

> "সৌন্দর্যবোধের মধ্যে যে একটা শারীর বিক্রিয়া বা বিভিন্ন জাতীয় নাড়ীর উত্তেজনা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সূর্যাস্তের সময় যে নানা বর্ণচ্ছটা একত্র মিলিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিলে আমাদের অক্ষিপটলসন্নিবিষ্ট অসংখ্য নাড়ীজালের বিবিধ বিচিত্র কম্পনের বিচিত্র সন্নিবেশ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি।"[৭৯]

তিনের দশকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কবিতার নন্দনতত্ত্ব নিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) । 'জীবনানন্দ প্রকৃত কবি এবং প্রকৃতির কবি'- এভাবে জীবনানন্দকে চিহ্নিত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাছাড়া বুদ্ধদেব বসুই *বনলতা সেন* কবিতাগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জীবনানন্দকে প্রথম 'নির্জনতম' বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের এহেন আলোচিত ও বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত জীবনানন্দ দাশ তাঁর জীবদ্দশাতেই নিজের কবিতার পর্যালোচনা বা নিজের কবিতা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন। যেমন *শ্রেষ্ঠ কবিতা* - র ভূমিকায় লিখেছেন,

> "আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য- কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।"[৮০]

এই কবি মনে করতেন কবিতার সৌন্দর্য খুবই গভীরভাব লুকিয়ে থাকে। যে সৌন্দর্যকে উদ্দেশ্যমূলকভাব প্রকাশ করা যায় না, আর যদি তা করা হয়, তবে সে কবিতা আর কবিতা থাকে না, হয়ে ওঠে পদ্য।

> "...আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যাখচিত-অভিব্যক্ত সৌন্দর্য্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ট কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্কল্পিত হবে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না- পদ্য লিখিত হয় মাত্র- ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু।"[৮১]

জীবনানন্দ মনে করতেন কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়।[৮২] এই থেকে জীবনানন্দ দাশের নন্দন-চিন্তার সত্য ও সুন্দর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কবিতা জীবনের মতই সত্য, তবে তা কবির কল্পনার জগতকে প্রতিফলিত করে শর্তহীন সুন্দরের তৃষ্ণায় এবং তা সাধকের কল্পনাকেও তৃপ্তি দেয়।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) যাকে অনেকেই ক্লাসিসিস্ট বলতে চেয়েছেন, কেননা কবিতা ও জীবনের যুগ্ম দায়িত্ব, সাধ ও সাধনার একান্ত সম্মিলন তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত। এককথায় তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক পরিচয় অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মনে করতেন, আধুনিক কবিতা কেবল বিলাসের জন্য লেখা নয় কিংবা দায়িত্বহীন অস্তিত্বের দর্পণও নয়, তাঁর মতে কবিতা হচ্ছে একটি অনিবার্য সত্য এবং কবিতা লেখা অন্য দশটি সামাজিক কাজের মতই বাস্তব ও সত্য।

> "ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ ব্যাতীত ব্রাউনিং-ই একমাত্র অনুধাবন করেছিলেন যে, কবিতার মুক্তির জন্যে ধ্বংসাবশিষ্ট পৈতৃক প্রাসাদের অন্তঃপুরে বসে রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখা কবিতা আর চলবে না ; তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, পোকায়

খাওয়া শিরোপা মরচে-পড়া সাঁজোয়া, রজ্জুসার জয়মাল্য ফেলে, তাকে বেরিয়ে আসতে হবে হাটের মাঝে, যেখানে পাপ-পুণ্য, ভালোমন্দ, দেব-দানব সমস্বরে জটলা পাকাতে ব্যস্ত।"[৮৩]

এই সময়ের আরেকজন কবি অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭) প্রথমদিকে প্রধানত রবীন্দ্র-অনুসারী থাকলেও ১৯৩০ এর পর থেকে তাঁর কবিতার পালা বদল চিহ্নিত করা যায়। ১৯৩৫ সালে *খসড়া* প্রকাশের পর থেকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত। প্রথমদিকের কবিতায় তিনি মূলত রোমান্টিকতা পরিহার করে যৌক্তিক-প্রত্যক্ষতার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান-চেতনার আলোকে কবিতা লেখেন, যে কারণে অনেকেই তাঁকে বৈজ্ঞানিক মরমিয়াবাদী বলতে চেয়েছেন। বিজ্ঞান-চেতনার কারণেই রবীন্দ্রনাথের মরমিয়াবাদ থেকে তাঁর চিন্তাধারা ভিন্ন। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার সৃষ্টি-রহস্য একান্ত তাঁর নিজেরই। তিনি বস্তু ও চেতনার মধ্যে ঐক্যকে উপলব্ধি করেছেন। যান্ত্রিক সভ্যতার এই যান্ত্রিকতার আওয়াজে শুনেছেন কল্যাণের ধ্বনি। তিনি এই যান্ত্রিক বিশ্বের যন্ত্রকে বা বস্তুকে আলাদাভাবে বিবেচনা না করে সামগ্রিকভাবে অখণ্ডের ভেতর অনুধাবন করতে চেয়েছেন বিশ্বরহস্যের আভাস। যেমন,

"বিপুলা চ-পৃথ্বী। তাতে নলিনীচন্দ্র পাকড়াশি থাকেন, আমিও। বিশুদ্ধ তিনি আস্ত একজন মানুষ- নাম শুনেই বোঝা যায় বিসদৃশ্য। আর ব'লে কাজ কী? তিনিও থাকুন এই যে হতাশ্চর্য আমার দুর্দিনের পৃথিবী, এর সম্বন্ধে আমার কিন্তু শেষ পর্যন্ত নালিশ নেই। আমি দ্রষ্টা। দেখে চলে যাব। কোথাও দৃষ্টির আনন্দ, কোথাও নয়। মন্দিরের বাহিরটা আমার সদৃশ্য, ভিতরের যাত্রী-ব্যবসায়ী পাণ্ডা এবং বদ্ধ হাওয়ায় উড়ন্ত বাদুড় পর্যন্ত আমার ধর্ম নাই পৌছল। মন্দিরের ওপর কী সুন্দর রোদ্দুর পড়েছে। যতদূর দেখেছি আজ বাঁচবার এই অদ্ভুত পার্থিব পথ চলে গেছে। কোন বাস্তব পরিণামের দিকে কে জানে। দোকানের দাওয়ায় বসে কেবল দেখছি। তৃপ্তি মেটে না। অপার্থিব কী তা আমার জানা নেই, খোলা চোখের সামনে এই আমার অফুরন্ত দু-দিনের দৃশ্যকাব্য।"[৮৪]

শেষ পর্যায়ে অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে সমকালীনতা ও বিশ্ববীক্ষা এসে মিশেছে। শুধু ধ্যানে কিংবা বিজ্ঞানেই মুক্তি নেই। পৃথীবির মানুষের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান ও কল্যাণের সন্ধি, কবির জন্য প্রয়োজন দৃষ্টি ও ধ্যানের সঙ্গতি। তাই তার কবিতায় শেকড়ের অনুসন্ধানের ভেতর দিয়েই আন্তর্জাতিকতার সন্ধান।

> "অমিয় চক্রবর্তীর মেজাজের সঙ্গে হপকিন্সের মেজাজের বহু মিল আছে। দৃষ্টির জগৎ ও ধ্যানের জগতের বিরোধ উভয় কবির মধ্যে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে।...প্রচলিত ছন্দোশাস্ত্রে উভয় কবিই আস্থাহীন। সুইনবর্ণী অতিকথনদোষ থেকে কাব্যের উদ্ধারের জন্যে হপকিন্স যেমন ছন্দের নব-নব শৈলী আবিষ্কার করেছিলেন ও ব্যাকারণ-বিভ্রাট ঘটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রানুসরণ থেকে বাংলা কাব্যের মুক্তির জন্য অমিয় চক্রবর্তীও তেমনি করেছিলেন।"[৮৫]

রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। একই সঙ্গে কবি, সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, ঔপোন্যাসিক ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর অভিমত—

> "রচনাকর্মের মধ্যে একটা অনিবার্যতা আছে। সত্যি বলতে, কবিতা আমরা লিখি না, কোনোকোনো কবিতা আমাদের দিয়ে নিজেদের লিখিয়ে নেয়। তার রূপ, ছন্দ, গড়ন, সমস্ত নিয়েই সে আসে, যাকে বলে ডিক্টেট করে, আমরা সেই হুকুম তামিল করি মাত্র।"[৮৬]

সমস্ত জীবন ধরেই বুদ্ধদেব বসুর কাছে কবিতা সৃষ্টি প্রেরণার উৎস ছিল রহস্যময়। কবিতার মাধ্যমেই তিনি সন্ধান করেছেন কবিতার জন্ম-রহস্যের। কাব্য সৃজন-প্রক্রিয়া আসলে কীরকম?

> "প্রথম যেদিন বীজ উড়ে এসে পড়লো, আর তৈরি লেখাটি বেরিয়ে এলো সেদিন : এই দুই বিন্দুর মধ্যে নেপথ্যে চলে অনেক আয়োজন, কবির জীবনে অনেক সমন্বয় ও বিন্যাস, আহরণ ও বর্জন সংশ্লেষ- সেগুলিও কবিতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।"[৮৭]

বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন শিল্প-সাহিত্যে-কবিতার মাধ্যমে আমরা জগতের সঙ্গে সমানুকম্পনতা অনুভব করি এবং এ যেন ক্ষণিকের সঙ্গে শাশ্বতের মিলন-স্পর্শ, একমাত্র শিল্পের কাছেই মানুষ পেতে পারে সত্য ও শাশ্বতের সামঞ্জস্য। তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক-উপযোগিতা না থাকলেও তা 'আলস্যজীবীর বিলাসিতা' নয়। তাঁর মতে শিল্প হচ্ছে মানুষের আত্মার ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, কেননা—

> "...'শিল্পের জন্য শিল্প' কথাটাও অর্থহীন, কেননা মানুষ ছাড়া কে-ই বা আছে তার স্রষ্টা বা ভোক্তা-স্পষ্টত মানুষের জন্যই শিল্পকলা। স্পষ্টত মানুষের পক্ষে তা প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন ধর্ম ও সমাজনীতি ও বিজ্ঞান তেমনি-কিন্তু ভিন্নভাবে, ভিন্ন কারণে। নীতিশিক্ষা নয়, জ্ঞানলাভ নয়, সাংসারিক শ্রী বৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়ই নয়, মানুষের আত্মার পক্ষে, দেহ প্রাণ ও মনের সমন্বয়ে রচিত তার সামগ্রিক সত্তার পক্ষে-রহস্যময় অবিচ্ছেদী এক প্রয়োজন।"[৮৮]

এই সময়ের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি বিষ্ণু দে (১৮৯০-১৯৮২) আধুনিকতার ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিতৃষ্ণা, নৈরাশ্য ও নির্বেদের বর্ণমালায় তৈরি করেছিলেন নিজের কাব্যজগৎ। আত্মচেতনায়, আত্মানুসন্ধানে, বিশ্ববীক্ষা, সমাজচেতনা ও মার্কসীয় দর্শনের প্রভাবে তাঁর কবিতায় নিহিত স্বপ্নের আশাবাদ। আত্মচেতনা এবং আত্মানুসন্ধানের প্রাবল্যের কারণে অনেকে তাঁকে আধুনিক কবিতার জগতে প্রথম অস্তিবাদী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, বাংলা কবিতা বা সাহিত্যের ধারাবাহিক চালচিত্রের দিকে তাকিয়েই যেন বিষ্ণু দে অনুভব করেছিলেন মধুসূদন কিংবা দীনবন্ধু তাঁর অনেক বেশি পরিচিত।

> "...তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ নদীর মুখর স্রোত নয়, সংহত সত্তা হিমালয় নামে নগাধিরাজ যেন। ...তবু মোটামুটি বলতে হবে যে তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতার বিরাজমান থেকেও বহু উর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মধুসূদন বা দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রজ।"[৮৯]

বিষ্ণু দে-র মতে কবিতা তন্ত্রমন্ত্র নয়, কবিতা হচ্ছে সম্বোধন।

> "কাব্যের উৎস যতই রহস্যময় হোক, কাব্য কিছু গোপন তন্ত্রমন্ত্র নয়। কাব্য সম্বোধন, সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য। সোহম-বাদে সম্ভাষণ সম্বোধনের সুযোগ বেশি নয়। আমাদের লেখকেরা জানেন যে, দৃষ্ট ও জ্ঞেয় দ্রষ্টার জ্ঞানে জারিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তনে তাঁদের পরিণতির ক্রান্তি। ইন্টারপ্রিটেশন তাই চেঞ্জ-এ সম্পূর্ণ। সেই জন্যই তাঁরা যন্ত্রবৎ নতুন অভ্যাসের কলে পা দেন না, কোনো দর্শন থেকে কুড়িয়ে জোড়া লাগাতেও চান না। বিশেষত মার্ক্সীয় দর্শনে এই চিরকালের জন্য একবার অর্জিত অভ্যাসের যান্ত্রিকতা অচল।...প্রথাসিদ্ধ দার্শনিকতার জড় অবসর মার্কসসিজমে নেই। সে পরগাছা চালাকির চেয়ে জিজ্ঞাসুমাত্র বিষয়ানুরাগ সার্থক।"[৯০]

জীবন-সচেতন, আশাবাদী এই কবি কবিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করেন। তাঁর চিন্তায় "কবিমানুষটি সমগ্রসত্তা অথবা সমস্ত রকমের অভিজ্ঞতার গোটাপট, তাঁর স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় প্রচ্ছন্ন থাকছে তার সমস্ত বিশ্বের পশ্চাদভূমির সমস্ত তত্ত্বজগতের জলহাওয়া।"[৯১]

বাংলা সাহিত্যে নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নন্দনতত্ত্বের গ্রন্থটি হচ্ছে *রূপ, রস ও সুন্দর*। এ গ্রন্থটিকে তিনি নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক চেতনা প্রসঙ্গে বলেন : 'কলাকৈবল্যবাদের আমি বিরোধী।' শিল্পসত্তা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি লেখেন :

> "শিল্পসত্তা শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধ প্রভাবিত করে। শিল্পী নিজেকে, নিজের মনকে কীভাবে দেখে তা দ্বারাও তার শিল্পকর্ম, তার উপর সমাজের প্রভাব এবং সমাজের উপর তার প্রভাব প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে।"[৯২]

সমকালীন নন্দনতাত্ত্বিক-জিজ্ঞাসায় আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে তার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে *শিল্পতত্ত্ব আলোচনার দার্শনিক পটভূমিকা* ও *শিল্পতত্ত্বের কথা*। শিল্প সম্পর্কে তাঁর মতামত হচ্ছে : "শিল্প বাহ্যত অনুকৃতি বটে, কিন্তু নিছক রূপের অনুকৃতি সে নয়, সে ভাবের রূপ-ধ্যানের প্রতিমা।"[৯৩] এছাড়াও, সাম্প্রতিককালের নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন — অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নীহাররঞ্জন

রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, তপোধীর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

নন্দনতত্ত্বের সংজ্ঞা, সীমানা, উৎস ও বিকাশের দীর্ঘ যাত্রাপথের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এই অধ্যায়ে আমরা হাজির করার চেষ্টা করলাম। আমাদের উল্লিখিত গ্রন্থ ও ব্যক্তি নামগুলি ছাড়াও আরও একাধিক প্রবণতা নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসকে বিভিন্ন সময়ে পুষ্ট করেছে। প্রাচীন গ্রিসের পটভূমি থেকে বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিসর পর্যন্ত শিল্প ও সৌন্দর্যের ধারণার অগ্রগতির ও বিবর্তনের যে পরিচয়টুকু পাওয়া গেল তার সাপেক্ষে ছয়ের দশকে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ একটি বাঁকবদলকে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব পরবর্তী অধ্যায়ে।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ১৯৬০ : ১২

২. ইসলাম সৈয়দ মনজুরুল, ১৯৯৫ : ১১

৩. মুখোপাধ্যায়, বিমল, ১৯৮৫ : ১

৪. Cuddon, J. A, 2013 : 11

৫. Encyclopaedia Britanica, 1974 : 222

৬. নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ২০০২ : ১৭

৭. Kant, 1938 : 179

৮. Encyclopaedia Britanica, 1974 : 79

৯. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার, ১৯৯১ : ৯

১০. আচার্য, জ্যোতি, ১৯৯৬ : ৭

১১. তদেব : ৭

১২. তদেব : ৮

১৩. নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ২০০২ : ১৭

১৪. তদেব : ১৮

১৫. তদেব : ২১

১৬. তদেব : ২৩

১৭. তদেব : ২৪

১৮. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ২০১৯ : ৩-৪

১৯. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, ২০০৩ : ৬৫

২০. সরকার, পবিত্র, ২০০১ : ৭

২১. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ১৯৬০ : ১০-১১

২২. তদেব : ১১

২৩. তদেব : ১২-১৩

২৪. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ১৩৭৬ : ১৪৭

২৫. তদেব : ১৪৮-১৪৯

২৬. চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন (সম্পা.), ১৯৯৫ : ৩-৪

২৭. তদেব : ৬

২৮. তদেব : ১৫

২৯. নন্দী, প্রদীপকুমার, ২০১৪ : ৭৮

৩০. তদেব : ৭৬

৩১. তদেব : ৭৭

৩২. তদেব : ৭৭

৩৩. তদেব : ৮১

৩৪. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ১৯৬০ : ৪৭

৩৫. চৌধুরী, সুচেতা, ১৯৮৮ : ৪৬

৩৬. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ১৯৬০ : ৫০

৩৭. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ১৩৭৬ : ১৭৭

৩৮. তদেব : ১৯৭

৩৯. তদেব : ২০৪

৪০. নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল (অনু.) ২০০২ : ১৮

৪১. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ২০১৯ : ১৪৫

৪২. নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল (অনু.), ২০০২ : ১৯

৪৩. তদেব : ২২-২৩

৪৪. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ১৯৬০ : ৭১

৪৫. নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল (অনু.), ২০০২ : ২১

৪৬. তদেব : ২২

৪৭. তদেব : ২২

৪৮. তদেব : ২২

৪৯. তদেব : ২৩

৫০. তদেব : ২৩

৫১. তদেব : ২৪

৫২. তদেব : ২৫

৫৩. তদেব : ২৫

৫৪. তদেব : ২৬

৫৫. তদেব : ২৭

৫৬. তদেব : ৩১

৫৭. তদেব : ৩১

৫৮. তদেব : ৩১

৫৯. চট্টোপাধ্যায় মনোরঞ্জন (সম্পা.), ১৯৯৫ : ৩৮

৬০. নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ২০০২ : ৪৭

৬১. তদেব : ৫১

৬২. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ১৯৬০ : ৫৩

৬৩. গুপ্ত, অতুল, ১৪০৯ : ৯

৬৪. তদেব : ১০

৬৫. সান্যাল, অবন্তীকুমার, ২০০৯-১০ : ১

৬৬. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর, ২০০২ : ৩৪৪

৬৭. তদেব : ৩৪৪

৬৮. তদেব : ৩৪৫

৬৯. তদেব : ৩৪৫

৭০. তদেব : ৩৪৫

৭১. তদেব : ৩৪৫

৭২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৪২০ : ১৬০

৭৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ্, ১৪২৪ : ৫১

৭৪. মুখোপাধ্যায়, বিমল, ১৯৮৫ : ২৬

৭৫. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, ২০০৩ : ৩৬

৭৬. তদেব : ৬৬

৭৭. বিকেকানন্দ, স্বামী, ১৩৮৭ : ১৭২

৭৮. চৌধুরী, সুচেতা, ১৯৮৮ : ৭৪

৭৯. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ২০১৯ : ৩১

৮০. দাস, জীবনানন্দ, ১৪১৪ : ভূমিকা

৮১. দাস, জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৮

৮২. তদেব : ১৩

৮৩. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, ১৩২৪ : ২৪-২৫

৮৪. চক্রবর্তী, অমিয়, ১৯৬৩ : ১৬

৮৫. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, ১৯৮৪ : ২৭৬

৮৬. সিকদার, অশ্রুকুমার, ১৩৮৬ : ১৮৬

৮৭. ঘোষ, সাগরময় (সম্পা,), ১৯৭৯ : ২০৭

৮৮. বসু, বুদ্ধদেব, ১৯৮৪ : ৩৮

৮৯. সিকদার, অশ্রুকুমার, ১৩৮৬ : ২০৯

৯০. দে, বিষ্ণু, ১৯৭৫ : ১০

৯১. তদেব : ৪

৯২. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ১৯৮১ : ৮

৯৩. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ১৯৬০ : ২৭

তৃতীয় অধ্যায়

হাংরি জেনারেশন : ইতিহাস ও সাহিত্য

১. ইতিহাস

১.১ শুরুর কথা

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে ইংরেজ রাজত্বের শেষের দিকে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল মূলত কলকাতার এলিটদের মধ্যে। ফলে কলকাতার বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা অনেকখানি সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি-র ইউরোপিয়ান কর্মীরা ভারতীয়দের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় সংযোগ করতে শিখেছিলেন এবং প্রসঙ্গত ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার টেক্সটবই, ব্যকরণ বই এবং অভিধান তাদেরই সাহায্যে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। উনিশ শতকের দোরগোড়ায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও অক্ষর মুদ্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত বাঙালি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হল। মুদ্রণ ব্যবস্থার সৌজন্যে লেখকরাও নিজেদের লেখালেখির প্রতি আরও যত্নবান হয়ে উঠলেন। আমরা যাকে ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য’ বলি তার সূত্রপাত এই সময়ের পরে পরেই।

রবীন্দ্রনাথের হিমালয় সদৃশ প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন কল্লোল ও তিনের দশকের কবি সাহিত্যিকেরা। সাতচল্লিশ এই ধারায় যোগ করেছিল দেশভাগ, দাঙ্গা, উদবাস্তু, বেকারী, দারিদ্র, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা ও অস্থিরতার বিভিন্ন মাত্রা। তথাকথিত স্বাধীনতা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কোনও বিষয়েই আশ্বস্ত করতে পারেনি নতুন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিকদের। লক্ষ লক্ষ ভুখা শরণার্থীদের মিছিল দেখতে দেখতে একের পর এক কারখানার লকআউট নোটিশ পড়তে পড়তে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আবিষ্কার করেছিল ঘরে খাবার নেই, সন্ধ্যের পর বাতি জ্বালানোর কেরোসিন নেই। স্বরাজ আনতে গিয়ে নৈরাশ্যের বার্তাটুকুই আমরা এনেছি কেবল, বাকি কাজটুকু খাদ্যের দাবিতে হওয়া মিছিলে গুলি চালিয়ে, কালো বাজারি মজুতদারদের প্রশ্রয় দিয়ে, সম্পূর্ণ করে ফেলেছে রাষ্ট্র। খিদের আগুনে, প্রতিবাদের আগুনে, দাবি আদায়ের চিৎকারে পশ্চিমবঙ্গ যখন প্রায় জ্বলন্ত একটি আগ্নেয়গিরি সে সময় ‘ক্ষুধার বিশাল মুখব্যাদান’ নিয়ে বাংলা

সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করল ‘হাংরি জেনারেশন আন্দোলন’। ১৯৬২ এর সাহিত্য আন্দোলন বাংলা ভাষার প্রচলিত ঐতিহ্যকে আক্রমণ করে বসল; আক্রমণ করে বসল প্রচলিত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে, যে মূল্যবোধের ওপর ভর করে এতদিন সাহিত্য রচনা হয়ে আসছিল।

পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, পঞ্চাশ ও ষাটের দশক বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে কবিতার জন্য খুবই উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র তথাকথিত নান্দনিকতার কথা নয়, বরং এ সময়ের কবিতায় দেশ, মাটি ও মানুষের কথা উঠে আসতে থাকে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। বাংলা কবিতায় নিজস্বতা ও আত্ম আবিষ্কারের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ষাটের দশকের কবিরা প্রত্যক্ষ করেছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, ছিন্নমূল শরণার্থীদের ইতস্তত ছোটাছুটির বাস্তবতা, সুবিধাবাদী রাজনীতি এরা প্রত্যক্ষ করেছেন, জেনেছেন জীবনের নির্মমতা। তাই ষাটের কবিতা প্রতিবাদের, উত্তাল রাজনৈতিক সময়ের প্রতিভূ। নাগরিক শ্রেণিচেতনার উদ্ভব, ব্যক্তিজীবনে ক্রম অসহিষ্ণুতা, ভাব ও আদর্শগত সংকট, সমকালের সব কিছুকে অস্বীকার করার প্রেরণায় জন্ম দেয় নতুন এক সাহিত্য আন্দোলনের।

একটি সাহিত্য আন্দোলন কীভাবে জন্ম নেয় তার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ, তারিখ স্থির করা কি সম্ভব? গত কয়েক দশক জুড়ে হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য আমাদের সামনে এসেছে তাতে করে ‘হাংরি জেনারেশন’ এই সাহিত্য আন্দোলনের উৎস সম্পর্কে একাধিক মতামত প্রকাশিত হয়েছে, বলাই বাহুল্য সেই সমস্ত মতামতের অনেক কিছুই প্রায় পরস্পর বিরুদ্ধ। আমরা এই বিরোধিতার ইতিহাস ও বিপক্ষতার ক্রমকে আমাদের আলোচনায় রাখার চেষ্টা করব।

উত্তম দাশ *হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন* এই বই এর *হাংরি জেনারেশন : একটি সমীক্ষা* – এই প্রবন্ধে হাংরি আন্দোলনের জন্মদাতা হিসেবে মলয় রায়চৌধুরীর উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন যে পঞ্চাশের কবিদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুবাদে ইংরেজ কবি চসারের

'In the sowre hunger Tyme' এই পঙক্তিটির প্রভাবে মলয় রায়চৌধুরী 'হাংরি' শব্দটিকে গ্রহণ করেন। অসওয়ালড্ স্পেংলারের সাংস্কৃতিক অবক্ষ বিষয়ক কনসেপ্টের মধ্যে তিনি 'হাংরি' শব্দের দার্শনিক ভিত্তি খুঁজে পান। এর পাশাপাশি ছিল গিন্সবার্গের আকর্ষণ। এই সময়ের প্রতিক্রিয়ায়, দাদা অর্থাৎ সমীর রায়চৌধুরীর বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় *সম্প্রতি* পত্রিকায় লেখেন ক্ষুৎ-*কাতর আক্রমণ* যা মূলত মলয় রায়চৌধুরীর পরিকল্পনার প্রথম ভাষ্য এবং এরপরেই দাদার বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় কে নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করে ১৯৬২ এর এপ্রিলে প্রকাশিত হয় হাংরি জেনারেশন। তিন কলমে ডবল ক্রাউন ১/৮ কাগজের এক পৃষ্ঠায় বার্জাস টাইপে ছাপা হল বুলেটিন। স্রষ্টাঃ মলয় রায়চৌধুরী। নেতৃত্বঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনাঃ দেবী রায়।[১]

মলয় রায়চৌধুরীর কথায়,

> "১৯৬১ সন। এম.এ পরীক্ষার ফলাফলের পর বাবা চাপ দিচ্ছেন দিল্লি স্কুল অব ইকনমিকসে ঢোকার জন্য। এদিকে কবিতার পৃথিবী অন্যদিকে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। আমার বয়স বাইশ। কবিতা এবং মার্কসবাদে আক্রান্ত। একদিন, আচমকা চুরমার হয়ে গেলুম কবি জিওফ্রে চসার-এর এই বাক্যবন্ধে In the sowre hungry tyme. হাংরি টাইম, তাও আবার সাওয়ার হাংরি টাইম। খাওয়া — এই শব্দটা বাংলা ভাষাতেও দেখলুম চোরাগোপ্তা ভাবে চারিদিক থেকে চালানো হয়েছে : হাওয়া খাওয়া ঘুষ খাওয়া খাবি খাওয়া চুমু খাওয়া মার খাওয়া মাথা খাওয়া। মগজে চেপে বসে গেল হাংরি কথাটা। ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মসাৎ প্রক্রিয়ায় খাপ খেয়ে গেল হাংরি, চসার-এর সাওয়ার হাংরি টাইম। তখন চারিদিকে বুদ্ধদেব বসু অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র এলিটিস্ট কবিতা নিয়ে হই হই। বামপন্থীদের কাগজগুলোয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় দীনেশ দাস বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লিটিল ম্যাগাজিনে শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, আলোক সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতাগুলির বোধসত্তা সেই অভিজাত সমাজেই, বড়লোকদের আদরখাওয়া ভাষা, ভোকাবুলারির নব্বুইভাগ রবীন্দ্রনাথের, এমনকি অভিধান ঘেঁটে বিদঘুটে শব্দ তৈরির বাহবা। উঠতি কবিদের

হিরো সেসময় নাইটগাউন-পরা চায়ে সুগারকিউব-খাওয়া 'কবিতা' পত্রিকার সুপারপ্রেমিক সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু। ঘৃণা পৈশূন্য ক্রোধ হিংসা নেশা লাম্পট্য অসুয়া কবিতায় দার্শনিক স্যাক্‌রিলেজ। পাঠককে ভুলিয়ে রাখার জন্য কবিতায় নানারকম কেতাবী ছন্দ ব্যবহার। ছন্দের মাধ্যমে পাঠককে আক্রমণ করাটা ভাবাও চলে না, এমন পাতিবুর্জোয়া আবহাওয়া। বিদেশী কবিদের অনুবাদেও কবির নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব বাংলা। একরকমের ভেতো এবং জেনানা কবিত্বের ঢালাও কারবার।"[২]

প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল সম্পাদনা ও বিতরণের কাজ করবেন দেবী রায়, নেতৃত্ব দেবেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সংগঠিত করবেন সমীর রায় চৌধুরী (মলয় রায় চৌধুরীর দাদা) আর ছাপা এবং ছাপানোর খরচ সংক্রান্ত দায়িত্ব মলয় রায় চৌধুরীর। কিন্তু পাটনায় বাংলা ছাপানোর প্রেস না পাওয়ার ফলে—

"১৯৬১ সালের নভেম্বরে যে বুলেটিন প্রকাশিত হল, তা ইংরেজিতে। এই কবিতা বিষয়ক ইশতিহারে আগের প্রজন্মের চারজন কবির নাম থাকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় ক্ষুন্ন হয়েছিলেন বলে ডিসেম্বরে শেষ প্যারা পরিবর্তন করে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অংশগ্রহণকারীদের নামসহ এই ইশতিহারটি আরেকবার বেরোয়। ১৯৬২ সালের শেষাশেষি সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। দাদার বন্ধু উৎপলকুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপধ্যায় যোগ দেন।"[৩]

প্রথম ইস্তেহারটি,

"WEEKLY MANIFESTO OF THE HUNGRY GENERATION

Creator : Malay Roychoudhury

Leader : Shakti Chatterjee

Editor : Debi Rai

Poetry is no more a civilizing manoeuvre, a replanting of the bamboozled gardens; it is a holocaust, a violent and somnambulistic jazzing of the hymning five, a sowing of tempestual hunger.

Poetry is an activity of the narcissistic spirit. Naturally, we have discarded the blankely-blank school of modern poetry, the darling of the press, where poetry does not resurrect itself in a orgasmic flow, but words come up bubbling in an artificial muddle. In the prosed-rhyme

of those born-old half-literates, you must fail to find that scream of desperation of a thing wanting to be man, the man wanting to be spirit.

Poetry of the younger generation too has died in the dressing room, as most of the younger prosed-rhyme writers, afraid of the Satanism, the vomitous horror, the self-elected crucification of the artist that makes a man a poet, fled away to hide in the hairs.

Poetry from Achintya and Ananda and from Alokaranjan to Indraneel, has been cryptic, short-hand, cautiously glamours, flattered by won sensitivity like a public school prodigy. Saturated with self-consciousness, poems have begun to appear from the tomb of logic or the lier of unsexed rhetoric.

Published by Haradhan Dhara from 269 Netaji Subhas road, Howrah, West Bengal, India."[৪]

এই ইস্তেহারটি ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং এই সময়ে শেষ প্যারাটি পরিবর্তন করে একটি অতিরিক্ত প্যারাগ্রাফ সংযোজিত হয় :

"Poetry, around us, these days, has been cryptic, short hand, cautiously glamourous, flattered by own sensitively like a public-school prodigy. Saturated with self-consciousness, poems have begun to appear from the tomb of logic or the beir of unsexed rhetoric.

Poetry is not the caging of belches within from. It should convey the brutal sound of the breaking values and starking tremors of the rebellious soul of the artist humself, with words stripped of their usual meaning and used contrapuntally. It must invent a new language which would incorporate everything at once, speak to all the senses in one. Poetry should be able to follow music in power it possesses of evoking a state of mind, and to present images not as wrappers but as ravishograms."[৫]

এই উদ্ধৃতিগুলির স্বপক্ষে গত কয়েক দশক জুড়ে হাংরি আন্দোলন সম্পর্কিত একাধিক গবেষণায়, একাধিক প্রবন্ধে মলয় রায়চৌধুরী নিজেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের 'স্রষ্টা' এবং মূল প্রবক্তা হিসেবে দাবি জানিয়েছেন। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সম্পর্কিত লেখায় একাধিক গবেষকও মলয় রায়চৌধুরীর এই সিদ্ধান্তের অনুসারি হয়েছেন এবং একই ধারণা পোষণ করেছেন। কিন্তু উত্তম দাশ *হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন* বইয়ে প্রথম

বুলেটিনের সময় বলেছেন ১৯৬২-এপ্রিল অথচ মলয় রায়চৌধুরীর হিসেবে প্রথম বুলেটিনের সময় ১৯৬১-এর নভেম্বর!

অশোক চট্টোপাধ্যায় *যোগসূত্র* পত্রিকায় আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

> "শক্তিকে নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করে ১৯৬২ এপ্রিলে বের করলেন হাংরি জেনারেশন তিন কলমে ডবল ক্রাউন ১/৮ বুলেটিন।"

এবং

> "এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই হাংরি আন্দোলনই ষাটের দশকের সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও বিতর্কিত আন্দোলন। এই আন্দোলন নিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই কোর্ট-কাছারি উত্তেজনা হয়েছে এমন নয়, বর্হিবঙ্গে প্রায় সারা ভারতে এমনকি বিদেশের সংবাদপত্র ও লেখক মহলে আলোড়ন জেগেছে তা সে যেমন ভাবেই হোক।"[৬]

এই দাবির পক্ষ এবং বিপক্ষতা কেন্দ্র করেই হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের শুরু হওয়ার সময় এবং হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের স্রষ্টা কে এই নিয়েই পরস্পর বিপরীত একাধিক মতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শৈলেশ্বর ঘোষ হাংরি জেনারেশনের 'সূচনা' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানান, *সম্প্রতি* কাগজের তৃতীয় সংকলনে বিনয় মজুমদারের গ্রন্থ সমালোচনা করতে গিয়ে হাংরি জেনারেশনের সূচনা করেছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আর সেই লেখা থেকেই হাংরি জেনারেশন নামের সূত্রপাত হয়। ১৯৬৪-৬৫ তে হাংরি জেনারেশন মামলায় শক্তি স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, "It is a fact that the literary movement (Hungry generation) was started by me with some other friends."[৭]

বিনয় মজুমদারের *ফিরে এসো চাকা*-র আলোচনা লিখতে গিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় *কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব* নামে একটি মূল প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার প্রথম অনুচ্ছেদটির উপশিরোনাম *হাংরি জেনারেশন*।

"বাংলা অনুবাদে সদর্থ দাঁড় করাতে কেউ বলেছেন 'ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায়' অন্যে বলেছেন 'চিৎকাতর সম্প্রদায়' হিসেব মতো, এরূপে লিখলে মন্দ হ'তো না, মন্দের ভালো হত 'চিচ্চিৎকাতর সম্প্রদায়' তথা চিৎ, চিৎকার এবং কাতর সংঘবদ্ধভাবে। নাম যাই হোক, ধাম বঙ্গদেশ। গতদশকের মারাত্মক ধরণের কয়েকজন কবি এবং রাক্ষুসে কয়েক দিস্তে পদ্যের দিকে দৃকপাত করলে, উত্তেজিতভাবে এই গ্রহবাসীদের 'হাংরি জেনারেশন' নামে নামাঙ্কিত করতেই প্রবণতা জাগে। উন্মাদ, উন্মার্গগামী, লক্ষ্যহীন, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর, বিশ্বাসকাতর, সুখকাতর, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, মিথ্যাচারী, কনসিটেড এই আলোচ্যমান গ্রহের অধিবাসীগণ অনেকে কবি, অনেকে চিত্রকর, অনেকে গদ্যের লেখক। বয়স বিশ থেকে তিরিশ। অসামাজিকভাবেই সামাজিক এদের অনেকে। অবিশ্বাসী'র দল বলে অনেকে, রাজনীতিহীন ব'লে দূরে রেখেছেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে আমি জানি বলেই জানতে বাধ্য যে এঁরা সকলেই অটুট ও ভিন্ন-ভিন্ন বিশ্বাসের অন্বেষণে পশ্চাতধাবিত। প্রেম পাই না ব'লে প্রেমই নাই কিংবা হৃদয় পাই না ব'লে হৃদয় নাই এতই মমত্বহীন বা নিষ্ঠুর এঁরা নন। এঁদের কেউ-কেউ লিঙ্গ প্রহার ক'রে দ্যাখেন, লিঙ্গ যতদূর যায় ততদূরেই হৃদয়ের অধিষ্ঠান কিনা, কিংবা এককথায় উক্ত অঙ্গ হৃদয়কেই স্পর্শ করে কিনা! এরূপ ক্রিয়াকলাপকেই বিশ্বাসের প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক নয়, অন্বেষণ বলতে চাই আমি।

বিদেশে সাহিত্য কেন্দ্রে যে-সব আন্দোলন হচ্ছে বর্তমানে, কোনটি বীট জেনারেশান, কোনটি আরবি, সোভিয়েৎ রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বঙ্গদেশে কোনো আনচ্ছ, অপরিষ্কার এবং অনুক্ত আন্দোলনের আভাস থেকে থাকে তবে তা আমাদেরই সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশে 'ক্ষুধা-সংক্রান্ত' আন্দোলনই হওয়া সম্ভব। ওদিকে ওদেশে যেহেতু সামাজিক অবস্থা এ্যফ্লুয়েন্ট, এরা বীটেন তথা বীট হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্থ। যে-কোন রূপের এবং যে-কোন রসের ক্ষুধাই তাকে বলতে হবে। কোন রূপ বা কোন রসই তাতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বীট কিংবা ইংয় দ্বারা প্রভাবিত মনস্কতা যদি বলার প্রয়াস হয় একে ভুল বলা হবে কেননা, এই আন্দোলনের মূল কথা 'সর্বগ্রাস'। অর্থাৎ ডাল-ভাত-চচ্চরির সঙ্গে এই আন্দোলনের বীট জেনারেশান ইস্তক জেনারেশান মেখে লঙ্কা ও লবণের টাক্না দিয়ে গ্রাস করতে চায়। বদহজম-সংক্রান্ত কথা উত্থাপিত হবে না আশা করি, কেননা বদহজমই হ'লো শিল্প। জীবন চিবিয়ে যতটুকু অখাদ্য, তাই পদ্য, গদ্য, ছবি ইত্যাদি। গু-গোবরের সামিল।"[৮]

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৩-তে *এষণা* পত্রিকায় লিখেছেন, —

> "শক্তি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত হাংরি জেনারেশনের কোন মুখপাত্র নেই- বস্তুত হাংরি জেনারেশন একটা আইডিয়া — যার বিষয়ে শক্তি গ্রন্থ সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথম কিছু লেখে। –শক্তি খুবই অন্যমনস্ক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে কথাগুলি লেখেন। আমরা বন্ধুরা কেউই জানতাম না শক্তি এরকম ভাবছে, কিন্তু ঐ নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে যায়।... পাটনা থেকে মলয় রায়চৌধুরী নামক এক অজ্ঞাত যুবক এর নেতৃত্ব কিছুদিন করেন। কিন্তু হাংরি জেনারেশন এমন এক জিনিস যে কারো হাতেই নেতৃত্ব বেশিদিন থাকে না।"[৯]

হাংরি জেনারেশনের এই সূচনা সম্পর্কে উৎপল কুমার বসুও লিখেছেন, —

> "হাংরি জেনারেশন সেভাবে কোন সংগঠিত আন্দোলন ছিল না। যার খুশি, যেখান থেকে পারে হাংরি জেনারেশন নাম দিয়ে বুলেটিন বের করে বাজারে ছেড়ে দিত। এই আন্দোলন ছিল অনিয়ন্ত্রিত। কতকগুলো ফতোয়া মলয় সমীর শক্তি লিখেছিল। এগুলোর নীচে অনেকের নাম বসিয়ে দেয়া হ'ত। বহু ক্ষেত্রেই যাদের নাম দেওয়া হচ্ছে তাদের জিজ্ঞাসাও করা হত না।... হাংরিদের সেভাবে কোন কাগজও ছিল না। হয়ত ত্রিপুরা থেকে একটা কাগজ বেরুল, নাম দিয়ে দিল হাংরি জেনারেশন বুলেটিন নম্বর ১২। হয়ত তার ১০ বা ১১ বেরোয়নি।"[১০]

শৈলেশ্বরের মতে, "হাংরি জেনারেশনের দু'একটা লিফলেটে মলয় রায়চৌধুরীর নাম দেখেছি মাত্র।" এবং—

> "এই চুলকে দেওয়া পর্বের সঙ্গে সুভাষ ঘোষ বাসুদেব দাসগুপ্ত সুবো আচার্য প্রদীপ চৌধুরী এবং আমার কোনো সম্পর্ক নাই। আমরা নিজেদের চিন্তা ভাবনা লেখা ও কাজ দিয়ে যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সৃষ্টি করেছি, তার সঙ্গে শক্তির হাংরির কোন সম্পর্ক নাই। শক্তি এ বিষয়ে লিখেছিল অন্যমনস্ক এবং অপ্রাসঙ্গিক ভাবে। আমরা অত্যন্ত সচেতনভাবে এবং প্রাসঙ্গিকভাবেই আমাদের কাজ করেছি। আর কোন ফতোয়া আমাদের দরকার হয়নি। উৎপল এবং সন্দীপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাদের বুঝবার চেষ্টা করেছি। শক্তির সঙ্গে তেমনটা হয়নি। মলয় রায়চৌধুরীরকে কলকাতায় তখনও কোনদিন দেখা যায়নি। বা সে যে লেখক এটা কারও মুখেই শোনা যায়নি।"[১১]

একটি সাহিত্য আন্দোলন ঠিক কবে কীভাবে শুরু হয়েছিল তার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে আমরা এরকমই বিবিধ বিচিত্র মতামতের সম্মুখীন হই। বাসুদেব দাসগুপ্তের মতে, ১৯৬১ সালের শেষ দিকে বাংলা দেশের কিছু কবি-লেখক নিজেদের 'হাংরি জেনারেশন'- বলে ঘোষণা করেছিলেন বটে, এদের মধ্যে উৎপলকুমার বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মলয় রায়চৌধুরী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ওই সময় হাংরি জেনারেশনকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেও তাদের লেখায় বা মনে এমন কিছু ছিল না যা তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারে। তাদের চেষ্টা নিছকই হৈ চৈ সৃষ্টি করেছিল। বাসুদেবের সিদ্ধান্ত, "১৯৬৪ সালের ২ রা সেপ্টেম্বর বাংলা সাহিত্যে ক্ষুধার্ত অভুত্থান ঘটে।"[১২] ১৯৬৩-৬৪ সালে বিভিন্ন জায়গা থেকে শৈলেশ্বর, সুভাষ, প্রদীপ, সুবো, বাসুদেব, সুবিমল, মলয় তারা কলকাতায় একত্রিত হন এবং "১৯৬৪ এর বসন্তে কলকাতা এলে সকলে মিলিত হলে ঐতিহাসিক 'হাংরি জেনারেশন' পরিকল্পনা করা হয়। সমবেতভাবে তখন কলকাতার তথাকথিত সাহিত্যিক 'বুর্জোয়াদের আক্রমণ করা হয়।'"[১৩]

অরুণেশ ঘোষের পর্যবেক্ষণ, —

> "ক্ষুধার্ত বা হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের বীজটি বা শুক্রকণাটি গর্ভে স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫০ এ। আর তা ভূমিষ্ঠ হল ১৯৬২-তে। আর মৃত্যুঘন্টা ৬৭-র মধ্যেই। সে আন্দোলন ফের নতুন করে পুনর্জন্ম লাভ করল ৬৮-৭১ এসে। প্রথমদিকে যারা শুরু করেছিলেন, তারা অনেকেই প্রতিষ্ঠানে চলে গেলেন, কেউবা লেখা থামিয়ে দিয়ে গার্হস্থ্য জীবনে ঢুকে পড়লেন। যখন দেখা গেল মরিয়াও না মরে রাম। নতুন করে বাংলায় হাংরি আন্দোলন যখন ছড়িয়ে পড়েছে দূর গ্রামগঞ্জ অবধি, তখন ফিরে এলেন কেউ কেউ। এসেই ঘোষণা করলেন- 'হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা আমি, নেতৃত্ব আমিই দিয়েছি।' ঝগড়াটা শুরু হল, যা হয়—হয়ে আসছে চিরকাল।"[১৪]

যোগসূত্র পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধে অশোক চট্টোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *হাংরি জেনারেশন বিষয়ক প্রস্তাব* কে প্রথম রচনা আর মলয় রায়চৌধুরী ও দেবী রায়ের প্রকাশিত

হাংরি ম্যানিফেস্টো-কে তার পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত বলে উল্লেখ করেছেন। শৈলেশ্বর ঘোষকে লেখা দেবী রায়ের ১৯৬৩ সালের ১৪ আগস্ট এর চিঠি থেকে জানা যায়, —

> "এবার থেকে যা কিছু ক্ষুধা প্রকাশ পাবে মলয় রায়চৌধুরী বাঁকীপুর। পাটনা-৪।... পাটনা থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তা ১৯৬১ সালে নয়, ১৯৬৩ সালের ১৪ই আগস্ট-এর পর থেকে।"[১৫]

অতএব মলয় রায়চৌধুরী যে বার বার দাবি করেছেন ১৯৬১ সাল থেকে তিনি 'হাংরি জেনারেশন ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ করছেন তার পক্ষে যুক্তি অনেক কমজোরী হয়ে যায়। একইরকম ভাবে ১৯৬১-এর নভেম্বরে প্রকাশিত ম্যানিফেস্টো এবং মলয় রায়চৌধুরীর দাবি অনুযায়ী প্রকাশিত 'প্রথম ম্যানিফেস্টো'টিও প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তীকালে অনেকের গবেষণায়। মলয় রায় চৌধুরীর দাবি করা যে ম্যানিফেস্টোটি পাটনায় ইংরেজিতে ছাপা হয়েছিল তাতে কোন সাল তারিখের উল্লেখ নেই ফলে অনেকেরই অনুমান যে পরবর্তীকালে হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য মলব রায়চৌধুরী খুব সচেতনভাবে শক্তির লেখা 'হাংরি জেনারেশন' বিষয়ক রচনাটিকে অপ্রাসঙ্গিক করে নিজেকে হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টা হিসেবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

মলয় রায়চৌধুরীর দাবি করা প্রথম ম্যানিফেস্টো—

WEEKLY MANIFESTO OF THE HUNGRY GENERATION

Editor : Debi Rai Leader : Shakti Chatterjee

Creator : Malay Roychoudhury

> Poetry is one more a civilizing manoeuvre, a replanting of the bam-boozled gardens ; it is a holocaust, a violent and somnambulistic jazzing of the hymning five, a sowing of tempestual hunger.
>
> Poetry is an activity of the narcissistic spirit. Naturally, we have discarded the blankely-blank school of modern poetry, the darling of the press, where poetry does not resurrect itself in a orgasmic flow, but words come up bubbling in an artificial muddle. In the prosed-rhyme

of those born-old half-literates, you must fail to find that scream of desperation of a thing wanting to me man, the man wanting to be spirit.

Poetry of the younger generation too has died in the dressing room, as most of the younger prosed-rhyme writers, afraid of the Satanism, the vomitous horror, the self-elected crucification of the artist that makes a man a poet, fled away to hide in the hairs,

Poetry from Achintya to Ananda and from Alokaranjan to Indraneel, has been cryptic, short-hand, cautiously glamours, flattered by own sensitivity like a public school prodigy. Saturated with self-consciousness, poems have begun to appear from the tomb of logic or the lier of unsexed rhetoric."[১৬]

১৯৬৭ সালে *সলটেড ফেদার্স*-এ প্রকাশিত ম্যানিফেস্টো। অনেকের মতে পরবর্তিতে এই ম্যানিফেস্টোকেই বিকৃত করে ক্রিয়েটার হিসেবে নিজের নাম সংযোজন করেছেন মলয় রায়চৌধুরী।[১৭]

"Manifesto of hungryalistic poetry

Written by MALAY

Regisscure:

SONDIPAN

UTPAL

SAMIR

SHAKTI

BENOY

HARANATH

SHANKAR

ARUP

BASUDEVA

ASHOKE

PRADIP

SIRAJ

AMRITATANAY

AMIT

BHANU

DEBI

Poetry is one more a civilizing manoeuvre, a replanting of the bam-boozled gardens ; it is a holocaust, a violent and somnambulistic jazzing of the hymning five, a sowing of tempestual hunger.

Poetry is an activity of the narcissistic spirit. Naturally, we have discarded the blankely-blank school of modern poetry, the darling of the press, where poetry does not resurrect itself in a orgasmic flow, but words come up bubbling in an artificial muddle. In the prosed-rhyme of those born-old half-literates, you must fail to find that scream of desperation of a thing wanting to me man, the man wanting to be spirit.

Poetry of the younger generation too has died in the dressing room, as most of the younger prosed-rhyme writers, afraid of the Satanism, the vomitous horror, the self-elected crucification of the artist that makes a man a poet, fled away to hide in the hairs,

Poetry from Achintya to Ananda and from Alokaranjan to Indraneel, has been cryptic, short-hand, cautiously glamours, flattered by own sensitivity like a public school prodigy. Saturated with self-consciousness, poems have begun to appear from the tomb of logic or the lier of unsexed rhetoric.

Poetry is not the caging of belches within from. It should convey the brutal sound of the breaking values and starking tremors of the rebellious soul of the artist humself, with words stripped of their usual meaning and used contrapuntally. It must invent a new language which would incorporate everything at once, speak to all the senses in one. Poetry should be able to follow music in power it possesses of evoking a state of mind, and to present images not as wrappers but as ravishograms."[১৮]

আমাদের বিচারে 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের' সময়কালকে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪-তে কলকাতা পুলিশের আনা অভিযোগের প্রেক্ষাপটে দু'ই ভাগে ভাগ করে নিলে ইতিহাস বুঝতে সুবিধে হবে। ১৯৬৪ তে এস.আই.ডি.ডি কালিকিঙ্কর দাস 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন এবং ওই একই দিনে কলকাতার জোড়াবাগান থানার এস.আই এস.এম পাল এফ.আই.আর করেন। এর আগে পর্যন্ত হাংরি জেনারেশনের বিস্তার এবং এই অভিযোগের

ভিত্তিতে হওয়া মামলা ও তার পরবর্তীকালে হাংরি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি –এই দুই ভাগে আমরা হাংরি জেনারেশনের শুরু ও বিস্তারের ইতিহাসকে দেখতে চাইব। ১৯৬৪ তে কলকাতা পুলিশের আনা অভিযোগ তথা এফ.আই.আর-এর আগে কীভাবে গড়ে উঠেছিল হাংরি জেনারেশন আন্দোলন? এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত একাধিক লোকের স্মৃতি চারণায়, বয়ানে ইতিহাসের পরস্পর বিরোধী এবং প্রায় আলাদা রকমের ঘটনাপঞ্জী আমরা সন্নিবিষ্ট হতে দেখেছি। আমাদের গবেষণায় এই বিবিধ বিরোধমূলক মতামতকেই উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

১.২. স্রষ্টা বিতর্ক

মলয় রায়চৌধুরী জানিয়েছেন,

> "যে কোনো আন্দোলনের হয় কোনো না কোনো আধিপত্য প্রণালীর বিরুদ্ধে। তা সে রাজনৈতিক আধিপত্য হোক বা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৈতিক, নান্দনিক, ধার্মিক, সাহিত্যিক, শৈল্পিক ইত্যাদি আধিপত্য হোক না কেন। আন্দোলন-বিশেষের অভিমুখ, উচ্ছাজ্ঞা, গন্তব্য হল সেই প্রণালীবদ্ধতাকে ভেঙে ফেলে পরিসরটিকে মুক্ত করা। হাংরি আন্দোলনে কাউকে বাদ দেওয়ার প্রকল্প ছিল না। যেকোনো কবি বা লেখক, ওই আন্দোলনের সময় যিনি নিজেকে হাংরি আন্দোলনকারী মনে করেছেন, তাঁর খুল্লামখুল্লা স্বাধীনতা ছিল হাংরি বুলেটিন বের করার। বুলেটিনগুলোর প্রকাশকদের নাম-ঠিকানা দেখলেই স্পষ্ট হবে (অন্তত যে-কটির খোঁজ মিলেছে তাদের ক্ষেত্রেও) যে, তা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জন কর্তৃক ১৯৬৩-র শেষ দিকে এবং ১৯৬৪-র প্রথমদিকে প্রকাশিত।"[১৯]

ইতিহাস ঘাঁটলেই আমরা জানতে পারব যে এই হাংরি বুলেটিন যেহেতু হ্যান্ড বিলের মত ফালি কাগজে প্রকাশিত হত ফলে সমস্ত হাংরি বুলেটিন গুলোকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন গবেষণায় গত কয়েক দশকে যে কয়েকটি বুলেটিন বা হাংরি জেনারেশন সংক্রান্ত ম্যানিফেস্টো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সেগুলো ছাড়াও প্রায় ৯০টি বুলেটিন চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে এরকম তথ্য দিয়েছেন এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরাই। মূলত এই আন্দোলনে

যুক্ত একাধিক মানুষের স্মৃতির বয়ান থেকে এই আন্দোলন কীভাবে দানা বাঁধল তারই বহুমাত্রিক ইতিহাসকে আমরা হাজির করার চেষ্টা করছি। ১৯৫৬-৬০ সালের মধ্যে ইতিহাসের দর্শন এবং 'মার্ক্সবাদের উত্তারাধিকার' এই দুটি লেখা নিয়ে কাজ করছিলেন মলয় রায়চৌধুরী। সেই সময় অসওয়াল্ড স্পেংলারের 'দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট' বইটি এই বইটি তাকে প্রভাবিত করে। মলয়ের বক্তব্য অনুযায়ী এই বইটি থেকেই তিনি হাংরি আন্দোলনের প্রেক্ষিত গড়ে তুলেছিলেন।

স্পেংলার বলেছিলেন যে একটি সংস্কৃতির ইতিহাস সরল রেখা বরাবর যায় না, তা একযোগে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয় কেননা এটি একটি জৈব প্রক্রিয়া এবং সে কারণেই সমাজের নানা অংশের কার কোনদিকে বাঁকবদল ঘটবে তা আগে থেকে বলা যায় না। দেশ ভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ যে ভয়ঙ্কর অবষাদের মুখে পড়েছে তাতে করে উনিশ শতকীয় পর্যায়ের বাঙালির নবজাগরণ আর সম্ভব নয়। এইরকম চিন্তা ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই দেবী রায়, সমীর রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং মলয় রায়চৌধুরী গড়ে তোলেন হাংরি জেনারেশন আন্দোলন। "লালমোহন দাস সম্পাদিত 'ছোট গল্প' লিটিল ম্যাগাজিনে একটা আনকোরা নাম আর ঠিকানা খুঁজে পেলুম : হারাধন ধাড়া। আন্দোলনের জন্য মনে হল এই নামটার ইমপ্যাক্ট হবে একেবারে নতুন।"[২০]

হারাধন ধাড়ার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করে হাওড়ার নেতাজী সুভাষ রোড ফুঁড়ে এঁদো অন্ধকার কাদা প্যাচপ্যাচে গলির ভিতর দিয়ে মাটির চালা বাড়িতে মলয় রায়চৌধুরী আবিষ্কার করেন দেবী রায়কে। কাঠের গরাদের জানলার লাগোয়া পেল্লাই উঁচু খাট চাল পর্যন্ত উঠে গেছে, কাগজ ম্যগাজিনের ঢাঁই। বই-এর বদলে অজস্র পত্রিকা। তার মাঝখানে দুটো ঘরের একটিতে মলয় রায়চৌধুরীর দেখা হয় দেবী রায়ের সঙ্গে।

"—আমি হারাধন ধাড়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, মলয়, বলুন পাটনা থেকে মলয় রায়চৌধুরী।

- জানি। আমি হারাধন।

- তবে ?

- নামটা এফিডেভিট করেছি। ও নামটা ভাল্না।

বুঝতে পারলুম রোগা ছিপছিপে যুবকটি রোমান্টিক ধোঁয়ায় মোড়া। এরকম বাসায় থেকে এরকম নাম নিয়ে গীতিময়তায় আচ্ছন্ন। অজস্র কথা বলে যেতে পারেন দেবী রায়, নন স্টপ, এক নাগাড়ে আনন্দ ক্রোধ ঘৃণা ঈর্ষা উচ্ছাক্ষা।"[২১]

নিজের আন্দোলনের, চিন্তাভাবনার কথা মলয় বললেন দেবী রায়কে। দেবী রায় প্রথমে তেমন কোন ভরসা পেলেন না, কেননা পত্রিকা না বের করে হ্যান্ডবিলের মত ফালি কাগজে লেখা এ আবার কেমন পত্রিকা! কফি হাউসে হয়ত সবাই হাসাহাসি করবে, বিক্রির জন্য কোন স্টলে রাখা যাবে না। লোকে বিজ্ঞাপনের কাগজ ভেবে হাতে মুড়ে ফেলে দেবে। দেবী রায়ের এসব যুক্তি সত্ত্বেও মলয় রায়চৌধুরী জেদ করে তাকে বোঝালেন যে ফালি কাগজই বেরবে, দরকার পড়লে প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে নানান রঙের নানান মাপের কাগজে তারা তাদের কথা বলবেন কিন্তু পত্রিকার চেহারা দিয়ে বের করা হবে না। মলয় রায়চৌধুরী ছাপাবেন পাটনায়, ঠিকানা থাকবে দেবীর বাড়ির, আর কেউ চাইলে যোগাযোগ করবে মলয়ের সাথে। লেখা ও লেখক সংগ্রহের কাজ দেবীর। অর্থাৎ সব ধরণের এলিটিস্ট ব্যাপার জলাঞ্জলি দেওয়া হবে। পাটনাতেই চাকরি করতেন সুবিমল বসাক, আন্দোলনের খবরে মলয়ের সাথে দেখা করতে এসে জানান তিনি কলকাতা যাচ্ছেন ট্রান্সফার নিয়ে। মলয় তাকে বলেন দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সুবিমলের বাবা পাটনায় ছিলেন একজন নামকরা স্যাকরা। কলকাতা গিয়েই দেবী আর সুবিমলের চিঠিতে জানা যায় কলকাতার তুমুল উত্তেজনার খবর, বুলেটিন দেওয়া মাত্রই কফি হাউসে অনেকে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, দেবীকে বলা হয়েছে এসব বন্ধ করে দিতে নয়ত দলবদ্ধ

প্রহারের মুখে পড়তে হবে। সুবিমলকে কেউ কেউ বলেছেন নখের তলায় আলপিন ফুটিয়ে দেওয়া হবে,—

> "এইসব হুমকির দরুণ ওদের আত্মবিশ্বাস মজবুত হতে থাকে। আমি তখনও পাটনাতেই। ওদের দুজনের কেউ কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে ঢুকলেই টিটকিরি, মুরগির ডাক শিয়ালের ডাক অন্যসব টেবিল থেকে। দুপুরে গেলে প্রেসিডেন্সির ছেলে-মেয়েরা ওদের দেখতে আসে।"[২২]

বাংলা সাহিত্যের আবহমান নান্দনিকতার বাইরে একটি ঢেউ আছড়ে পড়ছিল কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায়। ১৯৬২-র চিন-ভারতবর্ষের লড়াই এর সময় নিজেরাই একটা পোস্টার বের করেছিলেন মলয় দেবী এবং সুবিমল। এক বালতি ভাতের ফ্যান নিয়ে কাপড়ের ন্যাতা দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় লাগানো হয়েছিল সেই পোস্টার :

> "THE HUNGRY GENERATION
> OFFERS
> a Rs 100,00,00,000 poem
> To the saint who would bring
> Mao Tse Tung"[২৩]

নিস্তব্ধ কলকাতায় এই পোস্টার লাগানোর ফল এবং ফালি কাগজে পত্রিকা বের করে নতুন কথা বলার যাবতীয় প্রতিক্রিয়া আস্তে আস্তে ফুটে উঠছিল কলকাতার সাহিত্য মহলে। প্রদীপ চৌধুরী বহিষ্কৃত হয়ে গেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে। যদিও তখন পর্যন্ত হাংরি বুলেটিনে একটাই কবিতা লিখেছিলেন প্রদীপ, কিন্তু হাংরি আন্দোলনে যুক্ত থাকার দরুণ প্রথম কোপটা পড়েছিল প্রদীপ চৌধুরীর ওপর। শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন স্বঘোষিত আঁতেল ঘাটিগুলোতে বুলেটিন বিক্রির দায়িত্ব ছিল প্রদীপ চৌধুরীর। বিশ্ব ভারতী থেকে বহিস্কৃত হয়ে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ তে ভর্তি হলেন প্রদীপ আর সেসময়ই মলয়ের সঙ্গে তার আলাপ,

" 'এষণা' নামে একটা পত্রিকায় এসময় একজনের কবিতা কিছুটা অন্যরকম মনে হয়। শৈলেশ্বর ঘোষ। ঠিকানা দেখে খুঁজে বের করি। টালা ট্যাংকের কাছে একটা দোতলা বাড়ি। কড়া নাড়তে বাড়িওয়ালা বেরিয়ে এসে বাইরের দিকে রাস্তার উপরে একটা ঘর দেখিয়ে দেন। সোজা ঢুকে পড়ি। দুজন যুবক মেঝের উপর ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে একটা বালিশের উপর দুজন মাথা রেখে কিছু পড়ছিল। ময়লা গেঞ্জি গায়ে। আমাকে দেখেই ধরমর করে উঠে পাঞ্জাবি গলায়। অন্য যুবকটি একটু বেঁটে, সবসমব বাকা হাসি। নাম সুভাষ ঘোষ। জানতে পারলুম সুভাষ গদ্য লেখেন। সুভাষ কোন লেখা দেখালেন না। শৈলেশ্বর বললেন তিনি দেবী রায়কে একটা কবিতা দিয়েছেন। ওঁরা দুজনেই খুব উৎসাহিত। ঘরে দেখলুম বইপত্তর বিশেষ নেই, পরে জেনেছিলুম বইপত্তর ওরা দুজনেই লুকিয়ে রাখেন ট্রাংকের মধ্যে।"[২৪]

এই আন্দোলন ঘটে যাওয়ার অনেক পরে নব্বইয়ের দশকে স্মৃতি কথায় যখন হাংরি কিংবদন্তীতে এইসব লিখছেন মলয় রায়চৌধুরী তার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে-

"শৈলেশ্বর দেখলুম বোরোলিন লাগান। সুভাষ পাউডার মাখেন। পরে এ প্রসঙ্গ তুলল দুজনেই লজ্জায় পড়তেন। তবে পকেটে চিরুনি রাখার অভ্যাসটা ছাড়তে পাররনেনি।"[২৫]

এভাবেই একটি আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে যায় ব্যক্তিগত ক্রোধ ঈর্ষা ও অসূয়া স্তর, যার মধ্যে থেকে যে-কোন গবেষকের পক্ষেই একটি আন্দোলনের যথার্থ ইতিহাসকে তুলে আনা কষ্ঠসাধ্য হয়ে ওঠে।। ত্রিদিব মিত্র থাকতেন হাওড়ায়। বাজার থেকে পয়সা বাঁচিয়ে টিউশানির টাকায় বের করতেন 'উন্মার্গ' পত্রিকা। যে মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করতেন তিনি ছিলেন সরকারি ব্যঙ্কের অফিসার। প্রেমিকার দেওয়া হাত খরচে ত্রিদিব বন্ধুদের মদ খাওয়াতেন খালাসিটোলায়।—

"আদা-ছোলা, আলুর দম আর দেশি মদ। খালি পেটে খিদের মুখে চোঁ-চোঁ করে খাওয়া হয়ে যেত। সকলে মিলে দেখতুম টোটাল কতো পয়সা আছে। পঞ্চাশ টাকার মতন জড়ো হলে হাঁটতে হাঁটতে হাড়কাটা গলিতে কারুর ঘরে। অনেক সময়, কারুর পকেটে বা ডায়েরিতে কবিতা থাকলে, চেঁচিয়ে পড়া। একটাকা দিয়ে গোড়ের মালা ভাড়া করে পরিয়ে আবার মালাটা ফেরত দিয়ে দিতুম মালা-ওলাকে। তারপর

লটারি। যার নাম উঠতো সে ঢুকে যেতো ঘরে। আমরা বাকি সবাই রাস্তায় তার অপেক্ষায়।"[২৬]

বিষ্ণুপুরের ছেলে সুবো আচার্য থাকতেন ত্রিদিবের হাওড়ার বাড়িতে। হাংরিদের অন্যান্য বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে পুরোহিত বাড়ির ছেলে সুবোর সমস্ত ট্যাবু আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকে। চালাক চতুর চেহারা, চুল ছোট করে ছাঁটা, শার্ট প্যান্ট, ঘন ঘন সিগারেট। টানা লাইনের পর লাইন কবিতা লিখলেও এলিটিস্ট ছাপ থেকে বেরতে পারছিলেন না সুবো আচার্য। বিষ্ণুপুর থেকেই এসে জুটেছিলেন আর এক কবি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি কবিতা লিখে আবার ফিরে গেছিলেন বিষ্ণুপুরে। কালো ভারী চশমার ভেতর দিয়ে চিন্তা মগ্ন চোখ আর ভারী গলা নিয়ে আলাদা করে চিনতে পারা যেত বাসুদেব দাসগুপ্তকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে টিউটোরিয়াল স্কুল খুলেছিলেন বাসুদেব সেখানে পড়াতেন আর গদ্য লিখতেন। শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে এসে জুড়ে যান হাংরি আন্দোলনে। সুভাষ ঘোষ আর সুবিমল বসাক যেভাবে ভাষা নিয়ে কাজ করছিলেন বাসুদেব দাসগুপ্ত প্রথমেই সেরকম ভাবনায় নিজকে না জড়ালেও পরবর্তীকালে নিজস্ব গদ্য আবিষ্কারের ঝোঁক তার তৈরি হয়। মলয়ের কথা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালে একটি উশকোখুশকো চুল দাড়ি ওয়ালা ছেলে পাটনায় তার সাঙ্গে দেখা করতে আসেন, "চোখ দেখলে টের পাওয়া যায় ম্যানড্র্যাক্স কিংবা চরস।"[২৭] ইনিই ফাল্গুনী রায়। কলকাতা থেকে মাঝেমধ্যেই তিনি পাটনা যেতেন আর মলয়ের সঙ্গে আড্ডা হত পাটনার শশ্মান ঘাটে। গভীর রাত অবধি দুজনে গাঁজা টানতেন চারমিনার সিগারেটে ভরে, পাইপে ভরে চরস, পানের দোকান থেকে কেনা ভাঙের বরফি। কবিতায় কী বলা হচ্ছে সেটাই ছিল সেই সময় ফাল্গুনীর মূল ভাবনা। নিজস্ব কাব্যশরীর তৈরিতে ফাল্গুনীর বেশি মনোযোগ ছিলেন না, আর সর্বদাই থাকতেন নেশাগ্রস্ত। রাতের অন্ধকারে কখনো সুভাষ ঘোষের মেসে কিংবা ছয়-এর দশকের সেই অগ্নিগর্ভ কলকাতার রাস্তায়, ফুটপাতে, দেশি মদের ঠেকে, এই যুবকেরা দাপিয়ে বেরিয়েছেন সাহিত্যের তর্কে, কাটিয়েছেন একেরপর এক রাত। উত্তেজনার জ্বর তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে।

প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা, নন্দন বিরোধীতার সূত্রে তৈরি হয়েছে একেরপর এক প্রতিবাদী রচনা। মলয় রায় চৌধুরীর এহেন ঐতিহাসিক স্মৃতি চারণার সঙ্গে সঙ্গে আমরা উদ্ধৃত করতে চাইব হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের আরেকজন কবি সংগঠক সম্পাদক শৈলেশ্বর ঘোষের স্মৃতি চারণা। শৈলেশ্বর ঘোষের বয়ানে পূর্ব পাকিস্থান থেকে উতবাস্তু হয়ে আসা সতীন্দ্র ভৌমিক যিনি দমদমের বস্তিতে থাকতেন ১৬ বি শ্যামাচরণ স্ট্রিটে থাকতেন, 'এষণা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

> "একদিন জোগাড় করে নিয়ে এল মলয় রায়চৌধুরীর একটা গদ্য। সে আণ্ডারলাইন করে এনেছে এই কথাগুলো 'কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ।' সতীন্দ্রের মত হল বাংলাসাহিত্যের ভন্ডের দল তো কবিতাকে জীবনের উল্ট দিকেই নিয়ে গেছে — কথাটা আমাদরেও তাই। কৃত্রিম বানানো কবিতা জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, আমাদের ভাবনা ছিল কিভাবে কবিতাকে আবার জীবনের নিজস্ব সামগ্রিক করে তোলা যায়।"[২৮]

১৯৬৩-র প্রথমদিকে 'এষণা' পত্রিকায় ছাপা হয়ে বেরোয় 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' সিরিজের বেশ খানিকটা। এই কবিতার সূত্রেই শৈলেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ হয় উৎপল কুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের।

> "সতীন্দ্র ভৌমিকের দ্বারা প্রকাশিত 'হাংরি জেনারেন-১৫' লিফলেটে শৈলেশ্বরের ওই 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা'র একটি অংশ 'তিন বিধবা' প্রকাশিত হলে প্রথম হাংরি আন্দোলনের ওপর পুলিশী আক্রমণ ঘটে। শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, হাংরিকে সিরিয়াসলি নেওয়া ঠিক হবে না।' ফলত, 'হাসিখুশি মেটাতে আসছে শারদীয় হাংরি জেনারেশন সংকলন' প্রকাশ স্থগিত হয়ে যায়। শক্তি এদের সঙ্গ ত্যাগ করেন ও আনন্দ বাজারে কাজে প্রবেশ ক'রে এদের 'নষ্ট প্রতিভা' ও 'উল্লুক' বলেন। শেষ হয়ে যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্ট প্রথমপর্বের হাংরি জেনারেশন।"[২৯]

মলয় রায়চৌধুরী কথিত ইতিহাসের বিপক্ষ সৌন্দর্য অনুযায়ী হাংরি আন্দোলন থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিজেকে গুটিয়ে নিলে নবপর্যায়ের হাংরি আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৬বি শ্যামাচরণ মুখার্জী স্ট্রিটের ঘরটিকে কেন্দ্র করেই।

'এষণা'য় শৈলেশ্বরের 'তিন বিধবা' প্রকাশিত হওয়ার পর পর চার পাতার হলুদ কাগজের একটি লিফলেটে সতীন্দ্র ভৌমিক লিখেছিলেন একটি ছোট গদ্য। যাতে লেখা হয়েছিল, "কবিতাগ্রন্থ স্ত্রীর চেয়ে মনোরম ও টেঁকসই। বিবাহিত নারী দুদিনেই পুরানো বইয়ের ঢলঢলে মলাট বনে যায় কিন্তু কবিতার নারী দিনের পর দিন আঁট হয়ে চেপে ধরে আপনাকে।"[৩০] কলকাতার কাগজে সোরগোল পরে যায় এসমস্ত লেখালেখি নিয়ে, হেনস্তা হতে শুরু করেন এই লেখকরা। শৈলেশ্বরের জানিয়েছেন, বাসুদেবের সঙ্গে তার পরিচয় হয় খালাসিটোলায়। ততদিনে 'উপদ্রুত' কাগজে বাসুদেব দাসগুপ্তর 'রন্ধনশালা' বেরিয়ে গেছে। শৈলেশ্বরের মনে হয়েছিল ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ক্ষুধা এই গদ্যটির মধ্য দিয়ে তৃপ্তি খুঁজছিল। তাই এই লেখকের সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার জন্য তিনি উন্মুখ হয়েছিলেন।

> "নড়বড়ে টেবিলে দেশী মদের বোতল নিয়ে বসে ছিল বাসু। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। পুরানো বাংলা গানের কলি ভাঁজছিল বাসু। সুভাষ আর আমি বসে গেলাম ওর টেবিলে। বাংলা মদ খেতে খেতেই নাকি ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষের স্বরূপটি ধরা পড়ে তার কাছে। আরও দেখলাম মাইনরিটির যে ত্রাস আমাদের মধ্যে ছিল, সেটা ওর মধ্যেও আছে। প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের প্রতি ঠাট্টা আর বিদ্রুপ মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসছিল। সেদিনই বোঝা গেল যে এক নৌকার যাত্রী হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই।"[৩১]

কবিতার সূত্রেই কফি হাউসে একে একে শৈলেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ হয় প্রদীপ চৌধুরী এবং সুবো আচার্যের। শান্তিনিকেতন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ততদিনে যাদবপুরে চলে এসেছেন প্রদীপ, বাঁকুড়া থেকে পড়তে এসেছেন সুবো আচার্য।

> "এই কবিতা আমাদের বুঝিয়েছিল যে, পৃথিবীতে একা নই আমরা। আরও কিছু আত্মা, একই অনুভূতি, একই চেতনা, একই অভিজ্ঞতা নিয়ে অপেক্ষা করছে, বাসু সুভাষ প্রদীপ সুবো, এগিয়া আসা কয়েকজন মাত্র। আমরা বুঝতে পারছিলাম সময় আমাদের টেনে আনছে পরস্পরের কাছে। সময়ের নির্দেশ মনে হয় সেদিন আমরা ধরতে ভুল করিনি।"[৩২]

শৈলেশ্বর স্বীকার করেছেন যে ১৬বি শ্যামাচরণ স্ট্রিটের ঘরে এক বিকেলে অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকার সময় তার দরজায় টোকা দেয় পুলিশের লোক এককথায় টিকটিকি। পকেট থেকে হলুদ লিফলেট বের করে যিনি জানতে চান শৈলেশ্বরই 'তিন বিধবা'র লেখক কিনা। তারপর শৈলেশ্বরকে আদেশ করেন লালবাজারে গোয়েন্দা অফিসে গিয়ে দেখা করতে। তার কয়েকদিনের মধ্যেই গোয়েন্দা অফিসার কে.কে. সেনগুপ্ত কফিহাউসের টেবিলে এসে উপস্থিত হন। টেবিলে টেবিলে বড় বড় আড্ডায় প্রচুর কবি লেখক, সবাই খ্যাতিমান। কে.কে.সেনগুপ্ত নিজের পরিচয় প্রকাশ করা মাত্রই টেবিল ফাঁকা হয়ে যায়।

> "পুলিশ অফিসার জানাল যে কলকাতার কয়েকটি গার্লস কলেজ থেকে লেখাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পুলিশের কাছে। লেখাটি, পুলিশের মতে অশ্লীল। কে.কে.সেনগুপ্ত বলে গেল, এসব চলতে থাকলে পুলিশ হাত গুটিয়ে থাকবে না। হাংরি জেনারেশন নিয়ে পুলিশের প্রথম সেটাই প্রথম হস্তক্ষেপ।"[৩৩]

শৈলেশ্বরের এরকম স্মৃতিচারণা আমাদের সামনে এলেও হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আর কেউ হাংরি জেনারেশনের লেখার ওপর পুলিশি আক্রমণের এই 'প্রথম' পদক্ষেপের উল্লেখ করেননি। এমনকি হাংরি জেনারেশন সংক্রান্ত মামলার নথিতেও 'তিন বিধবা'-র কথা উঠে আসেনি বরং অশ্লীলতা সংক্রান্ত তর্ক চলেছিল মলয় রায়চৌধুীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটিকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসের একরৈখিক চলনকে অস্বীকার করা হাংরি আন্দোলনকারিরা এরকমই পরস্পর বিপরীত ও বিভ্রান্তিকর ঐতিহাসিক বয়ান আমাদের সামনে রেখেছেন। মলয় রায়চৌধুরীর স্মৃতিতে হাংরি আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে যেমন তার বোধের

বিভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছে শৈলেশ্বর ঘোষের ক্ষেত্রেও আমরা একই ঘটনা ঘটতে দেখি। মলয় রায়চৌধুরীর স্রষ্টা হওয়ার দাবিকে নস্বাৎ করে দিয়ে শৈলেশ্বর লিখেছেন,

> "আজ দেখা যাচ্ছে মলয় রায়চৌধুরী এক হাস্যকর দাবি উপস্থিত করেছেন যে তিনিই নাকি হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টা। বস্তুত পক্ষে এই হাংরি জেনারেশন সৃষ্টি পর্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ শতকরা ১০ ভাগরে বেশি নয়। হাংরি জেনারেশন কোন একক ব্যক্তির আন্দোলন নয়। কোন একক ব্যক্তির দ্বারা একাজ সম্ভবও নয়। হাংরি জেনারশেন প্রদীপ চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ বাসুদবে দাশগুপ্ত সুবো আচার্য এবং শৈলেশ্বর ঘোষের চিন্তাধারা ও লেখালেখির সম্মিলিত ফল।"[৩৪]

'শৈলেশ্বর-গোষ্ঠী'-র মতে হাংরি জেনারেশনের প্রথম ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকা, পরবর্তীতে যা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হয়েছিল তাতে কোন স্রষ্টা বা নেতার নাম ছিল না। কেননা এই আন্দোলনের স্রষ্টা কোন একজন নন, কেউ একক ভাবে এর নেতাও নন। এই আন্দোলন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। তাই পরবর্তীকালে কেউ বিদেশে অথবা দেশে যখন নিজেকে এই আন্দোলনের স্রষ্টা বা নেতা হিসেবে দাবি করতে চেয়েছেন শৈলেশ্বর ঘোষরা আক্রমণ করতে পিছপা হননি। পারস্পরিক এই ঐতিহাসিক দোষারপের পালা যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তার নমুনা পাওয়া যাবে এর মধ্যে—

> "আমাদের ১৬বি শ্যামাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটের ঘরে এসে আমাকে সুভাষকে বা কলকাতার রাস্তা থেকে প্রদীপ সুবোকে উদ্ধার করেছে বলে যা সব সে লিখেছে সেগুলো মিথ্যা কথা। ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে নানা মিথ্যা দ্বারা সে নিজের একটা ইমেজ তৈরী করতে চায়। আমাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ হচ্ছিল চিঠি পত্রেই, যেমনটি আমাদের আরও অনেকের সঙ্গেই হয়েছিল। কলকাতার জীবনের লুটোপুটির মধ্যে সে কখনই পড়ে নি। সেই সময় তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ আমাদের পাঠায়। নাম 'শয়তানের মুখ'। একেবারে ভূষি। অথচ মলয়ের দু-একটা প্রবন্ধ আমরা পড়েছি। ভাল লেগেছে আমাদের তার কিছু কিছু অংশ। যে লোকের ভাবনা এত গরম তার সৃষ্টি এত বাজে!"[৩৫]

১.৩. প্রতিক্রিয়া

হাংরি আন্দোলন ঘটে যাওয়ার দুই তিন দশক পরে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষেরা এমনভাবেই স্মৃতিচারণায় একে অপরকে বিদ্ধ করেছেন, হাজির করেছেন ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন দলিল। এর মধ্য থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের তৈরি হওয়ার এবং বিস্তারের প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে পাওয়ার পাশাপাশি আমরা বুঝে নিতে চাই যে এই আন্দোলন সেই সময়ে তার পার্শ্ববর্তী সাহিত্য এবং সামাজিক দুনিয়ায় কীরকম প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৬২ থেকে শুরু করে ১৯৬৪ পর্যন্ত এই আন্দোলনের যেরকম কার্যকলাপ সেইসময়ের বাংলা সাহিত্য জগতে তা যে আলোড়ন ফেলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কলেজের চাকরি খোয়ান উৎপল কুমার বসু, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন প্রদীপ চৌধুরী সুবো আচার্যকে। হাংরি লেখালেখি যখন তুঙ্গে ছিল তখনই দেশে বিদেশে এই আন্দোলনের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষত ৬৪-তে পুলিশি ধরপাকড় হওয়ার পরে এই আন্দোলনকে ঘিরে প্রবল চাঞ্চল্য তৈরি হয়, প্রকাশিত হয় একাধিক মত ও পাল্টা মত—

> "মোহিত চট্টোপাধ্যায় : উপনিষদের সেইসব ঋষিকুলের কথা মনে একটি প্রচণ্ড হাংরি-জেনারেসনের সুগম্ভীর আর্তগর্জন শুনতে পাই।...বাংলা দেশের হাংরি-জেনারেশনের লেখকদের প্রসঙ্গে এই ভূমিকার কারণ উপরোক্ত ভাবনার সঙ্গে এঁদের কিছু মিল আছে।
>
> সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : অনেকেই প্রশ্ন করেছেন বলে আমরা লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য হলুম যে হাংরি জেনারেশন নামে কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সঙ্গে কৃত্তিবাস সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। এই প্রকার কোনো আন্দোলনে আমরা বিশ্বাস করি না!..হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ভালো কি খারাপ আমরা জানি না। ওই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে আমাদের

বক্তব্য নাই। এ পর্যন্ত ওদের প্রচারিত লিফলেটগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি চোখে পড়েনি। নূতনত্ব প্রয়াসী সাধারণ রচনা কিছু কিছু হাস্যকর বালক ব্যবহারও দেখা গেছে। এ ছাড়া সাহিত্য সম্পর্কহীন কয়েকটি ক্রিয়াকলাপ বিরক্তি উৎপাদন করে। তবে ওই আন্দোলন যদি কোনোদিন কোনো নতুন সাহিত্যরূপ দেখাতে পারে— আমরা অবশ্যই খুশি হবো। (কৃত্তিবাস, ১৯৬৬)

সাহিত্যের নামে এরা নোংরামি করছে। (দেশ, ১৯৬৪)

এদের লেখা পড়ে মনে হয় এদের মধ্যে যদি কেউ ভবিষ্যতে সার্থক লেখক হতে পারেন তবে এসব রচনা তখন নিশ্চিত তার কিশোর বয়সের ডায়েরি হিসাবে আদৃত হবে। সনাতন পাঠক : (দেশ, ১৯৬৭)"[৩৬]

'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'হাংরি লেখকদের কাছে প্রশ্ন' এই নামে একটি লেখা লিখেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। যেখানে হাংরিরা কেন লেখেন প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা ও রাজনীতি সম্পর্কে তাদের অবস্থান কী, এইসব প্রশ্ন তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে এই নতুন আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ঠ আগ্রহ প্রকাশিত করেছিলেন। দেশ বা আনন্দবাজার সম্পর্কে হাংরিরা যেমন আক্রমণাত্ম ছিলেন উল্ট পক্ষে এরাও হাংরিদের কার্যকলাপের সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন যতদূর সম্ভব। প্রথমদিকের প্রতিক্রিয়ায় সুনীল গাঙ্গুলীকে এই আন্দোলনের প্রতিপক্ষ মনে হলেও হাংরি জেনারেশন মামলায় সুনীল মলয়ের অর্থাৎ হাংরিদের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন। অনুমান করা যায় প্রথমদিকে এই আন্দোলনকে নেহাৎই কৃত্তিবাসের বিরোধীতা বা শক্তি ও সন্দীপনের 'মজা' হিসেবেই দেখলেও, পরবর্তিতে সুনীলের এই ভ্রান্তী দূর হয়।

"Statesman : Calcutta's young 'Rebel' poets of the

Hungry Generation…(1968)

Time Magazine : Calcutta's Hungry generation is a growing band of young Bengalees with tigers in their tanks. To all appearances, their appetites are unlimited. The entire Calcutta establishment rose up in rage. Newspaper editorials, quoting passages from their works proved conclusively that they were dangerouus and dirty. The Hungry

generation's declared goal-'to undo the done-for World and start afresh from chaos". (1964)

Howard Maccord : (Professor Eng. Dept. Washington University) The Indian cultural establishment has been under attack throughout the sixties by a group of earnest and rowdy poets who call themselves the Hungry Generation. The conflict has been most acrimonious in Calcutta, traditionally the center of the Indian literary world, but complacent literatures of Bombay and New Delhi have been stung as well. Acid, distructive, Morbid, Nihilistic, outrageous, mad, hallucinatery, Shrill-these characterise the visions that the Hungralist insist Indian literature must endure if it is ever to be vital again. With new exceptions, contemporary Indian writing is school master's stuff : palid, otiose and dull. It tends either to be timid and moralistic with in a genteel realism or aimlessly philosophical and romantic. But the revolutionary Bengali writers whom the Hungry Generation has built up on such as Manik Bandopadhaya Jibanananda Das are absolutely unknown in the west. Only in the poets of the Hungry generation working their own Bengali poems into nervous energetic English, excluded from the academies and literary aristrocraey can be seen the fullness of urgency and despair that covers south Asia. For they more clearly than any other group have realised that there is possibly no hopefor India that what lies ahead is chaos and collapse. They themselves are not revolutionaries, for there are no longer any political solutions. They are only mourners. Rebellion is pointless when the betrayal is so complete, so deep. All that remains is to scream and writhe and love everything to death.' That any poetry written in India is a miracle (1967)

P. C. Roy : The fact can not be denied that a new type of writer, rather a new trend in Bengali writing has emerged, Many of the writers belong to the 'Hungary Generation.' Their hunger is insatiable. In a sprit of bravado a Hungry man shouts at the society and says :

I have lost count if How many widows I have made pregnant' (Thought, Delhi : 1968)

J. D. Rao (Not by poetry alone) : Most youths now a days consider their highest ambition satisfied if they are able to enter I. A. S. but it may provide some refreshing contrast of find these five young people have by facing trial risked the security of Govermment jobs to write as they think fit. (Now. 1964)

Hungries V/S Hypocrites :

Calcutta : Even in the city of procession and demonstration that is Calcutta, it will have special flavor. The famous (or notorious) Hungry

Generation poets have emerged from nowhere and decided to confront the 'Establishment' in Bengali poetry, when the latter meets for a three day Conference in the city from April 12, 1968 (ie, All India poet's Conference) Terribly excited over the proposed poets conference the Hungries claimed that it was their movement to expose the hypocrisy of bourgeoise decency in poetry that has alarmed the establishment. The hungries have faced court trial for being obscene. They continue to maintain that obscenity is the desperate music of the poets a moral weapon with which to attack the degrading and filthy use of power that Characterise 'our age.' (Blitz, 1968)

Abu sayeed Ayyub : (letter to Allen Ginsberg, 1964) That you agree with the Communist Characterization of the Congress for Cultural Freedom as a 'Fraud and a bullshit intellectual liberal anti-Communist syndicate,' did not how ever surprise me…

If any known Indian literature or intellectual come under police repression For their literary or intellectual work, I am sure the India Committee For Cultural freedom would move in the matter I am glad to tell you that no repressions that kind has taken place here currently.

Karl E. Zink (Associate Professor of English and departmental Chairman at Indiana University) : Salted Feathers এর বিখ্যাত Hungry সংকলন এর আলোচনা প্রসঙ্গে MAHFIL পত্রিকায় লিখেছেন :-- There is entirely too much rant, too much self justification, self Dity, self torture, too much cataloguing of suffering and threat of suicide. But for all this one remains downright haunted by the burning society the hysterical, the despair, the fear of and resignation to death, the common corviction that Indian culture is rotten and doomed, the intense dedication to Art.(1967)

Blitz (Erotic lives and loves of 'Hungry Generation') : They held that the highest form of sex should be masturbation. Because it is not conditioned by the presence of a second individual and it gives scope to flights of Imagination.

They called themselves 'holy barbarians' holy because they are missionaries rebelling against conformities & inhibition which have come to pass for 'civilozation.' They claimed, they are the first Communist of the world. Marx was a product of this civilization and could not get over it. He wanted to bring in class struggle to ene in exploitation of man and thus to usher in a higher stage of society, poor Marx had limited vision. (1964)

Rajib sexena (Poetry of alienation) : In recent yea's voices of protest emerged in those countries (Former colonies of England and

> Mamerica) who dare to speak about their backyard sunder and underworld. *The Hungry Generation group was meanwhile crowned with martyrdom.* In 1964 the stupid Calcutta Police arrested six Calcutta Poets…the event got highlighted by publicity in Time Magazine. But what are these poets upto ? The first thing that strikes after reading their incoher ent manifestoes is *their complete rejection of the present social order*. They have to heap abuses against it in a most aggressive manner and for this purpose colloquial and the slangs seem to be most handy. *The shocking experiences of the modern reality have to be conveyed in an equally shocking language. That is what looks obscene to the 'Cultured' establishment* (LINK, 1968)"[৩৭]

পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ সংবাদপত্র, সাহিত্য ও সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা যখন হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের নিন্দা করতে ব্যাস্ত কিংবা হাংরিদের ওপর হওয়া পুলিশি জুলুমের পক্ষে সাফাই গাইতে ব্যস্ত — তখন এই আন্দোলন ও মামলার খবর পৌঁছে গিয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। জার্মানিতে কার্ল ওএসনার, লাতিন আমেরিকায় মার্গারেট র‍্যানডাল, আমেরিকায় অ্যালেন গিনসবার্গ, লরেন্স ফেরিলিংঘেট্টি, ইংলন্ডে জর্জ ডাইডেন প্রমুখ বিখ্যাত মানুষেরা হাংরিদের সমর্থনে কথা বলেছিলেন। গিনসবাগ ভারতবর্ষের একাধিক পত্রিকা সম্পাদক ও সাহিত্যিককে হাংরিদের সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। হাংরিদের সমর্থনে সই সংগ্রহেরও চেষ্টা হয়েছিল। সেইসময়ের অধিকাংশ সাহিত্যিকই রাজি না হওয়ায় সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। উপরের উদ্ধৃতিগুলোতে হাংরিদের সমর্থ ও বিরোধিতার এমনই একাধিক মতামত লিপিবদ্ধ আছে।

> "সাহিত্যে মাঝে মাঝেই নতুন আন্দোলন আসে। ইদানীংকালের আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাংরি জেনারেশান—যাঁদের মূল বক্তব্য সমস্ত মূল্য বোধের বিনাশ...। প্রত্যেক যুগেই এইসব আন্দোলনের সময় যেসব লোক বাংলা সাহিত্যের সবকিছু গেল গেল রব তোলেন, তাঁদের অতিশয় ন্যাকা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ন্যাকা এবং থুথু চাটা। যে কোনো ধ্বংস বা দক্ষযজ্ঞের কথাতেই সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং নিশ্চিত কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়। (আজকের গল্প, ১৯৬৯)

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিক কিন্তু যে মানুষ সারাক্ষণ ক্ষুধা ক্ষুধা করে তার প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে বিরক্তির উদ্রেক হয়। (আনন্দবাজার দোল সংখ্যা, ১৩৭১)

জ্যোতির্ময় দত্ত : নির্বিচার অতিরঞ্জন বাংলা ভাষার অন্যান্য লেখকদের প্রতি অবজ্ঞা, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা—ক্ষুধিত বংশের অধিকাংশ রচনায় ওইগুলি হল প্রধান লক্ষণ।

বাংলা সাহিত্যের অংশ হিসাবে ক্ষুধিত গোষ্ঠীর রচনা অতীত তুচ্ছ। দিনে দিনে চতুর্দিকে যে গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা, শুচিবায়ু প্রবল আসুরিক আকার ধারণ করছে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এরা তার প্রথম বলি। ভাবতে দুঃখ হয় যে ফরাসি দেশে যা একশো তিরিশ বছর আগে ঘটে গেছে তা এখন আমাদের দেশে বৈপ্লবিক বিবেচিত হয়। কেবল কয়েকটি অল্পবুদ্ধি যুবকের দ্বারা নয়, আমাদের সরকারের দ্বারা, পুলিশের দ্বারা আদালতের দ্বারা যারা এদের বিদ্রোহী বিবেচনা করে দণ্ডদান করেন। (দেশ, ১৯৬৮)

শরৎ দেবড়া : নতুন পবিত্রাতা।

বিমল রায়চৌধুরী : ফ্যানিহিল, ট্রপিক অব ক্যান্সার, ট্রপিক অব ক্যাপরিকরণ এবং লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার প্রভৃতি বই নিয়ে বিদেশে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার নতুন সীমা নির্বাচনের প্রশ্ন উঠতে দেখে সম্প্রতি এখানে এক সম্প্রদায় সস্তায় কিস্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। হয়ত তাদের ধারণা যে আত্মবিজ্ঞাপনের সব চেয়ে সহজ মাধ্যম হলো নিজেদের খরচে কিছু অশ্লীল পুস্তক ছাপানো। অতএব অশ্লীলতার দায়ে এদের ধরপাকড় শুরু হয়।...তাদের বক্তব্য হল এই সম্প্রদায়ের নোংরামি যতটা তাদের ব্যক্তিগত অপরাধ, ঠিক ততটাই আমাদের এই গলিত সমাজ ব্যবস্থার দোষ। ভদ্র পঞ্চজনের যুক্তি ধরেই তাহলে বলা যায় চোর ডাকাত, খুনি, জোচ্চোর, বাটপাড় এরাও সমাজ ব্যবস্থার কুপ্রসব। কিন্তু তাদের কে কবে কোল দিয়েছেন ? (আনন্দবাজার, ১৯৬৪)

রাজকমল চৌধুরী : বাংলা দেশের আধুনিকতম কবি-লেখকদের আন্দোলন 'ভুখী পিড়ী' (হাংরি জেনারেশন), বলা হচ্ছে এদের রচনা নগ্ন, অশ্লীল এবং বীভৎস—এরা মানবমূল্য, জীবন দর্শন, বিচার, সমাজ, ব্যবহার, শিল্প সাহিত্য ধ্বংস করে দিতে চাইছে। কিন্তু অশ্লীলতা এদের সীমা বা উদ্দেশ্য নয়, জীবনের ভিতরের অশ্লীলতা

কুষ্ঠ অপরাধ ও বিকৃতি এরা উন্মোচিত করে তুলে ধরছে। এদের রচনাই তার সাক্ষী। (ধর্মযুগ, ১৯৬৫)

যুগান্তর : হাংরি-জেনারেশন বা ক্ষুধার্ত প্রজন্ম আখ্যাধারীদের উপর পুলিশী অভিযান শুরু হইয়াছে। তাহারা যে ক্ষুধার ব্যাপারী তা পেটের ক্ষুধা নয়, তাহার ভৌগলিক সংস্থিতি নাকি অন্যত্র এবং পিশাচসিদ্ধাই কাপালিকদের মতো উক্ত ক্ষুধার সমুদ্র পাড়ি দিয়াই মানুষকে সুধার কিনারে উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়া নাকি উচ্চকণ্ঠে তাহারা গদ্য পদ্যে নতুন দর্শন প্রচার করিতেছে। শুধু প্রচার নয় এদের চলনে বলনেও নাকি এই মতবাদের ছাপ সুস্পষ্ট...যে দেশে বাৎসায়ন ও কল্যাণমল্লের গ্রন্থ শাস্ত্র বলিয়া কথিত, গীতগোবিন্দ ধর্মায়তনের ধুমধূনায় সম্মানিত, উড়িষ্যা খজুরাহের শিল্প যে দেশে নিঃসঙ্কোচে রসশৈলীরূপে বিবেচিত আর তন্ত্র-ব্যবস্থিত মোক্ষ সন্ধানের উপায়রূপে বিন্দু সাধনাদি অশেষ মর্যাদায় গৃহীত, সে দেশ এই নাবালকবৃন্দ নূতন কথা এমনকি বলিয়াছে...পুরানো ঈশ্বর অদৃষ্ট ও পাপ পুন্যাশ্রিত জীবন বোধের সঙ্গে বাস্তব লাভালাভ ও জৈব স্বাধিকারমূলক নূতন বিজ্ঞান বোধের যে দ্বন্দ্ব এ কালের মনকে আলোড়িত করিয়াছে তাহারই উৎক্ষিপ্ত ফসল ইহারা এবং ইহারা কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির মধ্যে হইতে উঠে নাই। সর্বদেশের বিড়ম্বিত চিন্তাসংঘাত ও তিরস্কৃত জীবন যন্ত্রণাই এই শ্রেণীর মুহূর্তে সম্ভোগী পতঙ্গ-দর্শনের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। হয়তো নূতন ধ্রুব মূল্যমানের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভ্রান্ত যৌবনের পুনর্বসতিই ইহাই সত্যকার প্রতিকার। (সম্পাদকীয় : যে ক্ষুধা জঠরের নয়, ১৯৬৫)

লক্ষ্মী-নারায়ণ মিশ্র : আমেরিকার *time* পত্রিকায় ভূখীপীড়ী (হাংরি জেনারেশন) শীর্ষক যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠ করে সারা দেশের সাহিত্যকার, বিচারক গান্ধীবাদী শাসক দারুণ চিন্তা ও লজ্জায় পড়ে গেছেন। আমাদের জগৎ প্রসিদ্ধ মহামহিম দার্শনিক রাষ্ট্রপতির মথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেছে।

কোলকাতার এইসব তথাকথিত সাহিত্যিকের নির্লজ্জতা বিকৃতি প্রকাশের ফলে পত্র পত্রিকায় দারুণ ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এদের ৫ জনকে চাকরি থেকে হাটিয়ে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছে।...বাসনা এবং বিকৃতির ভূমি ভারত নয়,পশ্চিম। ইউরোপিয় দর্শনে, সাহিত্যে, ইস্কাইলাস, য়ুরিপিডিস সোফোক্লেসে হত্যা, হিংসা, অপরাধ-ত্রাস সঞ্চারক বিয়োগান্ত ঘটনা সব — অমৃতের দেখা মেলে না, সেক্সপিয়রের নাটকে, আত্মঘাত, নারীঘাত, রতির প্রদর্শন — ব্যক্তিবাদ, লালসা,

প্রভৃতি মনোবিকৃতি পশ্চিম থেকেই এসেছে। *Time* পত্রিকায় প্রচারিত বাঙালি সাহিত্যিকদের বিকৃতির যে অন্ধকার, সেই বিকৃতির অন্ধকারই ৩০-শে জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে দিল্লিতে অহিংসার অবতারপুরুষ রাষ্ট্রের পিতাকে হত্যা করে। এইসব সাহিত্যিকরা চায় 'বদনাম না হলে নাম হবে কী করে?' (ভূখী পীড়ী : পশ্চিমি অবিদ্যা, ধর্মযুগ অনুদিত, ১৯৬৫)

কৃত্তিবাস বা তৎসময়ের কবিগোষ্ঠী যা পারেননি অর্থাৎ সুভাষ মুখোঃ, সমর সেন, জীবনানন্দ দাস ও সুধীন দত্তের প্রভাবমুক্ত নতুন কবিতা সৃষ্টির যে কাজ তারা হাতে নিয়েও ব্যর্থ হলেন, সেটা এরা পেরেছেন। এদের হাতে বাংলা কবিতা সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। প্রচলিত কাব্য ধারণার মূলে এরা কুঠারাঘাত করেছেন। এদের কবিতা পড়লে মনে হয় প্রত্যেকের জীবন যেন কবিতার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে পড়েছে। কবিতা এরা বানানি। এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এক একজনের গোপন জীবন, ধর্ম অধর্ম, পাপপূন্য, ক্রোধ লালসা এবং তাই হয়েছে ওদের কবিতা। কবিতা তাদের উলঙ্গ জীবনেরই দিব্য প্রতিকৃতি।

কল্লোলের পর হাংরি আন্দোলনই বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন — যে আন্দোলনের এইসব কবি লেখকদের জীবন থেকেই উৎপত্তি কোনো উত্তরাধিকার থেকে নয়।

এদের কবিতা তথাকথিত অশ্লীল সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ভান ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষমাহীন আক্রমণ এটা।

আজ প্রায় সকলেই যখন পার্থিব সুখের লালসায় এসটাবলিশমেন্টের ক্রীতদাস ভণ্ডের মুখোশ পরে ড্রয়িং রুমের কবি ও লেখক তখন এরাই জীবন ও রক্তের মূল্যে চৈতন্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করে যাচ্ছে।

নমিতা মুখোপাধ্যায় বা শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় : হাংরি জেনারেশন গড়ে উঠেছিল শুধু ছাপার অক্ষরে—মননে বা ব্যবহারে এর কোনো স্বাক্ষর পড়েনি। দূরের লোকেরা ছাপার মাধ্যমে পরিচিত হচ্ছিল, তারা ভাবলো মারাত্মক কাণ্ড ঘটছে বাংলাদেশে। ফলে ডাক তার বিভাগের আয় বৃদ্ধি ও খাঁকি উটদের কুঁজ বৃদ্ধি এবং হয়রানি। বেনারস থেকে লোক এলো Revolution স্বচক্ষে দেখতে। কিন্তু এসে আশ্চর্য! শেষে স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে গেল হাংরি জেনারেশন। (সাক্ষাৎকার : প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৯)

হাংরি জেনারেশনের উৎস সন্ধান : কল্লোল যুগের অস্থিরতা যেমন একটা কৃত্রিম ফাঁপানো ভুয়ো ব্যাপার এ যুগের বঙ্গীয় বিট হাংরি জেনারেশনও তাই, বরং তারচেয়েও বেশি। কলকাতার বিট আর হাংরি জেনারেশন এমনই দুটি হুজুগ, পশ্চিমী আন্দোলনের বন্ধ ব্যর্থ অনুকরণ দাস সুলভ হীনমন্যতরে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত...জামাকাপড় সাজসজ্জা দাড়ি গোঁফে সে এক অপরূপ রূপবান। তার সঙ্গে মদ, বেশ্যা পল্লী, বস্তি, বিবিধ যৌনবিকার বিদেশি উত্তরসূরীদেরও টেক্কা দিয়ে চললো। অবশেষে হাংরি বিট দগ্‌দগে ঘা হয়ে ফুটে বেরুল গল্প কবিতায় নিবন্ধে, যাকে এরা মলমূত্রের শামিল বলেই মনে করে যা আসলে মলমূত্রই। (দর্পন, ১৯৬৪)

শচীন বিশ্বাস : উত্তরাধিকারহীন নৈরাজ্য থেকে, যা এই, সময়ের বৈশিষ্ট্যও বটে হাংরি সম্প্রদায়ের জন্ম। এই অননুরূপতা তাদের জন্মের জন্য যেমন পুষ্টির পক্ষেও তেমন দায়ি। অতঃপর 'আমি কে, আমি কী, আমি কেন এবং আমি কেমন রে, ইত্যাদি এই মুহূর্তের অথচ শাশ্বত প্রশ্ন এবং সমস্যা যেমন দাহ্য জীবনকে সদা জাগ্রত রাখে এবং তাড়না করে বেড়ায় তেমন ওই সব তৎপর প্রশ্নের চোট এবং বিস্ফোরণ ছাড়া কবিতার আর কিছুই করার থাকে না। স্বভাবত সমগ্র ব্যক্তি মানুষ ও কবিতার স্বস্বভাব অস্তিত্বের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ছাড়া দেশকাল পাত্রের জন্য কোনো সর্ত স্বয়ন্ত সত্যরূপে স্বীকৃত হয় না। বস্তুত বেঁচে থাকাই বেঁচে থাকার কারণ ছাড়া অন্য কোনো মৌল হেতুতে হাংরি কবি সম্প্রদায় বিশ্বাসী নন। হাংরি কবিতা পজিটিভ নিগেশন (১৯৬৬)।।

জনতা : এদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা নোংরামি দেখে প্রশ্ন জাগে আদৌ 'মানুষ' বলতে যা বুঝোয় সে অর্থে ওরা মানুষ কিনা ? (কাব্যচর্চার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, ১৯৬৪)।

যুগান্তর (১৮ জুলাই ১৯৬৪) : এই কলকাতার তরুণরা "অতিরিক্ত দুঃসাহসের" এবং "অভিভাবক, সমাজ, সাহিত্যিক, শালীনতা এমনকি পুলিশকেও উপেক্ষা করার" আন্দোলন শুরু করেন, নিজেদের তারা হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায় নাম দিয়েছেন। এই গোষ্ঠীর যোগাযোগ নাকি বিশ্বব্যাপী।

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী (হাংয়ার্কিহীন বিপন্ন লেখক ও হাংরি জেনারেশন) : বাংলাদেশে তুলকালাম শুরু হয়েছে হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে। শোনা যাচ্ছে ১৯৭০/৭১ এর পর বাংলাদেশে একমাত্র হাংরিয়ালিস্ট লেখক ছাড়া আর কোনো লেখক থাকবে না।

হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে ছোট বড়ো মাঝারি ঝাঁঝালো কিংবা অম্লমধুর আলোচনা চলছে। অনেকেই কিন্তু ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখছেন না। বাংলাদেশের মফঃস্বলীয় লেখকের কথা তো বাদই দিলাম, খেতাবপ্রাপ্ত আধুনিক ও সাবালক লেখকরাও হাংরি জেনারেশনের বিপক্ষে বহু কিছু লিখছেন, বলেছেন আবার নকল করার মুসাবিদাও করেছেন কায়দার সঙ্গে। এক কথায় হাংরিয়ালিস্টরা বাংলাদেশে হঠাৎ যেন একটা সাইক্লোন এনে দিয়েছেন। (ঘরণী : ১৯৬৮)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : এমন এক দলের আবির্ভাব হয়েছে যারা নিজেদের নাম দিয়েছেন ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায়। এঁদের লেখার কোনো দৃষ্টান্ত দেয়া আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। এঁদের আমি প্রশ্ন করেছিলাম তাদের রচনা তারা পিতামাতার সম্মুখে পাঠ করে শোনাতে পারেন কিনা—তারা উত্তর দিয়েছেন, না। তাদের এই সত্য উত্তরের জন্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু তাদের এই উত্তরে আমার সম্মুখে অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে। আকাশের শেষ নক্ষত্রটি পর্যন্ত ঢেকে গেছে বলে মনে হয়েছে।

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী : পিতামাতার সম্মুখে পাঠযোগ্য রচনা যদি সাহিত্য বিচারের মাপ কাঠি হয় তাহলে হাংরিয়ালিস্টরা নিঃসন্দেহে ভোটে হেরে যাবেন। কিন্তু ভাববার কথাটা এই যে যাদের রচনা 'সম্মুখের অন্ধকার ঘনীভূত' করতে অথবা আকাশের শেষ নক্ষত্রটি ঢেকে দিতে সক্ষম তারা কি সত্যিই অক্ষম নির্বিষ লেখক ? (১৯৬৯)

পাঠক ভুল করিবেন না : এইভাবে পাঠককে সাবধান করে একটি বহু প্রচারিত সিনেমা পত্রিকায় এই রকম লেখা হয়েছিল, যে এদের বইয়ের বিজ্ঞাপনে থাকে যে সে বইয়ে পশ্চাদ্ধাবমানা ভীতা স্ত্রীলোকদের রমন সুখের কথা লেখা আছে কিন্তু মলাট খুললেই দেখা যায় যে এটা এক মস্ত ধাপ্পা সেখানে মানুষের কুকুর রূপান্তর এবং কুকুরের দেবতায় রূপান্তরের মতো স্যামুয়েল বেকেটিও ব্যাপারে পূর্ণ। (এই সাবধানবাণীর লেখক বিমল রায়চৌধুরী। তিনি রমন সুখের কথা পড়বেন বলেই সম্ভবত বইটি খুলেছিলেন, পাননি, হতাশ হয়েছেন।)

আদিত্য ওহদেদার : বাংলাদেশের সমালোচকদের কাছে এদের বইগুলি নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত। (দেশ ১৯৬৮)"[৩৮]

একাধিক পত্রিকায় স্বনামে ও বেনামে হংরিদের সম্পর্কে বিষাদগার করে কুখ্যাত হয়েছিলেন বিমল রায়চৌধুরী। যে দেশ গীতগোবিন্দ বাৎসায়নের ঐতিয্য, সেই দেশে অশ্লীলতার অভিযোগে

একজন কবিকে কোমরে দড়ি পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে জেলে ঢোকানো কতটা যুক্তিগ্রাহ্য এই তর্ক উঠেছিল। আজকের দিনেও আমরা অনুভব করতে পারি সাহিত্য বা শিল্পের ওপরে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রের এই তর্কের শেষ হয়নি। বাংলা সাহিত্যে হওয়া হাংরি জেনারেশন আন্দোলন আশেপাশের আরও একাধিক সাহিত্যিক ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। ফণীশ্বরনাথ রেণু, বেনারসের কাঞ্চন কুমার হাংরি মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

> "সত্য গুহ : কিছু অতি তরুণ কবি একটা তুলকালামী ব্যাপার করে ফেলেছেন। এদের উন্মার্গগামীতা কারোর কাছে বিরক্তিকর হলেও কবিতা সৃষ্টিতে সততা এবং যুগ উন্মোচনের দক্ষতায় নিঃসন্দেহে এরা প্রমাণ করেছেন যে শক্তি, সুনীল, বিনয়েরা যে ভূমি তৈরি করার চেষ্টা করেছিল এরা তাকে সার্থক করেছেন। এসব কবিরা নিজেদের হাংরি কবি বলে দাবি করেন। এরা কবিতায় একটা সম্পূর্ণ নতুন অবয়ব দিতে পেরেছেন। বস্তুত গত ৫ বছর বাংলা সাহিত্যের নন্দন শিল্পাঞ্চলে যেসব রচনা নিয়ে ভয়ংকর বিতর্ক ঝড়, ওলটপালট ও পুলিশি নির্যাতন হয়ে গেল তারই মধ্যে আছে এদের ক্ষমতার নিঃসন্দেহ প্রকাশ—এবং আছে বলেই পাঠকদের প্রতিক্রিয়া হয়েছে প্রচণ্ড।
>
> (শৈলেশ্বর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, মলয় রায়চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরীদের arrest হবার পরে লেখা এই চিঠি)
>
> সত্য গুহ : ১৯৬১-৬২ সালে কোলকাতার শিল্পী সাহিত্যিদের মধ্যে হাংরি জেনারেশন নামে একটা আন্দোলন বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। প্রথম প্রথম সে আন্দোলন তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি—১৯৬৩-৬৪ সালে (বাসুদেব দাসগুপ্ত, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, সুভাষ ঘোষ, মলয় রায়চৌধুরী, সুবিমল বসাক নতুন ভাবে আন্দোলন শুরু করে।) বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। অশ্লীলতার দায়ে এদের বিচারের প্রহসন হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্য এই আন্দোলন থেকে পেয়েছে কয়েকজন অতি শক্তিশালী কবি ও গদ্য লেখক। এই সব গদ্য লেখক বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। এতদিন পর্যন্ত প্রতীকি জগৎ এবং বাস্তব জগৎ ছিল আলাদা, এবারে বাস্তব এবং প্রতীকি জগৎ আর স্বতন্ত্র থাকল না। বাস্তব, স্বপন্, অবচেতন প্রতীক সব একাকার হয়ে 'এক' এ পরিণত হলো। বাস্তব সত্যরূপ পেয়ে পরিণত হল অতি বাস্তবে। এতদিন পর্যন্ত গল্পকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে

আসার যে চেষ্টা হয়ে আসছিল তাকে সার্থক করে তুললনে এইসব অতি তরুণ গদ্যকাররা। শুধু ভাষা, আঙ্গিক, শব্দ দিয়ে নয় খাঁটি কবিতার বিষয়কেই তুলে নিয়ে এলেন এরা গদ্যে।

কী ফর্মে, কী বিষয়বস্তুতে কী ভাষায় একটা অদৃষ্টপূর্ব নতুনত্বের আবিষ্কার দিয়ে বাংলা গদ্যকে নতুন করে তুললেন এরা। এর পাশে নতুন রীতি গল্পের স্লোগান কেমন যেন মিঁইয়ে এসেছে বলে মনে হয়।

সন্তোষ কুমার ঘোষ : ...ক্ষুধিত (কী না পেয়ে জানিনে) লেখক যা লিখতে চেয়ে পারছেন না, খালি আগাছার চাষ বাড়াচ্ছেন, বয়স্ক সমরেশও যেন তাঁদের দেখিয়ে দিতেই 'বিবর', লিখলেন দেশ, ১৯৬৫)

বুদ্ধদেব বসু : হাংরি লেখকরা নিরক্ষর।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : তাদের রচনা পড়লে মনে হয় যে মানুষের কেবল মাত্র একটি ক্ষুধাই আছে তা যৌন ক্ষুধা, তার মধ্যে আর কোনো ধর্ম নাই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি (রুশ লেখকের আগ্রহ) : রুশ লেখক ও মস্কো থেকে প্রকাশিত বিদেশি সাহিত্য মুখপত্রের প্রাচ্য বিভাগের সম্পাদক শ্রীশ্লোভেনশি ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৬, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান গতি প্রকৃতি বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার আগ্রহ জানিয়ে সে সম্পর্কে কিছু জানতে চান। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় হাংরি জেনারেশনের লেখকদের সমালোচনা করেন। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীকে শাশ্বত ভারতের যথার্থ প্রতিনিধি বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন এ ধরনের চরিত্রকেই সাহিত্যে তুলে ধরতে হবে। ঈশ্বর বিশ্বাসকে বর্জন করে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। রাধারাণী দেবী বলেন, মানুষই ঈশ্বর। মানুষকে নিয়েই যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি হবে।"[৩৯]

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচিত বাঙালি সাহিত্যিকেরা কেউই ক্ষুধার্ত প্রজন্মে এই ক্ষুধার আর্তিকে ভালো চোখে দেখননি। তারাশঙ্করের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মলয় রায়চৌধুরীর মনে হয়েছিল দু-তিন বছরের জেনারেশন গ্যাপ। সাহিত্যের দূষনীয় বস্তুর আমদানি করা হংরিদের জেলে পাঠানোই ঠিক, মনে করতেন তারাশঙ্কর। বাসুদেব দাসগুপ্ত অশোক নগরে থাকাকালীন বন্ধুত্বের সূত্রে হাংরি আন্দোলন ও আন্দোলনকারীদের খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন সত্য গুহ। সাহিত্য

আন্দোলনের দলিল তৈরি করে এই সমালোচক ভবিষ্যতের গবেষকদের ঋনী করে গেছেন। একটি সাহিত্য আন্দোলন তার পারিপার্শ্বিকতায় আঞ্চলিক ভাবে এবং আন্তর্জাতিকতায় কতটা ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, কতটা আলোচ্য হয়ে উঠেছিল সমকালে তার প্রমাণ উপোরিউক্ত যাবতীয় মতামত থেকে পাওয়া যাবে।

১.৪. মুখোশের মজা

১৯৬৩ সাল নাগাদ হাংরি আন্দোলনে একই সঙ্গে অনেকের যুক্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এঁরা হলেন, রবীন্দ্র গুহ, শঙ্কর সেন, অরূপ রতন বসু, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, অমিত সেন, অমৃত তনয় গুপ্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ভানু চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভৌমিক, শম্ভু রক্ষিত, তপন দাস, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অনিল করঞ্জায়ি, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, সুব্রত চক্রবর্তী, দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, মিহির পাল, অরণি বসু, অজিত কুমার ভৌমিক। শৈলেশ্বর ঘোষের মতে ১৯৬৩ তে আমরা সংগঠিত হয়েছিলাম। একই সঙ্গে এই সময় এই আন্দোলন থেকে অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তি যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায় তারা নিজেদেরকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬৪ এর মার্চ এপ্রিল-এ মলয় প্রথম শৈলেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। "যা হোক ১৯৬৪ তে ঠিক হল যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন শুরু হবে মলয়কে গ্রহণ করা হবে...সুবিমল বসাকও হাংরি জেনারেশনে যোগ দেন সেই সময়।"[৪০]

বাসুদেব কথিত যে নব পর্যায় হাংরি আন্দোলন তার শুরুর সময়কাল হিসেবে আমরা এই সময়কেই ধরে নিতে পারি। পাশাপাশি হাংরি আন্দোলনের বিস্তার ও তীব্রতায় ১৯৬৪ সালটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ, হাংরি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য একাধিক লেখালেখি প্রকাশিত হয় এই সময় যেমন প্রদীপ চৌধুরীর 'অন্যান্য

তৎপরতা ও আমি' কাব্যগ্রন্থ, মলয় রায়চৌধুরীর 'শয়তানের মুখ' কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধগ্রন্থ 'আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন ও মৃত্যুমেধী শাস্ত্র', নাটক 'হিবাকুষা' এমনকি বাসুদেব দাসগুপ্তের 'রতনপুর' গল্পটিও ওই বছরই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সর্বোপরি এ বছরই বেরোয় সেই বিখ্যাত 'এক ফর্মার হাংরি বুলেটিন' যার প্রকাশক ছিলেন সমীর রায়চোধুরী, যার জন্যই লেখকদের ওপর পুলিশি অভিযান চলে। কিন্তু শুধুমাত্র সাহিত্যের দিক থেকেই নয়, অন্যান্য দিক থেকেও হাংরি জেনারেশন আন্দোলন তথা আন্দোলনকারীরা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে চটিয়ে তুলেছিলেন একের পর এক কার্যকলাপে।

> "এই সময় আমি একটা বিয়ের কার্ড ছাপালুম। খামের কোণে পাইস হোটেলে হলুদ লাগিয়ে নেয়া হল। তারপর কার্ডগুলি সুবিমল বসাক মারফৎ ডাকে পাঠিবে দেওয়া হল একশোজন কবি-লেখক সম্পাদক-অধ্যাপক সাংবাদিককে। কার্ডের একদিক লেখা 'গাঙশালিখ কাব্যস্কুলের জারজদের ধর্ষণ করো'। ব্যাস। তিরিশ-চল্লিশ পঞ্চাশের কবিরা রাগে ফেটে পড়তে লাগলেন। কারণ, তাঁদের কবিতায় নিসর্গের বাড়া-বাড়ি। আদপে গাঙশালিখ কাব্যস্কুল বলে কিছুই ছিলনা, কিন্তু ছ্যাঁকাটা তাঁদেরই লাগলো। হিন্দি গানের মতন তখন কবিতায় নদী পাখি পাতা ফুল পাহাড় সমুদ্র চাঁদ আকাশ এসব নিয়ে খুব একচোট লদ্‌কালদ্‌কি আরম্ভ হয়েছিল। মানুষের কথাবার্তা এক্কেবারে বাদ।"[৪১]

শুধু এই নয় এই কার্ডের আরেক দিকে সময় ও তারিখ দিয়ে লেখা ছিল লিন্ডসে স্ট্রিটের টপলেস প্রদর্শনী দেখতে আসুন।

> "প্রতিষ্ঠানের মাতব্বর এলিটরা তাঁদের টপলেস ব্যবস্থার সমালোচনা হিসেবে এটাকে ধরতে পারেনি। তাঁরা রাস্তার দুদিকে পুলিশের ওয়ারলেস গাড়ি বসিয়ে দিয়েছিলেন, সঙ্গে প্রিজন ভ্যান। তখন জানতুম না। পরে আমরা জানতে পারি পবিত্র বল্লভ ও সমীর বসু নামে যে যুবকেরা আমাদের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতও তারা আসলে পুলিশের ইনফরমার।"[৪২]

দেবী রায় ২২ জুন ১৯৬৪ তে চিঠিতে লিখছেন,

> "মলয় তুমি-আমি নাকি কলকাতায় অ্যারেস্ট হয়ে গেছি। চতুর্দিকে গুজব। কয়েকজন চেনা হাফ-চেনার সাথে দেখা হলে অবাক চোখে তাকাচ্ছে। ভাবখানা এই : কখন ছাড়া পেলে! আমার তো তখন একতারা নিয়ে বাউল হয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে কলকাতায়। সবাই তালে আছে বাঘে ছুঁইয়ে দেবার।"[৪৩]

অর্থাৎ হাংরি জেনারেশনের এই সমস্ত সাহিত্যিক ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ প্রতিষ্ঠান ও সমাজের নিয়ন্ত্রকদের যে পছন্দ হচ্ছিল না তা ক্রমশই বোঝা যাচ্ছিল। একাধিক সংবাদপত্রের অফিসে জুতোর বাক্স পাঠানো হয়েছিল এমনকি সাদা কাগজের বান্ডিল পাঠানো হয়েছিল রিভিউ করে দেওয়ার জন্য।

> "একটা দেদার বিক্রির কাগজে দেখতুম ঘুরে ফিরে দুচারজনেরই লেখা ছাপা হয়। তারা আবার সেই কাগজেই চাকরি করে। একজনের ধরাবাহিক উপন্যাস চলেতো আরেকজনের গল্প-কবিতা-ভ্রমণ। পাল্টা-পাল্টি করে চলতেই থাকে এই ক্যারদানি। বেছে-বেছে সেই কাগজটায় এদেরই বই-এর রিভিউ হয়। তা-ও আবার কী। বাংলা সাহিত্যের এই সমস্ত মিকি স্পিলেন রবিন্স জেমস হ্যাডলি চেজদের ওই রিভিউগুলোয় প্রমাণ করার চেষ্টা হয় শেকসপিয়র-গ্যেটে শেলি-মালার্মে। তারা এমনিতে শার্ট-প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু সাহিত্য সভাটভা হলেই তাতে ধুতি পাঞ্জাবি কাঁধে চাদর ফেলে পৌঁছে যায়। সে এক বিতিকিচ্ছিরি কান্ড। আমি একদিন সেই কাগজের আপিসে গিয়ে একটা চটিজুতোর বাকসো দিয়ে এলুম রিভিউ করার জন্যে। বিভাগীয় সম্পাদক তো খুব গদগদ ভাব দেখালেন যেন প্রতিটি বই রিভিউ করার কতোই না আগ্রহ। তারপর আরেকজন বিভাগীয় সম্পাদককে একদিস্তে ব্ল্যাঙ্ক শাদা ব্ল্যাংক ফুলস্কেপ কাগজ দিয়ে এলুম। বল্লুম আমার প্রথম উপন্যাস। তিনি অবশ্য ছুঁয়েও দেখলেন না। সামনে একটা কাগজের গাদা ভর্তি ট্রেতে রেখে দিতে বললেন। প্রতিক্রিয়ার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। বিকেল ওব্দি ফেটে পড়ল সারা কলকাতা।"[৪৪]

দৈনিক যুগান্তরে ১৭ জুলাই ১৯৬৪ খবর ছাপা হল ' সাহিত্যে বিটলেমি' শিরোনামে। খবরটা এই :

"আধুনিক সমাজে রাজনীতিকের প্রকৃত স্থান নির্দেশ করা হবে—সেই স্থান হচ্ছে গণিকার মৃতদেহ ও গর্দভের লেজের মাঝা-মাঝি কোথাও। ঘোষণাটি একটি গোষ্ঠীর যাঁরা নিজেদের সাহিত্য-গোষ্ঠী বলে পরিচয় দেন। তবে এঁদের রাজনীতিও আছে এবং সেই রাজনীতির যে-দশদফা উদ্দেশ্যঘোষণা করা হয়েছে তার অন্যতম একটি হচ্ছে উপরের এই উদ্ধৃতিটি। কাব্য সম্পর্কে এঁদের ঘোষণাটি আরো চমকপ্রদ—'কবিতাগ্রন্থ স্ত্রীর চেয়ে মনোরম ও টেঁকসই। বিবাহিত নারী দুদিনেই পুরনো বই-এর তলতলে মলাট বনে যায় কিন্তু কবিতার নারী দিনের পর দিন আঁট হয়ে চেপে বসে আপনাকে।' দুবছর আগে কলকাতার যে-তরুণরা এই অতিরিক্ত দুঃসাহসের এবং অভিভাবক সমাজ সাহিত্যিক শালীনতা এমনকি পুলিশকেও উপেক্ষা করার এই আন্দোলন শুরু করেন, নিজেদের তাঁরা হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুৎকাতর নাম দিয়েছেন। এঁদের মুখপাত্রের কথা যদি ধরি তাহলে গত দুবছরে এই আন্দোলন কলকাতার অন্তত অর্ধশত তরুণকে আকৃষ্ট করেছে। এঁদের বয়স ১৮ থেকে ৩২-এর মধ্যে। এইসব তরুণদের মধ্যে চাকুরিজীবী অধ্যাপক প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছে। মধ্য কলকাতার কয়েকটি রেস্তোরাঁয় পান্থশালায় কখনও পথেরই উপর দাঁড়িয়ে তাঁরা আড্ডা দেন। গ্যাঁজা ভাঙ ইত্যাদি নেশায়ও তাঁদের অরুচি নেই। নর্দমা-প্যান্টালুন ও ছুঁচলো জুতাপরা যেসব মস্তানের সন্ধানে পুলিশ হালে পাড়ায় পাড়ায় নজর রাখছে, অথবা নিজেদের বিটল্‌স বলে পরিচয় দিয়ে যারা গঙ্গার ধারে গাঁজার ছিলিম টানতে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে একগোত্রে ফেললে হাংরিরা আপত্তি করেন (কেননা তাঁরা ইনটেলেকচুয়াল), কিন্তু প্রথমোক্তদের মত এঁরাও পোষাকে ও চলাফেরায় উদ্ভটের উপাসক এবং পুলিশ এঁদেরও সুনজরে দেখেনা। এই গোষ্ঠীর যোগাযোগ নাকি বিশ্বব্যাপী। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এঁদের বুলেটিনের ফোটস্ট্যাট কপি দেখা যায়। লন্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশক এঁদের কবিতার একটি পেপারব্যাক সংকলন বার করবেন বলে স্থির করেছেন। সানফ্রানসিসকোর সিটি লাইটস জার্নাল এঁদের কবিতা সম্পর্কিত ম্যানিফেস্টো ছেপেছে। মেক্সিকোর এলকর্নো এমপ্লুমাদো স্প্যানিশ ভাষাভাষীর সমক্ষে এঁদের পেশ করেছে। ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অ্যাংরিরা যোগাযোগ করে বাহবা জানিয়েছে হাংরিদের। এই আন্দোলন চালানোর জন্য টাকা যোগায় কে ? এঁরা বলেন টাকা আসে শাড়ি-পরা মন্ত্রী, ঝরিয়া খনি শ্রমিক সংস্থা, বারুইপুর ব্যায়াম সমিতি, যোগমায়া ক্লাব, জনৈকা একট্রেস, পাকিস্থানের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও হিন্দু মহাসভার জনৈক সেকরেটারির কাছ থেকে। এঁদের খেদ চালু কোন সাহিত্য পত্রিকায় এঁদের

রচনা ছাপা হয়না। তাই এঁরা একদিন কোন কাগজের অফিসে গিয়ে কয়েক তা সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ দিয়ে বলে এসেছেন — এটা একটা গল্প ছাপাতে হবে। তাঁরা জুতোর বাক্সো পাঠিয়েছেন পুস্তক সমালোচনা স্তম্ভে রিভিউ করার জন্য।"[৪৫]

দুদিন পরেই, সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল দৈনিক যুগান্তরে, লিখেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী, বিষয় হাংরি আন্দোলন।

"কলিকাতার ক্ষুধার্ত ছেলেরা এই ধিক্কার দিতেছে এবং আত্মধিক্কারের মধ্যে বন্দী হইতেছে, ইহা কি বন্ধ্যারাজনীতিকদের প্রায়শ্চিত্ত অথবা অসুস্থ সমাজের অভিশাপ?"[৪৬]

একাধিক কাগজ এক একরকম—

"যেমন : দেবদূতেরা কি ভয়ংকর [চতুষ্পর্ণা] ; ইহা কি বেহুদা পাগলামী [দর্পণ] ; সাহিত্যে বিটলেমি কি এবং কেন [অমৃত] ; কাব্যচর্চার নামে বিকৃত যৌনলালসা [জনতা] ; অশ্লীল পুস্তক রচনার অভিযোগ [আনন্দবাজার] ; ইরটিক লাইভস অ্যান্ড লাভস অব্ দি হাংরি জেনারেশন [ব্লিটজ] ; হা-ঘরে সম্প্রদায় [জলসা]।"[৪৭]

স্টেটসম্যান আর দৈনিক বসুমতী পত্রিকা বের করল কারটুন। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে একজন খবরের কাগজ মালিক সাংবাদিক লেখক গৌরকৃষ্ণ ঘোষকে ডেকে বললেন— হাংরিদের তিনি বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে মারবেন। একাধিক মানুষকে মুখোশ পাঠানোর কান্ড ঘটেছিল কলকাতার আঁতেল আর সমাজকর্তাদের, বেছে বেছে সিভিল সোস্যাইটির প্রতিষ্ঠিত মানুষদের পাঠানো হচ্ছিল বিভিন্ন মুখোশ।

"বাগরি মার্কেটের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে আইডিয়াটা হঠাৎই এসেছিল আমার মাথায়। বাঘ, সিংহ, জোকার, রাক্ষস, কাকাতুয়া, শেয়াল, মিকিমাউস ইত্যাদি নানারকমের মুখোশ কিনে তার উপর ছাপালুম দয়া করে মুখোশ খুলে ফেলুন — হাংরি জেনারেশন। তারপর সেগুলো পাঠালুম মূখ্য অন্যান্য মন্ত্রীদের মূখ্য অন্যান্য সচিবদের, জেলা শাসকদের, সংবাদপত্র, সম্পাদকদের কয়েকজন নাম করা কবি লেখককে হাওড়া শিয়ালদাহ স্টেশন মাস্টারকে যাকে কেউকেটা মনে হয়েছে তাকেই, টেলিফোন ডাইরেকটারি দেখে ডাকে বা বাড়িতে গিয়ে পোস্টবাক্সে।"[৪৮]

আলো মিত্র এবং ত্রিদিব মিত্র তাদের প্রেম তথা বিয়ে নিয়ে একটি প্রতিবাদী ব্যাপার করেছিল। ওরা একটা বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে ছিলেন ঘন কালো বর্ডারে শুভ বিবাহ ছাপ মারা প্রজাপতি আঁকা, খামের কোণে হলুদ মাখানো এবং তাতে লেখা ওঁ গঙ্গা আলো মিত্র (হিন্দু রেজিস্ট্রি মতে ত্রিদিব মিত্রের অবিবাহিতা স্ত্রী আয়োজিত হাংরি জেনারেশনের শোকসভা ২৫শে বৈশাখ দুপুর ১২ টায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবরে মানুষের অকাল মৃত্যুতে)। কার্ডটা পাঠানো হয়েছিল রবীন্দ্র সংগীত গায়ক-গায়িকা, রবীন্দ্র সংগীত বিশেষজ্ঞ আর বিশ্ব ভারতীর অধ্যাপকদের।

হাংরি আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এমনই নানারকম ঘটনা — খালাসিটোলায় কবিতার বই উদ্বোধন থেকে শুরু করে গণিকা পল্লীতে রাত্রি যাপন, ৬-এর দশকের কলকাতার রাস্তায় দল বেঁধে হাংরি বন্ধুদের একাধিক হৈহুল্লোরের রাত, কখনও বা হিপি-হিপিনীদের সঙ্গে চলে যাওয়া কাঠমান্ডু, সেখানে দেশি বিদেশি নানারকম নেশায় মৌতাত জমিয়ে বুদ হয়ে থাকা একের পর এক দিন। শুধুমাত্র সাহিত্য রচনাই নয়, নিজেদের বোহেমিয়ান জীবন দিয়েও এই আন্দোলন— সাহিত্য তথা সাহিত্যিক সম্পর্কে যে তর্কের পরিসর তৈরি করেছিল সেই সময়, তা আজও এই আন্দোলনের ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সংবাদপত্রে সাদা কাগজ পাঠানো বা সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের মুখোশ পাঠানোই নয়, হাংরি জেনারেশন তাদের সাহিত্যের আদর্শ তথা প্রতিষ্ঠান কিংবা বুর্জোয়া এস্ট্যাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের লেখালেখির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন— নিজেদের আচরণকে এমনকি নিজেদের সেলিব্রেশনকেও। ৬ ফাল্গুণ ১৩৭৪ এ খালাসিটোলায় হাংরিরা জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন পালন করেছিলেন এবং ওই অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়েছিল শৈলেশ্বর ঘোষের কাব্যগ্রন্থ ‘জন্মনিয়ন্ত্রণ’।

> “*৬ ফাল্গুণ ১৩৭৪, কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ*
>
> খালাসিটোলায় জীবনানন্দ দাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ ঘোষ, বাসুদেব দাসগুপ্ত, প্রদীপ চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, অবনী ধর, ফালগুনী রায়, সুবো আচার্য, সুভাষ কুণ্ডু, সুবিমল বসাক, অবোধনারায়ণ, কাঞ্চন কুমার আরও অনেকে সেই

প্রশস্ত চালার নীচে লম্বা টেবিলগুলিতে মদের গ্লাস মুখে না তুলে তাকিয়ে রয়েছে নানান শ্রেণির মানুষ। শ্রমিক রিক্সাওয়ালা গৃহস্থ মধ্যবিত্ত, পণ্ডিত, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, চোর সমকামী, হিন্দু, মুসলমান শিখ-ধূপের ধোয়ায় পরিপূর্ণ, নানান সম্প্রদায়ের কবিলেখকরাও উপস্থিত-ফালগুনী : আমার পিতা জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে, বন্ধুগণ। 'সম্ভবত এই প্রথম জীবনান্দ দাশের জন্মদিন পালন এবং এমনভাবে এমন স্থানে যা বুর্জোয়ারা ভাবলে শিউরে ওঠে। এখানেই, কেননা রবীন্দ্রসদনে বা ওভারটুন হলে দক্ষিণ কলকাতা থেকে যেসব দামি মেয়েরা কবিতার নামে মজা দেখতে আসে, তাদের কাছে কবিতা পড়া যায় না—কোনো কবিতার বই এদের হাতে তুলে দেয়া যায় না—একজন মহাকবির জন্মদিন এদের মধ্যে চালনা করা যায় না। এস্টাবলিশমেন্টের কয়েকজন প্রথমে কিছু গোলমাল করার চেষ্টা করে, তারা এখানে নেশা করতে আসে, কবিতার জন্য নয়, কিছু ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে হয়তো তাদের বিবেক তাদের স্বস্তি দেয় না বলে তারা এরকম করেছিল পরে স্তম্ভিত হয়ে ভারতবর্ষে কবিতার জীবন ও শক্তি দেখে তারাও। শৈলেশ্বর ঘোষের কাব্যগ্রন্থ 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'—এর প্রকাশ সেদিনের অন্যতম প্রধান সূচি। পাঠ শুরু হয়। টেবিল ঘিরে শত শত দাঁড়ায়—শৈলেশ্বর পড়েন 'টার্মিনাস পার হতে গিয়ে'—বাসুদেব 'শোকগাথা' পড়তে গিয়ে বলেন, এ আমাদের সকলের জন্য—এ গ্রন্থ আমাদের কাছে ধর্ম গ্রন্থ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি বাসুদেবকে পুরু চশমায় মনে হচ্ছিল, নিশ্চিত ধ্বংস জানার পরে খ্রাইস্টের মতো। সুভাষ পড়লেন 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা'। বললেন, এ কবিতা বাংলা কবিতার সমস্ত অতীত চুরমার করে দিয়েছে। শুভাষের একহাতে গ্লাস। পড়লেন সুবিমল।

চারদিক স্তব্ধ, এই অভিনব দৃশ্য দেখে যাচ্ছিল সকলে। জীবনানন্দ দাশের জীবন স্মরণ করা হল। হিন্দি কবিরা বললেন, পড়লেন তার কবিতা, শ্রদ্ধা জানালেন। ফালগুনী, সুবিমল, সুভাষ ঘোষ, সুভাষ কুণ্ডু, শৈলেশ্বর, বাসুদেব পড়ে গেলেন বোধ, অবসরের গান। প্রদীপ, সুবোর উপস্থিতি ছিল নীরব। এই দৈব পরিবেশে তাদের মাতাল আত্মা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারছিল না।

কাঞ্চন কুমার বেনারস থেকে এসেছেন। একজন হিন্দু কবি হাওড়া স্টেশনে দিল্লিমেলের টিকিট বাতিল করে ছুটে এসেছেন, ভারতবর্ষের এই অনন্য হাংরি ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে। এখানেই কবিতা, এখানেই জীবন, কবিতাই আত্মার মদ।

> পাঠ শেষ হলে অবনী লাফিয়ে উঠলেন টেবিলে, গাইলেন নাবিকদের গান, ১৫ বছর অবনী সমুদ্রের নাবিক, টেবিলের উপরে এক পা সামনে, হাত উপরে, যেন সে স্বাধীনতার পতাকা এবার বহন করবে। কবিতাই স্বাধীনতা। শেষ হলে কেবল গ্লাস ভাঙার শব্দ। গ্লাস ভাঙার শব্দ।"[৪৯]

অভ্যাসের শব্দকে নাকচ করে দেওয়ার জন্য চাই ভাঙচুরের শব্দ, নৈরাজ্যের শব্দ। ছয়-এর দশকের হাংরি আন্দোলন এরকমই চিৎকৃত শব্দ দিয়ে তৈরি করেছিল কবিতার শরীর। সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এই সব স্পর্ধা মাখানো সাহিত্য ও জীবন চিহ্ন আমাদের সামনে রেখে গেছেন হাংরিরা। বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী ধারার ইতিহাস রচনায় হাংরি জেনারেশন তাই আজও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

১.৫. হাংরি চিঠি

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ইতিহাস চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক কবি ও গদ্যকারদের নিজেদের মধ্যে পাঠানো চিঠি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এই আন্দোলন ও আন্দোলন সংক্রান্ত পুলিশি ধরপাকড়ের পরিপ্রেক্ষিতে। হাংরি জেনারেশন ছাড়াও এইসময়ের বাংলা সাহিত্যের আরও একাধিক দিকপাল সাহিত্যিক এই আন্দোলনকে ঘিরে কী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন ব্যক্তিগত স্তরে তারা কী মনোভাবই বা পোষণ করতেন তার সূক্ষাতিসূক্ষ ঘটনা ও ইতিহাস এই চিঠি গুলোর মধ্যে লুকোনো আছে। কলকাতায় হাংরি জেনারেশন সংক্রান্ত আন্দোলন শুরুর সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেশের বাইরে ছিলেন। সে সময় কলকাতায় চলছিল তথাকথিত এই সাহিত্য আন্দোলন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মলয় রায় চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে এই আন্দোলন সম্পর্কে তার বিরক্তি এবং তিনি চাইলেই যেকোনো সময় এই আন্দোলন ভেঙে দিতে পারেন এই বক্তব্য জানিয়েছেন।

‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ পত্রিকায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। যেখানে দেবী রায়কে সম্বোধন করে সন্দীপন লেখা শুরু করেছেন কিন্তু তার পররর্তীকালে একে একে উৎপল অর্থাৎ উৎপল বসু এবং তার সমসাময়িক একাধিক সাহিত্যিক বন্ধুর উল্লেখ রয়েছে। বিশেষত শক্তি এবং সুনীল সম্পর্কে এই চিঠিতে সন্দীপনের তীব্র ব্যঙ্গ এবং বিষাদগার তাও প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত এরই উত্তরে সন্দীপনকে আই ওয়া সিটি থেকে ১৫ জুন ১৯৬৪ তে চিঠি লিখেছিলেন সুনীল। যেখানে সন্দীপনের প্রতি তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে সন্দীপন কী করে এই হাংরিদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন! তিনি নিজে বাংলা ভাষার কবি এবং ইংরেজিতে কবিতা লেখার চেষ্টা যে তিনি করেননি এটা বলার পাশাপাশি এই চিঠি থেকে এইটুকু পরিষ্কার যে তখনও পর্যন্ত সুনীল গাঙ্গুলী হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে নেহাৎই শক্তি সন্দীপনের শখের ব্যাপার ভাবছিলেন এবং ওঁর বিচারে এই আন্দোলন ছিল নেহাৎই ‘কৃত্তিবাস’ ও সুনীলের প্রতিপক্ষতা। প্রসঙ্গত ১৯৬৪ তেই বিনয় মজুমদার একটি লিফলেট প্রকাশ করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন অথবা এই হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে তার দূর্বিনীত মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। এর পাশাপাশি হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের তীব্রতা শেষ হয়ে যাবার পর এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক মানুষের ব্যক্তিগত চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিগুলো থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি নিজেদের হাংরি জেনারেশন বলে পরিচয় দেওয়া এবং আন্দোলনের গর্বে বিশ্বাসী একদল সাহিত্যিক কীভাবে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা, ক্রোধ, ও কাদা ছোড়াছুড়িতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। হাংরি জেনারেশনের ইতিহাস তৈরি করতে গিয়ে মলয় রায়চৌধুরী ও শৈলেশ্বর ঘোষ একেবারেই বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত স্তরে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মিথ্যাবাদীতা, অস্পষ্টতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনেছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ ঘোষ, সুবো আচার্য অথবা প্রদীপ চোধুরী এদের মধ্যেও যে ব্যক্তিগত স্তরে কতটা বিরোধ, কতটা অমিল এবং একে অপরের লেখার প্রতি খুব কম ক্ষেত্রেই যে এরা খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন

তারও অজস্র নমুনা ছড়িয়ে আছে এই চিঠিপত্রে। বিশেষত পুলিশি ধরপাকড়ে এই সাহিত্য আন্দোলনের যূথবদ্ধতা ভেঙে গিয়েছিল। তবে মামলা মোকদ্দমা না হলেও খুব বেশি যূথবদ্ধতার বা সমষ্ঠীগত অবস্থানের চিহ্ন যে এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল না তা অন্তত এই চিঠি গুলো থেকে স্পষ্ট। পরবর্তীকালে মলয় রায়চৌধুরী, সুবিমল বসাক এবং দেবী রায় এঁরা তথাকথিত ভাবে একটি পক্ষ এবং শৈলেশ্বর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ রায়চৌধুরী এঁরা অন্য আরেকটি পক্ষ হিসেবে বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সুবো আচার্য অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জীবনের রাস্তা পাল্টে ফেলেছিলেন, কিন্তু এই তথাকথিত একই পক্ষে থাকা লোকজনের মধ্যও কতটা বিদ্বেষ, কতটা লুকানো ঘৃণা এবং হিংসা ক্রোধ লুকিয়ে ছিল তা নজরে পড়বে এই চিঠি গুলোকে সামনে রাখলে। প্রদীপ চৌধুরী যিনি শৈলেশ্বর ঘোষের বই গ্রহণ না করায় মর্মাহত হবার কথা জানিয়েছেন, সুভাষ ঘোষ তার লেখা চিঠিতে দেবী রায়ের লেখালেখির প্রতি তার একান্ত অশ্রদ্ধার কথা জানিয়েছেন। উল্টো দিকে দেবী রায় তার একাধিক লেখা প্রসঙ্গে তার বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অভিমানে নিজের জীবনের অসময় কাটিয়ে ওঠার ইতিহাস চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন। পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিয়ে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আছে, এমনকি অভিযোগ আছে আত্ম প্রচারের জন্য অন্যের লেখা নিজের নামে ছাপিয়ে দেওয়া। যে বোধের ওপর দাঁড়িয়েছিল হংরি আন্দোলন, যে বোধ পাটনা, ত্রিপুরা, কলকাতা, বিষ্ণুপুর, অশোকনগর, শিলিগুড়ি জুড়ে দলবদ্ধ করে ফেলেছিল একঝাঁক বিদ্রোহী তরুণ আত্মাকে — সেই বোধের অপমৃত্যু ঘটেছিল স্বল্প সময়ে। হাংরি আন্দোলন ও অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আন্দোলন ভেঙে যাওয়ার একাধিক কারণের নির্দেশ এই চিঠিপত্র গুলোতে আছে।

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চিঠির উল্লেখ করা হল[৫০]—

মলয়,

তুমি কলকাতায় কি সব কাণ্ডের বড়াই করে চিঠি লিখেছ জানি না। কী কাণ্ড করছ ? আমার বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ ভাসাভাসা লিখেছে বটে কফিহাউসে কী সব গণ্ডগোলের কথা।

কিছু লেখার বদলে আন্দোলন ও হাঙ্গামার করার দিকেই তোমার লক্ষ্য বেশি। রাত্রে তোমার ঘুম হয় তো ? এসব কিছু না- আমার ওতে কোনো মাথা ব্যথা নেই। যত খুসি আন্দোলন করে যেতে পারো। বাংলা কবিতার ওতে কিছু যায়ে আসে না। মনে হয় খুব একটা শর্টকার্ট ক্যাতি পাবার লোভ তোমার। পেতেও পারো বলা যায় না। আমি এসব আন্দোলন কখনো করিনি, নিজের হৃদস্পন্দন নিয়ে আমি এতই ব্যস্ত।

তবে, একথা ঠিক, কলকাতা শহরটা আমার। ফিরে গিয়ে আমি ওখানে রাজত্ব করব। তোমরা তার একচুলও বদলাতে পারবে না। আমার বন্ধু বান্ধবরা অনেকেই সম্রাট। তোমাকে ভয় করতুম, যদি তোমার মধ্যে এখন পর্যন্ত একটুও জেল্লা দেখতে পেতুম। আমার চেয়ে কম বয়সিদের মধ্যে একমাত্র তন্মব দত্ত এসেছিল বাংলা কবিতায় তলোয়ার হাতে, আমার চেবে অন্তত ছ বছরের ছোটো- কিন্তু জীবনানন্দের পর অত শক্তিশালী কবি এদেশে আর কেউ আসেনি। প্রচণ্ড অভিমান করে ও চলে গেছে। সেজন্যে এখনও আমি অপরের হয়ে অনুতাপ করি। আমি নিজেতে একনো কিছুই লিখিনি, লেখার তোড়জোড়ি করছি মাত্র, কিন্তু তোমার মতো কবিতাকে কমার্শিয়াল করার কথা আমার কখনো মাথায় আসেনি। বালজাকের মতো আমি আমার ভোকাবুলারি আলাদা করে নিয়েছি কবিতা ও গদ্যে। তোমার প্রতি আমার যতই স্নেহ থাক মলয়, কিন্তু তোমার কবিতা সম্বন্ধে এখনো কোনোরকম উৎসাহ আমার জাগেনি। প্রতীক্ষা করে আছি অবশ্য।

অনেকের ধারণা যে পরবর্তী তরুণ জেনারেশনের কবিদের হাতে না রাখলে সাহিত্যে খ্যাতি টেঁকে না। সেজন্যে আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ একসময় তোমাদের মুরুব্বি হয়েছিল। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। নিজের পায়ে আমার যথেষ্ট জোর আছে, এমনকী একা দাঁড়াবার। আমার কথা হল : যে যে বন্ধু আছো কাছে এসো, যে ভালো কবিতা লেখো কাছে এসো- যে যে বন্ধু নও, বাজে কবিতা লেখো দূরে হয়ে যাও কাছ থেকে। বয়সের ব্যবধান তোলা আমার কাছে অত্যন্ত ভালগার লাগে।

চালিয়ে যাও ওসব আন্দোলন আর জেনারেশনের ভণ্ডামি। আমার ওসব পড়তে কিংবা দেখতে মজাই লাগে। দূর থেকে। সাহিত্যের ওপর মৌরসি পাট্টা বসাতে এক-এক দলের অত লোভ কী করে আসে, কী জানি। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো। আমাকে দেখেছ নিশ্চয় শান্তশিষ্ট, ভালো মানুষ। আমি তাই-ই, যদিও গায়ে পদ্মাপারের রক্ত আছে। সুতরাং তোমাদের উচিত আমাকে দূরে দূরে রাখা, বেশি খোঁচাখুঁচি না করা। নইলে, হঠাৎ উত্তেজিত হলে কী করব বলা যায় না। জীবনে ওরকম উত্তেজিত হয়েছি পৌনে একবার। গতবছর। দুএকজন বন্ধুবান্ধব-ও দলে আছে বলে নিতান্ত স্নেহবশতই তোমাদের হাংরি জেনারেশন গোড়ার দিকে ভেঙে দিইনি। এখনও সে ক্ষমতা রাখি, জেনে রেখো। তবে এখনও ইচ্ছে নেই ও খেলাঘর ভাঙা।

আমার এক বন্ধু জানিয়েছে যে তোমরা নাকি আমার কোনো কোনো চিঠির অংশ-বিশেষ ছাপিয়েছ। পত্রসাহিত্য ফাহিত্যি করার জন্য আমি চিঠি লিখি না। আমার চিঠি নেহাত কেজো কথা। অবশ্য লুকোবারও কিছু নেই। কিন্তু আগে-পরের কথা বাদ দিয়ে, ডটডট মেরে চালাকির জন্য আমার কোনো চিঠি যদি কেউ ছাপিয়ে থাকে — তবে আড়াইমাস পরে ফিরে তার কান ধরে দুই থাপ্পড় লাগাব বলে দিয়ো।

সুনীলদা

১০.৬.১৯৬৪

(সমীর রায়চৌধুরীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে)

15 JUN 1964
313 South Capital
Iowa City, Iowa
U.S.A

সন্দীপন,

নদীর পাড়ে গাছের ছায়ায় বসেছি, প্রচণ্ড হাওয়া, সঙ্গে ৫ ডজন বিয়ার ক্যান, পাশে সাঁতারের পোশাক পরা একটা ধলা মেয়ে, মাঝে মঝে তার পাছায় টোকা মারছি পায়ের আঙুল দিয়ে, এ দৃশ্য কেমন ? অবিকল এই দৃশ্যের মধ্যে আমি শুয়ে আছি। চিঠি লিখছি। কিন্তু আমি এ দৃশ্যের মধ্যে নেই। হাতের তালু গোল করে খুব ছোট করে, চোখের কছে আনছি-সব কিছু দূরে চলে যাচ্ছে। মেয়ের মুখও। খিদে নেই। তেষ্টা নেই। তবু বিয়ার খাচ্ছি। কারণ, এখানে বসে খাওয়া বে-আইনি বলে,

ঘরের মধ্যে খুব গরম। থাকতে পারিনি। ঘাসের মধ্যে গড়িয়ে এলাম।একটা দুরন্ত খরগোশকে ধরার জন্য পাঁচবার ছুটে গিয়েছিলাম।

কী ভালো লেগেছিল আপনার চিঠি পেয়ে। বিশেষত লাল পেনসিলের অক্ষর। যেন দুটো চিঠি পেলুম। গল্পটা আপনার ভালো লাগবে জানতুম। গদ্য লিখে আপনাকে খুশি করতে পারব এমন দুরাশা আমার নেই। সত্যি নেই। কারণ, আপনি গ্রেট গদ্য লিখেছেন একসময়, এখন আর তেমন না। কিন্তু যা লিখেছেন তার ধারে কাছে কেউ পৌঁছতে পারেনি। আমি ওরকম গদ্য লিখতে পারি না। লিখবো না। কিন্তু ওই গদ্যই আমার প্রিয় পাঠ্য। আপনি পড়বেন, এই ভয়ে আমি সহজে গদ্য লিখতে চাই না। তবু কখনও লিখি, হয়ত টাকার জন্য, টাকার জন্য কখনও গদ্য লিখেছি বলে মনে পড়ে না, লিখেছিলুম একটা উপন্যাস, সেটা ছাপার সম্ভাবনা নেই। আমার কবিতার জন্য আপনাকে ভয় করি না, কবিতা লেখার ক্ষমতার ওপর আমার বেশি আস্থা নেই, আপনি যেরকম কবিতা ভালোবাসেন, অথবা যাই হোক- আমি সেরকম কখনও লিখব না। আমি কবিতা লিখি গদ্যের মতো, ওরকমই লিখে যাবো। ও সম্বন্ধে আমার কোনো দ্বিধা নেই। শক্তি অসাধারণ সুন্দর বহু লাইন লিখেছে। আমার চেয়ে অনেক বড় আমি ওকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু শক্তির কবিতা গণ্ডিহীন, আমি ওরকম লিখতে পারব না, চাই না, কারণ আমি ওরকম ভাবে বেঁচে নেই।বরং উৎপলের কবিতা আমাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করছে। কিন্তু এখানে এই শুয়ে থাকা, গাছের ছায়া মুখে পড়ছে-তখন মনে হয় কোথাও কিছু নেই, না কবিতা, না হৃদয়।

প্রিয় সন্দীপন দু-দিন পর আজ সকালে আবার আপনার চিঠি পেলুম। কি সব লিখেছেন কিছুই বুঝতে পারলুম না। কেউ আমাকে কিছু লেখেনি। শরৎ ও তারাপদ কফি হাউসে কি সব গণ্ডগোলের কথা ভাসা ভাসা লিখেছে। সবাই ভেবেছে অন্য কেউ বুঝি আমাকে বিস্তৃত করে লিখেছে। কিন্তু আপনার চিঠি অত্যন্ত অস্বস্তিজনক। তিনবার পড়লুম, অস্বস্তি লাগছে। বিছানা থেকে উঠে কলের কাছে গেলুম, ফিরে এলুম টেবিলে, আবার রান্নাঘরে, ভালো লাগছে না, কেন আমাকে এরকম চিঠি লিখলেন। আমি তো শুয়ে ছিলুম। আমি তো বিছানায় রোদ আর আলস্য নিয়ে খেলা করছিলুম। কেন আমাকে এমন ভাবে তুললেন।

সন্দীপন, আপনি অনেকদিন কিছু লেখননি, প্রায় বছর তিনেক। তার বদলে আপনি কুচোকাচা গদ্য ছাপিয়ে চলেছেন এখানে সেখানে। সেই স্বভাবই আপনাকে

টেনে নিয়ে যায় হাংরি হাঙ্গামায়। আমি বারণ করেছিলাম। আপনি কখনও আমাকে বিশ্বাস করেননি। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন। আমি শক্তিকে কখনও বারণ করিনি, কারণ আর যত গুণই থাক — শক্তি লোভী। শেষ পর্যন্ত উৎপলও ওই কারণে যায়। কিন্তু আমি জানতুম আপনি লোভী নন। আপনার সঙ্গে বহুদিন এক বিছানায় শুয়েছি, পাশাপাশি রোদ্দুরে হাঁটার সময় একই ছায়ায় দাঁড়িয়েছি। সেই জন্য আমি জানতুম। আমি আমার লোভের কথা জানতুম। সেই জন্য বুঝেছিলুম আপনার লোভ আমার চেয়ে বেশি নয়। আমার ওতে কখনও লোভ হয়নি, হয়েছিল অস্বস্তি থেকে ঘৃণা। ইংরেজিতে রচনা ছাপিয়ে ইওরোপ আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার বিষম বদ রুচি মনে হয়েছিল আগেই, এখানে এসে আরও বদ্ধমূল হয়েছি। হ্যাংরির গ্যাঁড়াকলের প্রতি আরও ক্রুদ্ধ হয়েছি।অপরের কৌতূহল এবং করুণার পাত্র হতে আপনার ইচ্ছে করে? হাংরি এখানে যে দু-একজন পেয়েছে, তাদের কাছে তাই। আমি এতদিন দেশে রইলুম- অনেক সুযোগ এবং আহ্বান পেয়েছিলাম, কোথাও তবু একটি লাইনও ইংরেজি কবিতা ছাপাইনি। ছাপালে কিছু টাকা পেতুম, তবু না। কারণ সবাইকে বলেছি, আমি বাংলা ভাষার কবি, আমি শুধু বাংলাতেই লিখি, যে ভাষায় কথা বলে ৭ কোট লোক — ফরাসি ও ইতালির চেয়ে বেশি। এবং ফরাসি ও ইতালির চেয়ে কম উন্নত ভাষা নয়। আমার কাজ কবিতা লেখা, নিজের কবিতা অনুবাদ করা নয়, ও কাজ অন্যের। তোমাদের দরকার হলে বাংলা শিখে অনুবাদ করে নাও। এই ধরণের সূক্ষ্ম পিঠচাপড়ানির ভাব লক্ষ্য করেই আমি বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের কাজ, যেজন্য আমি এখানে এসেছিলাম, এক লাইনও করিনি।

হাংরির এই ইংরেজি মতলব ছাড়া, বাংলা দিকটা আরও খারাপ। ওর কোনো ক্রিয়েটিভ দিক নেই। শর্টকার্টে খ্যাতি বা অখ্যাতি পাবার চেষ্টা — অপরকে গালাগাল বা খোঁচা দিয়ে। আপনি মলয়কে এত পছন্দ করছেন — কিন্তু ওর মধ্যে সত্যিকারের কোনো লেখকের ব্যাপার আছে আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে বিশ্বাস করেন না। আমি চলে আসার পরও আপনি হাংরির পৃষ্ঠপোষকতা করছেন — হিন্দি কাগজের জন্য আপনি কি একটা লিখেছিলেন-তাতেও হাংরির জয়গান। ভাবতে খুব অবাক লাগে — আপনার মতো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কি করে ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে ছবি ছাপাটাও উল্লেখের ব্যাপার মনে করে। এগুলোই হাংরির গোঁজামিল। এই জন্যই এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক থাকাতে বারবার দুঃখ পেয়েছি, দুঃখ থেকে রাগ, রাগ থেকে বিতৃষ্ণা। একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি হাংরির কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে

প্রকাশ্যে বিরোধিতা করিনি, ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করিনি। পারতুম। করিনি, তার কারণ, ওটা আপনাদের সখের ব্যাপার এই ভেবে, এবং আপনারা ওটাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন কৃত্তিবাস ও সুনীলের প্রতিপক্ষ হিসেবে। সে হিসেবে ওটাকে ভেঙে দেওয়া আমার পক্ষে নীচতা হত। খুবই। বিশ্বাস করুন, আমার কোনো ক্ষতির কথা ভেবে নয়, আপনার অপকারের কথা ভেবেই আমি আপনার ওতে থাকার বিরোধী ছিলুম। এটা হয়তো খুব সেন্টিমেন্টাল শোনালো, যেন কোনো ট্রিক, কিন্তু ও-ই ছিল আমার সত্যিকারের অভিপ্রায়।

এবার নতুন করে কি ঘটলো বুঝতে পারলুম না। যে-ছাপা জিনিসটার কথা লিখেছেন সেটা দেখলে হয়ত বুঝতে পারতুম। এবং এটা খুবই গোলমেলে- যে চিঠি আপনি চারজন বন্ধুকে একসঙ্গে লিখেছেন, যেটা চারজনকে একসঙ্গে পাঠানো যায়না, সেটা হারাধন ধারাকে পাঠালে কি জন্য, বুঝতে পারলুম না। কিংবা আমার বোঝারই বা কি দরকার? আচ্ছা মুশকিল তো, আমাকে ওসব বোঝার জন্য কে মাথার দিব্যি দিয়েছে এই আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলা? আমি কলকাতা ফিরে শান্ত ভাবে ঘুমাবো, আলতো পায়ে ঘুরবো — আমার কোনো সাহিত্য আন্দোলনের দরকার নেই। মলয় কেন আমার চিঠি ছাপিয়েছে? আমার গোপন কিছু নাই — বিষ্ণু দে-কে অশিক্ষিত বলেছি আগেও, কৃত্তিবাসের পাতায় ব্যক্তিগত রাগে, কারণ উনি ওঁর সংকলনে আমার কবিতা আদ্দেক কেটে বাদ দিয়েছেন বলে। কিন্তু মলয়ের সেটা ছাপানোর কি মতলব? যে প্রসঙ্গে লিখেছিলুম সেটা ছাপিয়েছে তো ? আমি ওকে লিখেছি সম্প্রতি 'সামনে পেছনে বাদ দিয়ে, ডট্ ডট্ মেরে চালাকির জন্য আমার চিঠি যদি ছাপাও, তাহলে এবার ফিরে গিয়ে কান ধরে দুই থাপ্পড় মারবো'। আপনার চিঠি সম্বন্ধেও তাই। আপনার চিঠি ওরা ছাপিয়েছে সেটাই খারাপ- যা লিখেছেন তা নয়। বেশ করেছেন লিখেছেন — আমি না পড়েই বলছি। ওটা আপনার শক্তির বা আমার ঘরোয়া ব্যাপার — আর কার কি তাতে? আপনার যা খুশি বলার অধিকার আছে?

কিন্তু ওসব থাক সন্দীপন। আপনাকে কেউ মারবে না। কার অমন স্পর্ধা আছে? যদি আপনি জায়গা দেন, আমি সব সময় আপনার পাশে আছি। অনেকে আছে। আপনার সঙ্গে কত ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে- কিন্তু এই দীর্ঘদিন নীরালায় ভেবে দেখলুম, আপনাকে বাদ দিয়ে আমাদের চলে না। এক হিসেবে আপনি আমার অপরাংশ, আপনার চরিত্রের অসংলগ্নতা, ভুল এবং জোচ্চুরি — সব কিছু আমার প্রিয়। যেন আমার না পাওয়া জীবন। লেখক হিসেবে 'প্রতিভাবান' এই শব্দটা যদি

ব্যবহার করতে হয় — তবে আমাদের পুরো জেনারেশনে তন্ময় দত্ত ছাড়া — শুধু আপনার সম্বন্ধেই আমি ও কথা ভাবি। আপনারই ওই সুখের সূক্ষ্ম শরীর কেউ ছোঁবে না- কলকাতা শহরে এমন কেউ নেই। না নেই। আপনি নরম ভাবে শুয়ে থাকুন রীনার পাশে, আপনি ওঁকে মঙ্গল গ্রহের গল্প বলুন।

আমি কলকাতা পৌঁছোবো — ১৮ আগস্ট। নানা কারণে এখানে একমাস দেরী হয়ে গেল। দেরী হয়ে গেল আমারই বোকামিতে খানিকটা। জুনের মাঝামাঝি বা আগস্টের প্রথমে প্যারিসে একটা থাকার জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কয়েকদিনের জন্য। আমি জুন মাসটা নষ্ট করেছি- সুতরাং আগস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই। এই ঠিকানায় আছি জুলাই-এর বারো তারিখ পর্যন্ত অন্ততঃ, তারপর নিউইয়র্ক ও ইংল্যাণ্ড। এখান থেকে এম.এ পড়তে পারি আমি-আপার মনে এরকম ধারণা এল কি করে ? আমি কি সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়েছি ? কৃত্তিবাসে আপনার লেখা নিয়ে প্রচুর গণ্ডগোল করেছি- তবু, এবার কৃত্তিবাসে আপনার লেখা না দেখে মন খারাপ লাগলো। এখান থেকে কোনো জিনিস নিয়ে যাওয়ার হুকুম আছে আপনার কাছ থেকে ?

ভালোবাসা
সুনীল

(সৌজন্যে : শহর : অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১২)

সমীর,

মলয়ের ৫ তারিখের মামলার বিস্তৃত বিবরণ নিশ্চয়ই ওদের চিঠিতে জানতে পারবি, বা জেনে গেছিস। সে সম্পর্কে আর লিখলাম না।

দুটি ব্যাপার দেখে কিছুটা অবাক ও আহত হয়েছি। তুই এবং মলয় ইত্যাদি ধরেই নিয়েছিলি আমি মলয়ের স্বপক্ষে সাক্ষী দেবো না- বরং অন্যান্যদের বারণ করবো, কোনোরকম সাহায্য করবো না। তোর অনুরোধে ছিল ‘শেষ অনুরোধ’- যেন আমি প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় বা চতুর্থ অনুরোধ আগে প্রত্যাখ্যান করেছি। মলয়ও কয়েকদিন আগে সকালে আমার বাড়িতে এসে বললো, ওর ধারণা আমি চারিদিক থেকে ওর সঙ্গে শত্রুতা করছি এবং অপরকে ওর সঙ্গে সহযোগিতা করতে বারণ করছি।

অপরপক্ষে, মামলার রিপোর্ট কাগজে বেরুবার পর- কফি হাউসের কিছু অচেনা যুবা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসে। আমি নাকি খুবই

মহৎ ব্যক্তি- হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে কখনো যুক্ত না থেকেও এবং কখনো পছন্দ না করেও যে ওদের স্বপক্ষে সাক্ষী দিয়েছি- সেটা নাকি আমার পক্ষে পরম উদারতার পরিচয়।

ওদের এই নকল উদারতার বোঝা, এবং তোদের অন্যান্য অবিশ্বাস — দুটোই আমার পক্ষে হাস্যকর মনে হল। মানুষ কি স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে ভুলে গেছে ? আমার ব্যবহার এ প্রসঙ্গে আগাগোড়া যা স্বাভাবিক তাই। আমার স্ট্যান্ড আমি অনেক আগেই পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছি। আমি হাংরি জেনারেশন পছন্দ করিনা (সাহিত্য আন্দোলন হিসেবে) আমি ওদের কিছু কিছু পাজী ব্যবহারে বিরক্ত হয়েছি। মলয়ের দ্বারা কোনোদিন কবিতা লেখা হবে না- আমার রুচি অনুযায়ী এই ধারণা। অপরপক্ষে, লেখার জন্য কোনো লেখককেই পুলিশের ধরার এক্তিয়ার নেই- একথা আমি বহুবার মুখে এবং কৃত্তিবাসে লিখে জানিয়েছি। পুলিশের বিরুদ্ধে এবং যে-কোনো লেখকের স্বপক্ষে (যে লেখকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক যাই হোক না) দাঁড়াবো আমি অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজ বলেই মনে করি। কারুর লেখা আমি অপছন্দ করি বলেই তার শত্রুতা করবো, কিংবা অন্যকারুকে নিবৃত্ত করবো তাকে সাহায্য করতে — এরকম নীচতা কি আমার ব্যবহারে বা লেখায় কখনো প্রকাশ পেয়েছে? এসব ছেলেমানুষী চিন্তা দেখলে — মাঝে মাঝে রাগের বদলে হাসিও পায়।

যাই হোক, আদালতের সাক্ষীতে আমি দুটি কথা বলেছি। মলয়ের লেখার মধ্যে অশ্লীলতা কিছুই নেই — এবং ওর লেখাটা আমার ভালোই লেগেছে। ধর্ম সাক্ষী করে আমি দ্বিতীয় কথাটা মিথ্যে বলেছি। কারণ, কয়েকদিন আগে মলয় যখন আসে- তখন আমি বলেছিলাম ওর লেখা আমি পছন্দ করিনা। কিন্তু শ্লীল অশ্লীলের প্রশ্নটি জেনারেল, এবং সেই জেনারেল প্রশ্নে আমি অশ্লীলতা বলে কিছুই মানি না।সুতরাং সেই হিসেবে মলয়ের লেখাও যে বিন্দুমাত্র অশ্লীল নয় তা আমি সাক্ষীর পক্ষে উঠে স্পষ্টভাবে বলতে রাজী আছি। তখন মলয় আমাকে অনুরোধ করে, আমি যদি ওকে সাহায্য করতে চাই তবে জজসাহেবের সামনে ওর কবিতা আমার খারাপ লাগে এটাও যেন না বলি। আদালত তো আর সমালোচনার জায়গা নয়! বরং ওর কবিতা ভালো লাগে বললেই নাকি মলয়ের পক্ষে সুবিধে হবে।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় মলয়ের কবিতা আমাকে পুরো পড়তে দেওয়া হয়। পড়ে আমার গা রি-রি করে। এমন বাজে কবিতা যে আমাকে পড়তে বাধ্য করা হল, সে জন্য আমি ক্ষুব্ধ বোধ করি — আমার সময় কম, কবিতা কম পড়ি, আমার রুচির

সঙ্গে মেলে না — এসব কবিতা পড়ে আমি মাথাকে বিরক্ত করতে চাই না। মলয়ের তিনপাতা রচনায় একটা লাইনেও কবিতার চিহ্ন নেই। মলয় যদি আমার ছোটভাই হতো, আমি ওকে কবিতা লিখতে বারণ করতাম অথবা গোড়ার অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করতে বলতাম। যাই হোক, তবু আমি বেশ স্পষ্ট গলাতেই দুবার বলেছি ওর ঐ কবিতা আমার ভালো লেগেছে। এর কারণ, আমার কোনো মহত্ব নয়- আমার সাধারণ, স্বাভাবিক, সীমাবদ্ধ জীবন। যে কারণে আমি আনন্দবাজারে সমালোচনায় কোনো বাজে বইকে ভালো লিখি — সেই কারণেই মলয়ের লেখাকে ভালো বলেছি। যাই হোক, সেদিন আদালতে দাঁড়িয়ে মনে হল, হাকিম এবং পুলিশপক্ষ এ মামলা ডিসমিস করে দিতে পারলে বাঁচে। কিন্তু মলয়ের প্রগলভ উকিল এ মামলা বহুদিন ধরে টেনে নাম কিনতে চায়!

ডিসেম্বর ৮-৯ তারিখে পাটনায় আমেরিকান সাহিত্যের ওপর একটা সিম্পোজিয়াম হবে। আমি তাতে যোগদান করার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছি। ঐ সময় আমি পাটনা যাবো। আশা করি ভালো আছিস।

সুনীল

(সৌজন্যে : সমীর রায়চৌধুরীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে)

শনিবার
২২/৫/১৯৬৫
মলয়,

এক্ষুণি, তোমার চিঠি পেলাম- আমার লেখা যা মোট ৮ পৃঃ ছাপা হয়ে গেল আজ- থ্রু গাড়ির টিকিট- তোমার দেরি দেখে গত ১ সপ্তাহে ধরে তোমাকে অন্তত পাঁচটি চিঠি দিয়েছি, আমি ব্লক ফটোর অলরেডি তৈরি করেছি- লেখা ছাপিয়েছি ২০০- তুমি তো সব প্ল্যান গণ্ডগোল করে দিলে still আমি তোমার ২৫০ কভারের জন্য আগামী মঙ্গলবার অবধি অপেক্ষা করব প্রেসে সব ছাপিয়ে পুরো মাল পাঠিয়ে দেব তোমাকে- আর যদি না পাই তাহলে ৪০০ art পেপারে আমার ফটো ও ওই লেখা extra ছাপিয়ে দেব তোমাকে-

হ্যাঁ যা বলেছিলাম- ক্ষু. প্র.- তে হারাধনের বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে বলে ওর লেখা জেব্রাতেও ছাপা হবে-এরকম কথা আছে নাকি ? কই তোমার সঙ্গে দেখা হল যখন এরকম বলল না তো—এই তোমার দোষ—আমি তো তোমার

হারাধনের লেখা গুণগত যোগ্যতা না থাকায় ছাপতে বারণ করেছিলাম তোমাকে— গুণও বড় কথা নয় — আসল কথা দেবী রায়ের ক্লিক + এক্সপ্লয়টেশন + নোংরামি।

আসলে ওর লেখা যখন ক্ষু. প্র.-তে ছাপা হচ্ছে না জানল তখন মরিয়া আর কি—আর তো...হেঁ...হেঁ। তুমি তখন জিজ্ঞেস করলেও আমি পরিষ্কার করতাম সব— ফলে তুমি জেব্রা থেকে ওর লেখা withdraw করে নাও। ওর নাকি সব বিদেশি নাঙরা ১০০০-১০০০ পৃষ্ঠার প্রশংসা পাঠিয়েছে—ওই নিয়ে থাকুক ও—O.K. ভালোবাসা নিও—

সুভাষ ঘোষ

১০/৫/৬৬

প্রিয় মলয়,

আমি এর আগে তোমায় একটা চিঠি লিখেছিলাম, হয়তো পেয়েছ। সুবিমল কাল obscenity-র উপরে তোমার ম্যানিফেসটো সেইটে দিল, খুব ভালো হয়েছে, সমবেতভাবে স্বাক্ষর দিয়ে বের করার মতো, খুব ব্যাপক সার্কুলেশন হওয়া দরকার। আমাদের এখানে পাঠাতে পারো কিছু কপি থাকলে। আজকের কাগজ দেখেছ বোধহয়, নারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধ, যেখানে হাংরি জেনারেশনের রেফারেন্স আছে। কলকাতায় এখন কবিতা সাপ্তাহিকী চলছে। কবিতা দৈনিক/দৈনিক কবিতা, সাপ্তাহিক কবিতা, কবিতা ঘন্টিকী কয়েকদিন বাদে বোধহয়, মুহূর্তে মুহূর্তেও কবিতা বেরোনোর পোগ্রাম তৈরি হবে। কবিতা সাপ্তাহিকী থেকে শক্তিকে বের করে দেওয়া হয়েছে, এখনকার সম্পাদক মৃণাল দেব, পরের পবিত্র বল্লভ খুব সম্ভব। সুবিমল বলছিল, আমেরিকা থেকে হাংরি জেনারেশন বেরোবে, সম্ভব হলে তুমি আমার দু-একটা লেখা ট্রানশ্লেট করে দেবে, আমি ভালো ট্রানশ্লেশন নিশ্চই করতে পারব না, এর মধ্যে কলকাতায় আসবে নাকি তুমি, কেমন আছ, চিঠি লিখ বিস্তারিতভাবে। ভালোবাসা নিও।

সুভাষ

প্রিয় মলয়,

প্লিজ তুমি আমার ওই লেখাটা প্রেসে দিও না, তাহলে মারা পড়ে যাব মাইরি। আমি দেড় ফরমার লেখা পরশু নাগাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি— 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট'—

এটা যদি না ছাপ, একদম বসে যাব শালা, তুমি তো বলেছিলে ডিসেম্বরে প্রেসে দেবে—দরকার হলে তোমার সম্পাদকের জমিতেও জায়গা দিও ভাই।

আমার দুটো ফটো পাঠাব, ছাপিয়ে দিও প্লিজ। বড়ো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছি। শালা তোমার রেজিমেন্ট দুর্বল হলে দরকার মতো রাইফেল ধরবে কে—এলে তোমাকে পেট ভরে ভদ্‌কা খাওয়াব মাইরি—আমি কিছুদিন ধরে অসুস্থ—ডাক্তার বলছে মদ্যপানজনিত পেট খারাপ অথবা গ্যাসট্রাইটিস। চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লিখো প্লিজ।

সুভাষ

আলো মিত্র-র বই থেকে দেবী রায়ের দুটো চিঠি :

শোনো মলয়, কে আমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করেছিল আমি ভুলিনি। লালবাজারে টেবিল ঠুকে অনিল ব্যানার্জী বলেছে হেড কোয়ার্টার কোথায়—হোঃ হোঃ. শৈলেশ্বর বলেছিল, 'আজ্ঞে পাটনায়'। তোমার খবর কী ? আমার ওলড ফুল নামটা ব্যবহার করেছ—যা অতীতের তা যেতে দাও। খালাসীটোলায় শুভাষের কলার চেপে ধরতে বলে ওঠে, 'প্রণবদা দেখুন না এঁরা কী করছেন আমাকে, একটা পান খাওয়ান না।' হাঃ হাঃ, আরে সবই জানি। নিজেদের কবিতার স্বপক্ষে একটা প্রবন্ধ লিখেছি।

দেবী রায়

১০/৫/৬৬

প্রিয় মলয়,

কিছুদিন আগে, সুবো আমাকে বলেছিল আমার কবিতায় 'সংহতির অভাব সম্ভবতঃ'— পরিষ্কার লিখেছি 'প্লাস্টিক জীবন, সবুজ সূর্য' কবিতার মধ্যে আমার কবিতাও পারস্পর্য্যহীন এলোমেলো—অপ্রকৃতস্থ। তোমার 'কামড়' এ যাবৎ যত কবিতা আমি পড়েছি তোমারই লেখা—ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় সবচেয়ে ম্যাচিওর।

ফুলস্কেপের প্রায় আরো দিনকয় আগে আমি কৃষ্ণগোপাল বাবুকে পোস্ট করলাম। ওতে লিখেছি আমাকে কী ঘোড়েল এবং বাবু বলে মনে হয় এবং আরো

যত খবরাখবর, যথা ত্রিদিব মদ্যপান করতে আস্বীকার করলে সুভাষ শৈলেশ্বর ওরা ওর হাংরিত্ব নিয়ে হাসাহাসি করে—এটা আমি লক্ষ করেছি। ত্রিদিবের তো জবাব দেওয়ার একটা ক্যারেজ থাকা দরকার। ঐ মুহূর্তে স্রেফ গালগলা ফুলিয়ে বসে থাকলে কী হবে ? কী জানি, আমি ওর অমঙ্গল কামনা করি না বিশ্বাস করো। আগেকার চেয়ে আজ আমি অনেকবেশি জটিলতামুক্ত—complex বিহীন, কিন্তু ওকে লিখতে, প্রমাণ করতে বলো যে সে বেঁচে আছে...এ যাবৎ তার কোনো লেখা—তার দৃঢ় চরিত্রের ছাপ বহন করেছে কি ? যে লিখতে পারবে তা পলিটিক্স না করলেও চলবে—আর এটা খুবই সত্যি যে তুমি নিজেও কিছু কিছু ভুল এবং বোকামো করছো। যার ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে, এবং এটাই তোমার নিয়তি, সিরিয়াসলি লিখে যাও, try to forget past যার যার দল তৈরি করার—তারা তা করার চেষ্টায় সময় খরচা করুক। আমি কারোর সম্পর্কেই আর মোহগ্রস্ত নই। যদি কেউ সিরিয়াসলি লেখে, হাজার শত্রু হলেও আমি তার কথা পরবর্তী প্রবন্ধে লিখে যাব, এবং তার ব্যক্তি চরিত্রের কিছু খবরাখবর—এরা লেখে এরকম—এদের জীবনযাপনের পদ্ধতি এরকম—এরা কথাবার্তা বলে আরেকরকম শৈলেশ্বর ৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছে 'নিজের ভাইকে পর্যন্ত ভাই বলে স্বীকার করি না', ২৬/২৭ পৃষ্ঠায় দ্যাখো, 'আমার ভাই খুব অসুস্থ। তোমার শুশ্রুষার জন্য আমি তোমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ১০ পয়সার চা...' কোনটা ট্রুথ ? জোর করে কোনো কিছু বানিয়ে তুললে—ফাঁপিয়ে তুললে, তা টেকে না কোনোদিনই। নিশ্চয়ই কোনো কোনো লাইন শৈলেশ্বর মারাত্মক লিখেছে, তার যতটুকু প্রাপ্য সেটুকু সে পাবেই। আমিও দেব। ১নং ফৌজ ম্যনেজার শক্তির পতন ২নং মলয়...পতন-এর জবাবও আমি দেব। এসব খেয়োখেয়ির মূল কারণ কি আনন্দবাজারের চাকরি আর পজিশন ? আমি কোনো কিছুই ভুলিনি। ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কে আমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করেছিল/ করে যাচ্ছে—কী নিদারুণ Mental depression-এর মধ্যে দিয়ে আমার দিন কেটেছে আমি জানি, মাত্র দশ পয়সা নিয়ে কলেজ স্ট্রিট যাওয়া, খালিপেটে কফির পেয়ালার দিকে তাকিয়ে থাকা, দুনিয়ার লোকের কাছে টাকা ধার করা, বন্ধুদের খাওয়ার সময় হুট করে হাজির হওয়া—এসব আমি ভুলিনি। চাকরি চলে গেলে হয়ত আমায় suicide করতে হবে। বন্ধুদের (?) ব্যবহারে আমি এতদূর মর্মাহত ছিলুম যে বিয়ে করার একটা প্রয়োজন আমি অনুভব করেছিলাম।সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ভুলে যেতে পারিনি।

আরো সহজ করে নেওয়ার জন্য আমাকে পার্টটাইম চাকরি করতে হয় না এখনও। লেখাটাই আমার কাছে মূল পয়েন্ট।

আমি ঈশ্বর বা ট্রুথে যেমন বিশ্বাস করি, ঐ একই কারণে সাহিত্যে আমার বিশ্বাস—বিবাহেও অবিশ্বাস করি না।

সুভাষ শৈলেশ্বর গোরুর মাংস খায় না, অথচ ত্রিদিব মদ খেতে অস্বীকার করলে ওরা ওর হাংরিত্ব নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে—যদি-ই সুবো শ্রী শ্রী অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে দীক্ষা নেয় এবং ধ্যানের মারফত তার জীবনের গণ্ডগোল সারিয়ে তুলতে চায় বা ভুলে যেতে, কারোরই অধিকার নেই এসব নিয়ে ইনসাল্ট করার।

এসব নিয়ে আরও বিস্তারিত ২নং কিস্তিতে লিখছি। তোমার কিছু খবরাখবর পাঠাতে পারো এবং আমার সম্পর্কিত চিঠিপত্রগুলি—কলকাতার।

একজন আধুনিক আমাদেরই বয়সী কী করে যে লেখে 'তোমার সতীচ্ছদের জন্য আক্ষেপ নেই আমার' আমি ভাবতেও পারি না। ২৬/২৮ বয়সি কোনো যুবকের লেখা একথা ভাবতেই আমার কুৎসিত লাগে।

দেবী রায়

১০/৪/১৯৬৮

বিষ্ণুপুর

১০/১/৬৭

মলয়,

কলকাতা থেকে পাঠানো আমার ছবি এবং এক্সপ্রেস চিঠি এতদিন পেয়ে গেছো নিশ্চিত। আমার কলকাতার কাজ শেষ। আবার এখানে ফিরে এসেছি। সুবিমলের কাগজ সম্পর্কে সুভাষ এবং শৈলেশ্বর কোনো মন্তব্য করেনি—ওদের দুজনের সঙ্গে, কেন কে জানে, আমার রিলেশন ফিকে হয়ে যেতে পারে। বিশেষত এরপর থেকে শৈলেশ্বরকে আমি হয়তো পছন্দ করতে পারব না। ওদের কাগজ ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ নামে বেরোচ্ছে। কলকাতায় এত দীর্ঘদিন পরে গিয়েও আমি যতদিন হইহই করতে পেরেছি — দেখালাম ওরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে বসেছে। আমি punctually কাজ করি বলে আমার সমালোচনা করল, এদিকে বাসুদেব দাস Calcutta University-তে লাইবেরিয়ানশিপ পড়ছে, সে সম্পর্কে নীরব রইল—ওদের এই বিচিত্র মনোভাব

আমার কাছে একটুও গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। শুভাষের মধ্যে যদিও কিছুটা ভালোবাসা আছে, অবশ্য তারও একটা কারণ আমি ধরতে পেরেছি। তোমার নাটক সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়েছিল আমি কিছু বলিনি, কারণ ওদের জিজ্ঞাসার মধ্যে বিশ্রী মোটিভ ধরতে পেরেছিলাম। আমার পোশাক এবং জীবনযাপন সম্পর্কে ওদের মন্তব্যে আমি হেসে উঠেছি — একটা লোক বা অনেক লোককে ততক্ষণ পর্যন্তই সহ্য করা যায় যখন সে বা তারা প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে না। বরং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা শক্তির সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালো লাগে। নানা দিক থেকে আমি কিছুটা সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি সম্প্রতি।

অয়ন আমি পেয়েছি—তোমার কামড় কবিতাটা আমার খুব ভালো লাগেনি, কিন্তু তোমার কবিতার ধারা থেকে ও লেখাটা বাদ দেওয়া যায় না।

কলকাতায় গিয়ে খালাসিটোলার চেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছি সেন্ট্রাল বার-এ, বেশ্যার কাছে গিয়ে বড্ড বেশি প্রেমিকার কথা মনে পড়ে, মদ খেলেই চোখে জল আসে। আমি কারোর ওপর কোনো প্রতিশোধ চাইনি, ঘৃণা করিনি আগে থেকে, আঘাতও করিনি কিন্তু সমস্ত জীবন কেমন যেন হয়ে গেল—দুঃখ, প্রতিশোধ, ইচ্ছা, ক্রোধ, চোখের জল—এগুলোই বেশি করে জেগে উঠছে। তুমি বোধহয় জানো আমি দীক্ষা নিয়েছি এখনও কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু দুঃখ বেড়ে যাচ্ছে। শিল্পের চেয়েও বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকার মধ্যে দিয়ে শিল্প, আমি আবার চেষ্টা করব, দেখি কী হয়!

তোমার এখনকার খবর কী ? চাকরি-টাকার করছো নাকি ? নেশা বা মেয়েছেলে কিংবা প্রেম, কীরকম বেঁচে আছো, কবে নাগাদ বার করছো জেব্রা ?

Please be detail, be elaborate.

সুবো
বিষ্ণুপুর
১৪/৫/৬৭

প্রিয় মলয়,

এর মধ্যে তোমাকে চিঠি, সুভাষকে চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, তোমার বইখানা সম্পর্কে আমি sure নই, তাই আর কিছু করতা পারলাম না। Trunk call করার ইচ্ছে ছিল।

কলকাতার পুলিশ আমাকে ৩১ মার্চ, ৬৫ ত্রিপুরায় এসে গ্রেপ্তার করেছে ; কিন্তু আজ আর সেই প্রাথমিক উচ্ছ্বাস একদম নেই, জুজুর ভয়ও নেই। কবিতার বুকের উপর চেপে বসলে সম্ভবত এইটেই ভবিতব্য। তুমি হাজতে বসে যা আমাকে লিখেছিলে — আমি তার সিগনিফিক্যান্স আগে যেমন, এখন তার চেয়ে অনেক স্বাভাবিক, তাই অনেক ভয়ংকর করে ভাবতে পারছি।

অনেকদিন এমন নিঃসঙ্গতা ও ভয় এবং অনুশোচনায় কাটিয়েছি যে, কী দারুণ উৎকণ্ঠার ভিতর আমি প্রদীপচৌধুরীর যাবতীয় আবরণ খুলে, লাথি মেরে নষ্ট করে, একজন কবন্ধ লেখকে পরিণত হয়েছি। আমাকে না দেখলে আমার মুখোমুখি না হলে , তুমি বুঝতে পারবে না, অসম্ভব দুঃখ পেয়েছি যেদিন শৈলেশ্বরের ঠিকানা থেকে আমার বই ফেরত এসেছিল (ওরা রিফিউজ করেছিল) — হ্যাঁ তখন থেকে আমার অসহায় দুঃখকে চাবুকের মতোই আমি নিজের শরীরে ব্যবহার করে আসছি।

এনি হাউ, আমি ১২ এপ্রিল দুপুর ১২-১২.৫০ এর মধ্যে দমদম বিমান ঘাটিতে পৌঁছব। কলকাতা পৌঁছে ব্যক্তিগতভাবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা থাকবে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছেই যদি তোমাকে এবং অন্যান্য সবাইকে দেখতে পাই। যেভাবেই হোক বিমানঘাঁটিতে চলে এসো। তারপর Air office-এর গাড়িতে না এসে একসঙ্গে ট্যাক্সিতে করে ফেরা যাবে কলকাতায়।

১৪ এপ্রিল কোর্টে সারেন্ডার করার দিন। এর মধ্যে জামিনের সব ব্যবস্থা করে রেখো। আজ আর কিছু লিখি না — লিখলে কেবম অনুশোচনা ও বর্বর সহানুভূতিই আমাকে কাটাবে। ভালোবাসা জানাই। তোমার

প্রদীপ চৌধুরী
৭/৪/৬৫

প্রিয় মলয়,

'ক্ষুধাও আর্ত সন্ততি সম্পর্কে ইতস্তত' সুবোর এই, যে essay-টা আমি ফুঃ ২-তে ছাপছি—এটা প্রায় ১২ পৃষ্ঠার মতো হবে ; এর প্রথম অংশে Conventional বাংলা সাহিত্যের চামড়া ফাটিয়ে HG-র মারমুখী উত্থানের বিবরণ — ২য় অংশে সুভাষ, প্রদীপ ও বাসুদেবের বইয়ের বিস্তৃত আলোচনা। Essayটা আজ থেকে অনেকদিন আগে ও আমাকে পাঠিয়েছিল approach টা মোটামুটি ভালো লাগতে পারে তোমার, তবে সুনীলের কোটেশন ব্যবহার তোমাকে কিছুটা ক্ষিপ্ত করতে পারে হয়তো। আজ শুভাষের চিঠিতে City Light-এ প্রকাশিত একটি essay-কে কেন্দ্র

করে দেবী ও সুবিমল ও তোমার বিতর্কের খবর পেয়ে এ চিঠি লেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

অবাক এই (তোমার কাছে লাগতে পারে হয়তো), সুবোর essay-তে তোমার বইয়ের কোনো আলোচনা নেই — শৈলেশ্বর সম্পর্কেও উল্লেখ নেই। তার অবশ্য কোনো বই নেই। হয়তো সুবোর হাতে তখন তোমার কোনো বই ছিল না। অথবা তোমার সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করতে আমাদের অনেকেই ভয় পাচ্ছে—what ever the case might be—এ ঘটনাতে কেন্দ্র করে ওর ওপর কোনো জাজমেন্ট করে বোসো না। আমাদের প্রত্যেকের বন্ধু, তাই প্রত্যেকের কাছে অপরিহার্য হওয়া দরকার। নয় কি ? আমি ডিক বাকেনের জন্য একটা লেখা লিখেছিলাম। পাঠানো হয়নি অবশ্য। তাতে তোমার জখমের উপর একটা বড়ো chapter অ্যালাট করা হয়েছিল। সুবোর-র essay-র পরিশিষ্ট হিসেবে আমি তা ফুঃ ২-তে ছাপছি, appreciation-টা ভালোই লাগতে পারে তোমার। Eassay-টাও এতে অভিনব হবে—তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা authority থাকাও ভালো মনে করি। গরমের ছুটতে কলকাতার বাইরে কোথাও একসঙ্গে প্রত্যেকে কাটাতে পারলে খুব ভালো হত। সমবেত orgy কতদিন করা হচ্ছে না—কতদিন হায়।

'খুব দ্রুত তোমার বিস্তারিত চিঠি দাও।

প্রদীপ

১১/৪/১৯৬৭

India Hotel
62, Surjya sen street
Kolkata-9

প্রিয় মলয়,

কলকাতা এসেই ভীষণ অর্থকষ্টে পড়ে গেছি। সঙ্গে বউও রয়েছে। তুমি আমার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমপক্ষে ২০০ ধারদেনা করে হলেও পাঠিয়ে দাও। টাকাটা আমার ১ জুনের মধ্যে দরকার। DONT FALL TO WIRE RUPEES TWO HUNDRED AT ONCE.

এটাকে কোনো শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে দিও না।

বিয়ে করে আমি এতই crippled হয়ে পড়েছি যে কারোর সঙ্গেই ঠিকমতো সময় কাটাতে পারছি না। আমি তোমার T.M.O.-র অপেক্ষা করব। আসম্ভব risk-এর মধ্যে আছি।

২৭/৫/৬৭

প্রদীপ

পঞ্চাশ দশকের কবিরা তখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি আরম্ভ করে দিয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভাবছেন তাঁর কৃত্তিবাস গোষ্ঠীকে ভাঙার জন্যই হাংরি আন্দোলন। বিনয় মজুমদার, স্কিৎসোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত, প্রকাশ করলেন তাঁর সেই বিখ্যাত লিফলেট। তুলে দিচ্ছি হুবহু :

১. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনিপুণ নপুংশকরূপ আশা করি এযাবৎ পাঠক-পাঠিকা স্বচোক্ষে দেখার সুযোগ পাননি ; সরকার পৃষ্টপোষকতা করে অবস্থাকে বেশ মজাদার করেছেন ; পদলেহী কুক্কুরের নিয়োগকারিণী চালচুলোহীন এক নারীর আত্মার নির্দেশনা অনুসারে উক্ত কবি নিজেকে মহিলা মনে করে কবিতা লেখেন ; আর কথোপকথনকালে দেখি মহিলার অভিনয় করার শ্রীমানটির কোনো ভাবলেশ উপস্থিত হয় না ; অথচ ক্রমে ক্রমে আমার দাসীত্ব দিয়ে সেই বেয়াদপ আত্মাটিকে শায়েস্তা করেছি, আর অঙ্কশাস্ত্রে শ্রীমতিএখন মতামত জ্ঞাপনের মতন স্থূলতা দেখাবার বিপদের ঝুঁকি নিতে সক্ষম হবে কি ?

২. স্থাপত্যবিদ্যায় ফেল মেরে মেরে অবশেষে এক ছাগলাদ্য বীর্যজাত নির্মল মৈত্রেয় জীবিকার হাস্যকর ভিক্ষাবৃত্তি ঝুলে আছে ; তবে ভয় নেই যতক্ষণ তার কচি পায়ু আছে, দালালী রয়েছে।

৩. সন্দীপন, হে শ্রীমান, দাস অনুদাস শব্দটি শুনেছিলাম কবে যে প্রথমবার ঠিক মনে নেই। তবে এটা নিশ্চিতই কবুল করতে হবে আজ—দাসী অনুদাস বলে কোনো শব্দ এযাবৎ আমিতো শুনিনি। ফলে যথাযথরূপে তোমার অবস্থা প্রকাশের ভাষার স্বল্পতা, বৎস, ভবিষ্যতে ভেবে দেখা যাবে।

৪. দল পাকাবার আগে, পরেও তাদের রেকটাম বীট করে দিয়েছি বলেই , এইসব কেঁচোবৃন্দ বীটনিক নাম নিয়েছিল।

১০.৬.১৯৬৪

রচয়িতা ও প্রকাশক

বিনয় মজুমদার

মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রিয় দেবী,

পরপর দুসপ্তাহ এলেন না, কোনো চিঠিপত্রও নেই, দোষ একটি মাত্র করেছি। এতোদিনের বন্ধুত্বে একটি, আপনাকে লেখা দিইনি। এজন্যে যদি কিছু মনে করে থাকেন, আমার কিছু করার নেই। উৎপল আপনার ওখানে গিয়েছিল ? প্রিয় উৎপল অনেকদিন দেখা হয়নি। রয়েড স্ট্রীটে উঠে গেছেন ? আমি সুনীলের একটা চিঠি পেয়েছি। আমি খুব ভালো নেই। একদিন যদি চলে আসেন খুব ভালো হয়—আপনি তো শক্তির মতো ধান্দায় ঘোরেন না। আপনি চলে এলেই পারেন। বীট দের একটা পত্রিকা Now ডাকে পেয়েছি। প্রেরক C Plymell একজন কবি। 1537 N. To Peka / Wichita / kansas USA. একতা উত্তর দিয়ে দিন। ভাই শক্তি 'দেশে' কলাম ছাপানো ব্যাপারে তৈরি plan কী successful হল, অন্যান্য plan গুলো শঙ্কর, বরেন, সুভাষ মুখো থেকে শুরু করে নরেশ গুহ স্টিল সুনীল, বুদ্ধদেব, নীরেনবাবু ইত্যাদি মিলিয়ে ও বিধু, রবীন দত্ত, শামসের সমেত ও অধুনা শংকর কী যেন (ছাড়পত্র সম্পাদক) প্লেআস শরৎ ভাস্কর প্রণব প্রভৃতি নিয়ে যে বিরাট জাল ফেলেছিস সেটা এবার তোল। আমরা আর কত সময় দাঁড়িয়ে থাকব ? তারপরেও অপেক্ষা করতে হবে। আমেরিকাগামী প্লেনে দমদমে see off করতে পারলে তবে আমার ছুটি। প্রিয় সুনীল আপনার চিঠি পেয়েছি। আমার bedroom-এ উঁকি মারছেন কেন ? আমার সমূহ বিপদ—এই প্রথম আমার মনে হচ্ছে আমার দ্বারা বুঝে ওঠা সম্ভব হবে না এখন আমার কী করা উচিত, এখন এই প্রথম আমাকে অপরের উপদেশ-মত চলতে হবে। প্রিয় দীপেন তোমার কী হল ? কোথায় থাক ? তুমি জেনো আমার সব অপরাধের শাস্তি আমি ভোগ করছি। প্রিয় উৎপল আপনি ছাড়া কারো সম্পর্কে এখন বন্ধুত্বের বোধ নেই। সুনীলের জন্য আছে, কিন্তু তা বোধহয় সে আমেরিকায় আছে বলে। শ্যামবাজার থেকে টু-বি ধরেছি, দোতলা, মাঝে-মাঝে বাসস্টপগুলির সুযোগ নিয়ে লিখছি। একদিন আসুন।"

'প্রতিদ্বন্দ্বী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের এই লেখাটি ১৯৬৪-র গীষ্মে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সুবিমল বসাক।

১.৬. হাংরি মামলা

সময়টাই ছিল আন্দোলনের। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতার অভাব ছিল না। ১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধ এবং ১৯৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, পুলিশ, গ্রেপ্তারি-পরোয়ানা ইত্যাদি শব্দগুলোকে নতুন মাত্রায় হাজির করেছিল। এই সময়ই হ্যাণ্ডবিলের মতো ফালি কাগজে খিদের কবিতা লিখে কলকাতার রাস্তায় গলিতে সাঁটিয়ে দিচ্ছিলেন একদল যুবক। খিদে ছিল জীবনের, খিদে ছিল স্বাধীনতার, খিদে ছিল যৌনতা মুক্তির। সংবিধানের শেকলে আঁটা রাষ্ট্র স্বাভাবিক কারণেই 'বিড়ির প্যাকেটের কাগজে কবিতা লিখে' সাহিত্য তৈরির চেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। নৈরাজ্য যা আমাদের বিচারে পুরানোকে সরিয়ে নতুনের আহ্বায়ক। তার ইতিহাসের দিকে তাকালেও আমরা দেখবো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় নৈরাজ্যগামী মানুষকে হয় নির্বাসিত হতে হয়েছিল, হয় কারাদন্ড ভোগ করতে হয়েছিল অথবা পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। নৈরাজ্যের সৌন্দর্য সাধনায় বাংলা সাহিত্যে পথ হাঁটতে শুরু করল, যে হাংরি জেনারেশন স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রশ্নে প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন যে সমস্ত কবি-লেখকরা তাদেরকেও যে রাষ্ট্র রেহাই দেবে না এটাই অনিবার্য ছিল। সর্বোপরি হাংরি আন্দোলন ছিল ঘোষণামূলক ও আক্রমণাত্মক। 'আমরা কী করতে চাই' শুধু এটুকু বলেই হাংরিরা থেমে যাননি, অবদমনকারী সভ্যতার পোষাক ধরে এরা টান মেরেছেন। সামাজিক মূল্যবোধের শেকড়ে এরা পৌঁছে দিয়েছেন আতঙ্কের চিৎকার।

হাংরি আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার আরো আগে কবিতায় অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল আরেকজন কবি অধ্যাপকের প্রতি। ইনি হাংরিদের প্রণম্য জীবনানন্দ দাস। হাংরি মামলা হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে ১৯৬৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' উপন্যাসটিকে নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়ে মামল হয়েছিল। অভিযোগ ছিল অশ্লীলতার। অর্থাৎ সাহিত্যকে কেন্দ্র করে অশ্লীলতার অভিযোগ এবং সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে মামলা

মোকদ্দমার নজির রয়েছে। কিন্তু হাংরি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিষয়টির পার্থক্য এই — এদের চিৎকৃত মেধাবী আক্রমণের জবাব শাসনতন্ত্র আক্রমণ করেই দিয়েছিল। কলকাতা থেকে শৈলেশ্বর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ; পাটনা থেকে মলয় রায়চৌধুরী এবং ত্রিপুরা থেকে প্রদীপ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশের নিশানায় ছিল আরও অনেক নাম। স্বাধীন ভারতবর্ষে কবিতা লেখার দায়ে কবিকে কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে পুরে দেওয়া হয়েছিল জেলখানায়। তারপর চোর, পকেটমার, ছিনতাইবাজদের সঙ্গে জেলে কাটানোর 'উচিত শিক্ষা', অজস্র জিজ্ঞাসাবাদ, তদন্ত ও বাড়ি-মেস তন্ন তন্ন করে খোঁজা বিদ্রোহের এক-একটি লিপি চিহ্ন। রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া একদিকে যেমন বুঝিয়ে দেয় যে হাংরি আন্দোলন ক্রিয়া করতে পেরেছিল কতটা গভীরে, পক্ষান্তরে পুলিশি ধরপাকড় হাংরি ইস্তেহারের আহ্বানকে আরও ছড়িয়ে দিয়েছিল রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও। রাষ্ট্রীয় দমন সাময়িক স্তব্ধতা তৈরি করেছিল এই আন্দোলনে। বিশেষত পুলিশের কাছে দেওয়া মুচলেকাকে কেন্দ্র করে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছিলেন আন্দোলনকারীরা। হাংরি জেনারেশন সংক্রান্ত বিচার-বিভাগীয় পর্বটি এই আন্দোলনের অভিঘাত এবং এই আন্দোলন ভেঙে যাওয়ার অনিবার্যতাকে ধারণ করে আছে।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ এস.আই.ডি.ডি. শ্রীকালীকিঙ্কর দাস 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন :

> "I.S.I Kalikinkkar Das of D.D. do hereby lodge a report that following up a credible information that an oboscene unauthorised Bengali Booklet entitled Hungry Generation is in circulation, collected a copy in which on scrutiny it was found to contain obscene passage in the contributions of different writers. A thorough enquiry to unravel the persons responsible for its publication was undertaken. Enquiry revealed that the said booklet was brought into publication under the joint efforts of the under noted person who contributed towards the publications of the same by offering articles poems etc. And also rendering assistance for bringing out of the publication in or about August 1964 under the fictitious name of the publishers.

From the fact disclosed above it is clear that the accused persons entering into criminal conspiracy to bring out the aforesaid oboscene publication which was found on circulation from August, 1964.

I, therefore, prefer a charge against the accuse persons.
U/S 120 B/ 292 I.P.C.

sd/- Kali Kinkar Das
S.I.D.D. 2.9.64"[৫১]

এই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতার জোড়াবাগান থানার এস.আই এস.এন পাল. F.I.R. করলেন একই দিনে :

"Sec. Bc/No. 360 dt. 2.9.64 U/S 120 B/ 292 IPC

Police Station... Jorabagan

Subdivision : Bankshall (North) District : Calcutta.

No. 7 Date and hour or occurance....

Dated and hour when reported : 2.9.64 at 9.55P.M.

Place of occurance and distance and direction from Police

Station and Jurisdiction number : Not known.

Name and residence of informant and complaint :

S.I. Kalikinkar Das of D.D.

Name and residence of accused :

1. Subha Acharjee
2. Prodip Choudhury
3. Debi Roy
4. Subimal Basak
5. Basudeb Dasgupta
6. Saileswar Ghosh
7. Utpal Kumar Bose
8. Ramananda Chatterjee
9. Malay Roy Choudhury
10. Subhash Ghosh
11. Samir Roy Choudhury

Brief description of offence with section, and of property carried off, if any : Entering into a criminal conspiracy for an oboscene unauthorised publication to wit a booklet Hungry Generation and thereby continued its circulation to corrupt the minds of the common reader.

U/S 120 B/ 292 I.P.C.

sd/- S.N. Paul

S.I. Sec B.

2.9.64"[৫২]

যে পত্রিকাটিকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল হাংরি জেনারেশনের সেই সংখ্যায় প্রকাশকের নাম ছিল সমীর রায়চৌধুরী। প্রকাশস্থান ৪৮এ, শঙ্কর হালদার লেন, আহিরিটোলা, কলকাতা, ভারতবর্ষ। মুদ্রকের নাম না থাকায় সম্ভবত এই সংখ্যাকে 'Unauthorised Bengali Booklet' বলে উল্লেখ করেছিলেন পুলিশ। কালীকিঙ্কর দাস জানিয়েছিলেন 'Credible information' থেকে হাংরি জেনারেশনের প্রচারের কথা জানতে পারেন। পুলিশের ইনফর্মাররা যে হাংরি আন্দোলকারীদের ওপর নজর রাখছিল শৈলেশ্বর ঘোষ সে কথা উল্লেখ করেছেন। অভিযোগ ছিল : 'Entering into criminal conspiracy for an obscene unauthorised publication' এবং 'To corrupt the minds of the common reader'।

লিফলেটের মতো ছড়িয়ে দেওয়া হাংরি কাগজগুলোর কতজন সাধারণ পাঠককে 'corrupt' করার সম্ভাবনা ছিল? যে সময় বাজার চলতি একাধিক সাহিত্য পত্রিকায়, গল্পে উপন্যাসে পেশ করা হচ্ছিল নায়ক নায়িকার রোমাঞ্চগচকর শরীরি অভিযানের বর্ণনা, যে সময়ের কলকাতার বই-স্টল আলো করে পর্ণগ্রাফী বিক্রী হত, সেই সময়ে হাংরি জেনারেশন পত্রিকাকেই কেন এত বিপজ্জনক মনে হল পুলিশের? ১৯৬৫ সালের ২৭ জানুয়ারি Indian Committee for Cultural Freedom-এর Executive Secretary Mr. A.B.Shah মলয়কে একটি চিঠিতে লিখেছেন :

> 'I met the Deputy Commissioner of Police the day after we met at the office of the Radical Humanist in Calcutta. I was told that they would not have liked to bother themselves with the 'Hungry Generation' but for the fact that a number of citizens to whom the writings of your group were made available, insisted on some action being taken.'[৫৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে পুলিশের দক্ষতা বা সক্রিয়তার চেয়েও হাংরিদের গ্রেপ্তারিকে ত্বরান্বিত করেছিল কিছু 'সিটিজেনের' আপত্তি। পুলিশ যদিও দশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল কিন্তু অশ্লীল সাহিত্য প্রচার ও লেখার জন্য গ্রেপ্তার করা হলো ছ'জনকে। ২ সেপ্টেম্বর তারিখেই

কলকাতা থেকে শৈলেশ্বর ঘোষ ও সুভাষ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হলো। মলয় গ্রেফতার হলেন পাটনায় ঐ মাসের চার তারিখে। এর পর চাইবাসা থেকে সমীর রায়চৌধুরী, ত্রিপুরা থেকে প্রদীপ চৌধুরী এবং হাওড়া থেকে দেবী রায়কে ধরে এনে ছ'জনকে হাজতে পুরে দেওয়া হলো। পাটনায়, মলয়ের বাড়ি তল্লাশি হয়েছিল ৪.৯.৬৪ বিকেল ৫-৪৫ থেকে ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত, প্রায় তিনঘণ্টা ধরে। পুলিশের বানানো সার্চলিস্ট :

"Copy of Search list

1. Date and hour of Search : on 4.9.64 between 5.45 P.M. and 8.30 P.M.
2. Name and residence of person whose house is searched : Malay Roy Choudhury son of Shri Ranjit Roy Choudhury of Dariapur Mohalla. P.S. Pirbahar Dist. Patna.
3. Name and residence of witness to search :
    1. Shri Brojendra Prosad Sarma son of Shri Baldeo Prosad Sarma of Sahajpura. PS Bikram Dist. Patna.
    2. Ramnath Prosad son of Gangdeo Lall of Manjhopur

P.S.Mashrak Dist. Saran.

Articles Seized :

1. One Booklet in Bengali Hungry Generation.
2. One flat file containing several manuscript i.e.e Atmahatya inBengali and drama and short story and other poems without any title.
3. Two diary books of Malay Roy Choudhury — one containing in English and the other in Bengali Writings.
4. One bundle of leaflets numbering ten under the heading of Hungry Generation.
5. Two flat files containing letters and correspondence addressed to Malay Roy Choudhury by different persons containing pages 60 and 40 respectively.
6. 27 Booklet under the title 'A vehement criticism of our plan' by Malay Roy Choudhury.
7. Two blocks with their specimen prints.
8. One English book styled as Evergreen Review.

9. One Booklet in Bengali ‘Bijanu Raktanasa’.
10. One Booklet by Pradip Choudhury as Sakal.
11. Three excercise books containing stories in Bengali.
12. Loose sheets of Printed papers containing 20 pages under heading Itihash Darsan.
13. One English book as sex love life.
14. Two Booklets ‘Unmad’.
15. One Hindi book ‘Lahar’.
16. One Bengali book ‘Byavichar’.
17. One manuscript in Bengali Bisakto Futo Chand by Malay Roy Choudhury.
18. One manuscript in English without any title.
19. A bundle containing manuscript in Bengali e.g. avisek, Satirious, who is then Chhabish Bachha, Shigra Andharer Dicke, Niash Din, North Bengal Express.
20. One old Corona (Baby) type writer machine bearing no. L3A 00912.
21. Eleven books with title as Janowar by Samir Roy Choudhury

    Description of lace where article seized was found.

    All the items were found in the room of accused Malay Roy Choudhury at first floor of his house.

    Name, father’s name, residence etc.

    Malay Roy Choudhury Son of Shri Ranjit Roy Choudhury of Dariapur Mahalla, P.S. Pirbahar Dist. Patna.”[৫৪]

পুলিশ হাংরি জেনারেশনের দশজনকে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করেছিল ছ’জনকে। আর মামলা দায়ের করল একজনের বিরুদ্ধে। মামলা দাঁড়াল স্টেট্ বনাম মলয় রায়চৌধুরী। যে রিপোর্টের ভিত্তিতে মলয়ের বিরুদ্ধে মামলা হল :

“Sec. BC/on 360 dt. 2.9.64 U/S 292 I.P.C. Reprot of enquiry made by the Inspector of Jorabagan Section, Calcutta Police, on the 3rd day of May, 1965 Name of Parties :

State

VS

Malay Roy Choudhury

Son of Ranjit roy Choudhury of Dariapur

Mohalla, P.S. Pirbahar Dist. Patna.

Nature of the complaint and dated of institution :

In August 1964 a printed booklet entitled Hungry Generation, Published by Samir Roy Choudhury was found on circulation in Calcutta. The poetry captioned 'prachanda Baidyutik Chutar' by Malay roy Choudhury was found obscene and director of Public Prosecution West Bengal being consulted observed that book was actionable U/s 392 I.P.C. and suggested prosecution of Malay Roy Choudhury with printer and publisher.

Accordingly Jorabagan P.S. Case No. 360 dated 2.9.64 U/S 120 B/292 I.P.C. was instituted and Saileswar Ghose and Subhas Ghose contributed to the book were arrested at Patna on 4.9.64, and on search of his house more copies of the poem in question and a copy of the booklet were found and seized. Then Samir Roy Choudhury named publisher and few other contributors namely Debi Roy @ Haradhan Dhara and Pradip Choudhury were also arrested in connection with this case. Samir Roy Choudhury disowned the publication and the printer could not be traced despite serious efforts. The opinion of the handwriting expert and oral testimony of the witnesses indicate that Malay was responsible for the production and circulation of his booklet containing an obscene poem composed by himself. **Evidence forthcoming do not establish direct responsibility of other persons**.

In view of the above circumstances, Malay Roy Choudhury who is on C.B. till today (3.5.65) may be proceeded against U/S 292 I.P.C.

Names of witnesses:

1. Tarak Kumar Sen of 48/A Sankar Halder Lane.
2. Samir Basu of 5/A Matilal Sil Lane.
3. Utpal Kumar Basu of 23 Royal Street.
4. Subhas Ghose of 16 A Shyama Charan Mukherjee Street.
5. Saileswar Ghose of 16 B Shyama Charan Mukherjee Street.
6. Pabitra Ballav of 28/A Pailk Para Row.
7. Prodip Choudhury of Kulai Tripura.
8. Sakti Chatterjee of Adhar Chandra Lane.
9. Sandipan Chatterjee of 18 Sarada Chatterjee Lane Howrah.
10. Shri Pasupati Banerjee, Handwriting Expert Anderson House.
11. S.I. S.M. Barui D.D.
12. S.I. Amala Mukherjee D.D.
13. S.I. K.K.Das of D.D. (I.O.)
14. Sri Brojendra Prosad Sharma.
15. Shri Ramnath Prosad.

16. Shri Krishno Kumar Sinha of Pirbahar P.S. Patna and others.

Whether the accused (if arrested) has been forwarded in custody or has been released on his bound and if so with or without sureties. Accused on Court bail till today i.e. 3.5.65.

sd/- K.K. Das — sd/- A. Choudhury

S.I.D.D. — Inspector of Police

O/C Sec. B

3.5.65"[৫৫]

পুলিশের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সরাসরি অভিযুক্ত হলেন কেবলমাত্র মলয় রায়চৌধুরী। আন্দাজ করা যায় পুলিশের চোখ চিনতে চাইছিল এই আন্দোলনের মূল মস্তিষ্ককে। সর্বোপরি এই পদ্ধতি ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালি আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভেদ ঘটানোর আবহমান অস্ত্র। তাই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চরিত্র পাওয়া চেষ্টা থাকলেও পুলিশ লক্ষ্য হিসেবে একজনকেই বেছে নিল। পাশাপাশি এও সত্যি বিদ্রোহের ইস্তেহার লেখা কয়েকজন কবি ততক্ষণে 'আমরা হাংরি জেনারেশনের কেউ নই' এইরকম স্বীকারোক্তিও দিয়ে দিয়েছেন পুলিশের কাছে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় দিশাহারা করে দেওয়া গেছিল বিদ্রোহীদের। জিজ্ঞাসাবাদের মারপ্যাঁচে বের করে আনা গিয়েছিল এই আন্দোলনের পক্ষে অসঙ্গতিপূর্ণ কয়েকটি জবানবন্দী। গ্রেফতার হওয়া সঙ্গীদের মধ্যে দেবী রায় ব্যতিক্রম, কোন জবানবন্দী তিনি দেন নি কিংবা তাঁকে দিতে হয় নি। প্রথমেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জবানবন্দী।

> "My name is Sakti Chatterjee. I am aged about 31 years. I am B.A. and also a writer. I am also a casual translator of U.S.I.S. It is a fact that this literary movement was started by me with some other friends. I severed every connection with the organisation realising that they had diverted from the original idea. I have seen one booklet entitled Hungry Generation in which my name has been used as publisher of the book. I had no relationship with so called Hungry Generation and this book was not published by me. I know Malay Roy Choudhury and his elder brother Samir Roy Choudhury, Subhas Ghosh, Saileswar Ghosh, Pradip Choudhury, Utpal Bose, I know the handwriting of Malay Roy Choudhury, I do not know from where this publication were printed and who financed it.

According to my estimation the writing of Malay manifested mental pervertion and language is vulgar.

I also saw a copy of the booklet and strongly condemned the poem captioned 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' written by Malay (identifies the sized booklet)

Recorded by me, read over, explained and admitted to be correct.

Sd/-

S.I.D.D. 18.2.65 "[৫৬]

উৎপলকুমার বসু তার জবানবন্দীতে লিখেছেন :

"In 1964 during summer Malay come down to Calcutta from Patna and requested me to contribute article in the booklet which was contemplating to bring out. I contributed an article entitled 'কুসংস্কার', (identified the article in the booklet in question) I personally made over the manuscript to Malay. Thereafter I left Calcutta for Dalhouse andstayed there about 2 months. On my return to Calcutta I saw a copy of this booklet in the College St. Coffee House. Later I also received another copy by post.

According to my estimation the writings of Malay Roy Choudhury carry a sense of disgust and nonsense. I feel that their literary movement degenerated into depravity and I have disassociated myself from Hungry Generation."[৫৭]

উৎপলকুমার বসুর এই জবানবন্দী ৫.৪.৬৫ তারিখের। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় জবানবন্দী দিয়েছেন ১৫.৩.৬৫ তে। তিনি বলেছেন :

"The present Publication in question also came to my notice. As a poet myself I do not approve the theme or the language of the poem of Malay Ray Choudhury captioned 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' I have severed all connection with Hungry Generation."[৫৮]

উৎপল ও সন্দীপন দু'জনেই হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছেদের কথা ঘোষণা করলেন। সবাই সম্পর্ক ত্যাগের কথা বললেও ব্যতিক্রম প্রদীপ চৌধুরী। জবানবন্দী দিয়েছেন কিন্তু কাউকে অভিযুক্ত করেননি। প্রদীপ বলেছেন :

> "My name is Pradip Choudhury. I am appearing at M.A. (English) examination from Jadavpur University, this Year as a casual student. I came in contact with the publication known as Hungry Generation sometimes in 1963, while I was a student of Biswa Bharati University. I had contributed one of my poem entitled 'বাবা আমার বর্বরতা' in the said booklet. I also sent a poem entitled 'সাময়িকতা' to Debi Roy taking him as editor of the Magazine as was published in a previous issue of the H.G. Later on while the paper was running high controversy among public. I enquired Sakti Chatterjee about the motto of H.G. who was one of the editors. From the very beginning my outlook was philosophical. H.G.I. considered an aesthetic movement and accordingly I even placed it to the Philosophical Congress of Santi Niketan. About the booklet in question I have only to confess that in some day of April 1963 Saileswar Ghose came to Panthanivas where I used to reside and they told me that another booklet was going to be published under the patronage of Malay Ray Choudhury, Subhas Acharjee and others who contributed in the booklet in question. I myself also felt some interest as one of my poem was going to be published. Saileswar and Subhas who were trying to publish the said booklet even before my coming to Cacutta but in vain. They told me whether I could solve the matter. Accordingly I introduced them to Dhananjoy Samanta of Mahendra Press at 58 Kailash Bose Street whom I knew earlier as I published a booklet entitled 'সকাল' from them. Dhananjoy Samanta agreed on our proposal of printing 300 copies entitled H.G. a Bengali booklet and duly received the manuscript copy from us with advance payment. I saw the proof along with Saileswar and Subhas in the press. I cannot say who actually gave the cost of printing for those booklet. It is afact that I took delivery of those books from the press and kept at Panthanivas Hotel where I used to reside. In the evening of the date of delivery Saileswar and Subhas come to my hotel and we took some copies and went to Coffee House

where we distributed free of cost few copies to the members present over there. I sent a copy to Samir Ray Choudhury at his Chaibasa address forthwith. I left Calcutta in July 1964. I know the handwrinting of Malay Ray Choudhury.

Recorded by me, read over,
explained
and admitted to be
correct
Sd/-
S.I.D.D.31.3.65"[৫৯]

যে দুটি জবানবন্দী ঘিরে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক ও হাংরিদের বন্ধুত্ব ভেঙে যাওয়া সেই দুটি শৈলেশ্বরের এবং শুভাষের—

শৈলেশ্বর ঘোষ বলেছেন :

"One Debi Roy @ Haradhan Dhara asked me to contribute a poem in Hungry Generation Magazine in the last part of September, 1963 in Coffee House, College Street. After that I came to know most of the H.G. contributors as well as other writers also. I personally know Sandipan Bhattacharjee, Shamar Ganguly, Sunil Ganguly, Rabindra Datta, Basudeb Dasgupta, Prodip Choudhury, Utpal Basu. The April last one day I met Malay Ray Choudhury in the Coffee House and he requested me to give him some of my poems. From him I came to know that H.G. is going to published. A month ago I got a packet containing the copies of the same. I know Malay Ray Choudhury who is the creator of H.G. I contributed twice in poems in H.G. Malay sent me some leaflets and 2/3 Magazine but I got no instruction what to do with these papers. Usually those papers were in my room. Excepting this I know nothing of H.G. To write in obsence language is not my moto. I am residing at the above address with Subhash Ghose who is my relation on a monthly rent of Rs. 45.00 for the last 2 years. I am a school teacher of Bhupendra Smriti Vidyalaya Bhadrakali Hooghly from 1962 on a monthly salary of Rs. 210.00. After the resent issue of H.G. which was published without my knowledge and consent I cut myself off from the said organisation. **In future Neither I shall keep relation nor I shall contribute in the H.G.** I shall not write any obscene and that is my literary intention. The booklet in question was printed by Prodip Choudhury."[৬০]

সুভাষ বলেছেন :

> "I never liked to be acquainted with such type of Magazine which is in my opinion is bad and never thought that my article captioned 'হাঁসেদের প্রতি' would have been published in such Magazine. **I do not believe in the moto of hungry generation and have cut off every relation with it after publication of my article.** I have no such intention to write any obscene article which I had not before also."[৬১]

শৈলেশ্বর ও শুভাষের জবানবন্দীতে সাহসের অভাব ছিল, যা পরবর্তীকালে মলয়ের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মলয় আক্রমণ করেছেন, পাল্টা আক্রমণ করেছেন শৈলেশ্বর ও সুভাষও। উপনিবেশের প্রভুরা সেই কবে 'Divide and rule' এর রাস্তায় আমাদের শাসন করে গিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র সে সুযোগ ছাড়েনি। কে সত্যি বলছেন আর কে মিথ্যা এই তর্কে, কূটকাচালিতে আলোড়িত হয়েছে পরবর্তীকালের একাধিক লিটিল ম্যাগাজিনের পাতা। নিজের ভেতরকার সত্যিকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন যে কবি সাহিত্যিকেরা 'সত্য-মিথ্যার' লড়াই তাদেরই বিদীর্ণ করে ফেলেছে নির্মমভাবে।

২. সাহিত্য কৃতি

হাজার বছরের নষ্ট সমাজের যাবতীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ইশতেহার লিখে যাত্রা শুরু করেছিল যে সাহিত্যধারা প্রচলিত সাহিত্যের form এরও তা বিরোধিতা করবে সেটাই স্বাভাবিক। হাংরি লেখকরা সে কারণেই কবিতা, গল্প বা গদ্যের প্রকরণ বিন্যাসকে অমান্য করেছেন তাঁদের লেখায়। কবিতার ছন্দ, উপমা প্রভৃতি কারিগরী দিক যেমন অগ্রাহ্য করা হয়েছিল তেমনই ভেঙে ফেলা হয়েছিল গল্প-উপন্যাস লেখার প্রচলিত ছক। কিন্তু আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা মূলত যারা কবিতা লিখেছেন এবং যারা মূলত গদ্যকার তাদের ক্রমান্বয়ে হাজির করার চেষ্টা করব।

২. সাহিত্য

২.১. শৈলেশ্বর ঘোষ

ক্ষমতার নন্দনতত্ত্বে এতদিন ধরে যা সাহিত্য হিসেবে গণ্য ছিল না তাকেই যাঁরা সাহিত্য করে তুলেছিলেন, তাঁরা ক্ষুধার্ত সম্প্রদায় — হাংরি জেনারেশন। অবচেতনকে আঁকাড়া ভাষায় গল্প-কবিতায় তুলে নিয়ে এসে বলেছিলেন, এই অভিজ্ঞতাই আসলে সাহিত্য। —

> "বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই হাংরি আন্দোলন।"[৬২]

এই হাংরি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন শৈলেশ্বর ঘোষ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বগুড়া থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভাটপাড়ায় আসা শৈলেশ্বর কলকাতা-বালুরঘাট হয়ে শেষপর্যন্ত থাকতে শুরু করেন কলকাতার উল্টোডাঙা বস্তিতে। সেখানেই বন্ধু সুভাষ ঘোষের সঙ্গে মিলে শুরু করেন হাংরি আন্দোলনের প্রস্তুতির কাজ। শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সূত্র পাওয়া যায় শচীন্দ্র ভৌমিকের 'এষণা' পত্রিকায়। কবিতার নাম 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা'। ১৯৬৩ সালে এরই কিছু অংশ হাংরি জেনারেশনের লিফলেটে ছাপানো হয়েছিল। ১৯৬৩-তেই শচীন্দ্র ভৌমিক প্রকাশিত ১৫ নং হাংরি লিফলেটে বহু বিতর্কিত কবিতা 'তিন বিধবা' প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির লোকজন এই রচনাটিকে 'অশ্লীল' আখ্যা দেন। কলকাতার কয়েকটি গার্লস কলেজে বিরাট প্রতিবাদ হয় এই কবিতাটির বিরুদ্ধে। পুলিশ কবিকে কফি হাউস ও কবির বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে। ১৯৬২ সালে হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টা শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই কবিতা প্রকাশের পরে হাংরি জেনারেশন ত্যাগ করেন। গদ্যকার ও প্রাবন্ধিক অজিত রায়ের কথায়—

> "তিন বিধবা লিখে শৈলেশ্বরের বেশ হ্যাপা হয়েছিল। তাকে তলব জানিয়েছিল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। শৈলেশ্বর হাজিরা না দিলে গোয়েন্দা অফিসার কে.কে. সেনগুপ্ত খোদ কফি হাউসে গিয়ে শৈলেশ্বরকে জানান, যে তার বিরুদ্ধে

> গার্লস কলেজের মেয়েদের নালিশ রয়েছে। 'শুধরে যাও বাচ্চা, নাহলে উচিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' যদি নিরপেক্ষ ভাবে স্বীকার করি, বলতে বাধা নেই, সেই ছিল হাংরি জেনারেশন নিয়ে পুলিশের প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ।"[৬৩]

১৯৭৪ সালে শৈলেশ্বর ঘোষের কাব্যগ্রন্থ 'অপরাধীদের প্রতি' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ক্ষুধার্ত প্রকাশনী। ১৯৮০-তে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ 'দরজা খোলা নদী'। ১৯৮৫-তে কাব্যগ্রন্থ 'পূর্ণগ্রাস'।১৯৮৮-তে কাব্যগ্রন্থ 'উৎসব'। 'আমাদের এই বীজ খেত' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। 'কালু ফকিরের আজান' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। 'এত আলো আসে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। 'রাগপ্রধান গানগুলি' প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। এই কাব্যগ্রন্থগুলির তালিকায় অবশ্যই সবার প্রথমে শৈলেশ্বর ঘোষের প্রথম কবিতার বই 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'। ১৯৬৭-তে খালাসীটোলায় জীবনানন্দের জন্মদিন পালনের দিন যে কাব্যগ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতায় কি সন্ত্রাসের স্বর এবং ভালোবাসার স্বর মিলে যায় ?

> "অনেকেই কবিতা লেখেন, বেশির ভাগ কল্পনাকে ব্যবহার করেন, কবিত্বময় শব্দ দিয়ে এক চমৎকার বাগান রচনার কাজে : খাঁটি কবিরা ভাষাকে ব্যবহার করেন যেন খোদাইয়ের যন্ত্র এবং তা দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে ভাস্করের মতো খোদাই করে তার এক শব্দময় প্রতিরূপ রচনা করেন। 'কেবলই নিজের ওপর ভর করে নিজের চারপাশকে আমূল খুঁড়ে' তোলেন শৈলেশ্বর ঘোষ : নিজের চারপাশকে শুধু নয়, নিজেকেও। কোনো সৎ কবিরই বাণী নেই আছে তাৎপর্যময় অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা খোদাই করে শৈলেশ্বর কবিতা লেখেন। সভ্যতার নোনা পলেস্তারা তুলে ফেলে তিনি কবিতায় দেখে নিতে চান মানুষী অভিজ্ঞতার শেষ সীমা।"৬৪

ছয়ের দশক থেকে শুরু করে নয়ের দশক পর্যন্ত শৈলেশ্বর ঘোষের কাব্যযাত্রা যেন তাঁর অভিজ্ঞতার ক্রমমুক্তির ইতিহাস। 'আমি কেবল নিজেকেই ব্যবহার করি'। এই ব্যবহারের যন্ত্রণাময় কাহিনি যেন হয়ে উঠেছে শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা। আপাদমস্তক নিজেকে ব্যবহার করেই কবি লিখছেন তাঁর জীবনের ওঠা-নামার কথা। ক্রমাগত নিজেকে ভাঙা আর মেলে ধরা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই এই কবির। তাই শৈলেশ্বরের কবিতায় 'আমিই বিষয় হয়ে যাই'।

অভিজ্ঞতার দিনপঞ্জী ঘাঁটতে ঘাঁটতে শৈলেশ্বর আবিষ্কার করেন যে তিনি আসলে অধঃপতিত ভারতবর্ষের সন্তান, অর্থহীন শূন্য পরিবেশের সন্তান। বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যের মধ্যে যার জন্ম, শোষণ, হত্যা ও ধর্ষণের মধ্যে যার বৃদ্ধি, তার কাছে অতীত মিথ্যা, ভবিষ্যত অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন। নতুন নতুন মৃত্যু শব্দ, ভীতি শব্দ তাই কবির হৃদয়কে বোবা করে রাখে, চেতনাকে সন্ত্রস্ত করে। কবি দেখতে পান হাজার হাজার বছরের ঝরঝরে মূল্যবোধগুলো জীবনের নতুন ধারনার পথে রক্তচক্ষু মেলে দাঁড়িয়ে আছে। তাই 'টার্মিনাস' পার হতে গিয়ে পথ ভুলে যান শৈলেশ্বর। যে রাস্তায় জীবনানন্দ দড়ি হাতে গিয়েছিল, সেখানেই হয়তো নিরর্থকতার বোধে নিঃসঙ্গতার আবেদনে হাজির হয়ে যান ক্ষুধার্ত প্রজন্মের অন্যতম কবি শৈলেশ্বর ঘোষ।

> "জীবনানন্দ থেকে একটি রেখা টানলে বিনয় মজুমদারকে ছুঁয়ে যে বিন্দুতে এসে থামে, সে শৈলেশ্বর ঘোষ।"[৬৫]

শৈলেশ্বরকে এভাবেই চিনতে চেয়েছেন ক্ষুধার্ত প্রজন্মের আরেক জন কবি অরুণেশ ঘোষ। সেইসঙ্গে হাংরি জেনারেশনের অন্যতম স্রষ্টা শৈলেশ্বর সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য,

> "বস্তুত হাংরি জেনারেশনের উত্থানের সময় বিশ্বব্যপী খবর যখন ছড়িয়ে পড়েছে তখন অনেকেই তৎপর ছিল নিজেকে হাংরি হিসেবে — খাঁটি ক্ষুধার্ত হিসেবে প্রমাণ করতে। আর তার পর?- তারপর হাংরি নামটি শুনলেই বাংলা সাহিত্যের কেষ্টবিষ্টু থেকে গোবেচারা পাঠক প্রত্যেকেই যখন আঁতকে ওঠে, তখন নিজের পশ্চাৎদ্দেশ থেকে কী করে হাংরি ছাপটি মুছে ফেলা যায়, তার চেষ্টা কিন্তু কেউ কম করেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম শৈলেশ্বর।"[৬৬]

প্রথম বই 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা 'মানুষের শেষ ধর্ম' কবিতা। আধুনিক মানুষের প্রাণহীন আত্মার জাগরণের জন্য এই কবি কবিতাকেই ব্যবহার করেছেন। ভণ্ড, মিথ্যাচারী দালাল, দূরভিসন্ধিমূলক প্রতারক এদের কোনো যোগ্যতা নেই শৈলেশ্বরের এই সব কবিতাকে উপলব্ধি করার। 'বৈদ্যুতিক ১৯৬৪' শিরোনামের কবিতায় শৈলেশ্বর বলেন 'একজনের মৃত্যু

আরেকজনের স্বাধীনতা বাড়িয়ে দেয়।' কখনও 'দশ পয়সার ম্যাজিক'-এ পর পর বিস্ফোরক ইমেজ সাজিয়ে দেন পাঠকের জন্য।

'জন্মনিয়ন্ত্রণ'-এর সাত বছর পর প্রকাশিত হয় 'অপরাধীদের প্রতি'। কবির নিজের মতে, —

> "সাত বছরে যে কোনো অনুভূতিশীল মানুষের মতো আমারও আভ্যন্তরীণ জগতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে — হওয়াটাই স্বাভাবিক আমার মনে হয়। যে অভিজ্ঞতাগুলির ওপরের চেহারাটা এতদিন আমি কবিতায় পর পর ইমেজের আকারে উপস্থিত করেছি — অপরাধীদের প্রতি সেই অভিজ্ঞতার আরও অন্তর-নির্যাস। আমি খুঁজে পেতে চেয়েছি, খুঁজে পেতে চেয়েছি আমার অস্তিত্বে তাদের তাৎপর্য — স্বভাবতই ভাষা ব্যবহার যেমন খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে, কবিতার অভিজ্ঞতাও হয়তো অন্যরকম মনে হতে পারে।"[৬৭]

শুধুই কি অন্ধকার স্মৃতি নাকি যে বাস্তবতার মধ্যে কবি আছেন তার অস্তিত্বকেও উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন শৈলেশ্বর ঘোষ আর তাই,

> আসুন আমরা আরেকটা পৃথিবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি— বাসোপযোগী মানুষ প্রাণহীন তাপদগ্ধ সৌরগ্রহে অবৈধ মুদ্রা ধরা অভিযানের মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে এবং ভালোবাসাহীন মানুষ কোনোকালে চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে পারবে না কেননা আমাদের এই পৃথিবীকে আমরাই প্রাণহীন তাপদগ্ধ সৌরগ্রহে পরিনত করেছি। আর যেহেতু আমাদের মঙ্গলগ্রহে কিংবা চাঁদে গিয়ে বসবাসের কোনো সম্ভাবনা নেই তাই শেষ পর্যন্ত জীবনের শেষে পড়ে থাকে দুটো মৃতদেহ এক হাতে রিভলবার ও তিনটে আওয়াজ। শৈলেশ্বর আহ্বান জানান, —
>
> "এসো রমণশীল মানুষ সূত্র ধরে খুঁজে যাও তোমার বংশানুক্রমিক"[৬৮]

'অপরাধীদের প্রতি' কবিতাটির প্রেক্ষাপট বলেছিলেন সাক্ষাৎকারে —

> "একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭০ বা '৭১ সনে। কোলকাতার কোনো এক জায়গায় দুটি যুবকের লাশ পাওয়া যায়। দুটি ফুলের মতো নিষ্পাপ যুবক নিহত হয়ে পড়ে মুখ থুবড়ে। বুঝতেই পারছেন কারা তারা। তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়

নি। শুধু একজনের পকেটে একটা ১৫ পয়সার বাস টিকিট ছাড়া — আমি টিকিটটাকেই ব্যবহার করেছি এবং ব্যবহারের ফলে যা হবার তা হয়েছে।"[৬৯]

যেহেতু ক্ষমতাই ভাষাকে নির্মাণ করে, যেভাবে পুরুষতন্ত্র নির্মাণ করে নারীকে, তাই রচনাকার যে ভাষায় কবিতা রচনা করেন তাও আসলে ক্ষমতারই ভাষা। এমনকি নিজের সঙ্গে আমরা কি ভাষায় কথা বলবো তারও মাপ ঠিক করে দেয় ক্ষমতা। ক্ষমতার ভাষা আমাদের অস্তিত্বের মৌলিক অবস্থানকে নিয়েও টানাটানি শুরু করে। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। আর তাই শৈলেশ্বর ঘোষ জীবনের গূঢ় অভিনয় ছেড়ে চলে যেতে পারেন যে কোনো সময়ে —

"কোনো শীতের রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে আমার যাওয়ার
সময় হবে পড়ে থাকবে কিছু আধপোড়া সিগারেট।
ছাই, ছেঁড়া জামা, অভুক্ত খাবার, ধূসর পাণ্ডুলিপি
ইস্ত্রিবিহীন পাজামা পড়ে নেবো মনে পড়বে সেই কথা
এ কোনো বিদায় নয়, কেবল অসমাপ্তের আত্মগোপন।"[৭০]

১৯৮১-তে প্রকাশিত হয় *দরজা খোলা নদী*। এই কাব্যগ্রন্থেরও প্রকাশক ক্ষুধার্ত প্রকাশনী। সংকলিত কবিতার মোট সংখ্যা ৬৫।

"দরজা খোলা এক নদীর মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমি
এ আমার আকাশ পথ — লতাগুল্মহীন, চিরকাল
জেগে আছে নক্ষত্রেরা — ঘুম থেকে জেগে উঠে
জঙ্গলের পশু আমার দিকে ক্রূর চোখে তাকায়
বিশ্বাসযোগ্য নই আমি, চূড়ান্ত ভালোবাসার পর
আমার স্বপ্ন হঠাৎ হারিয়ে যায়, কারও ফেলে
দেওয়া ফুল স্রোতে ভেসে গেছে, বসন্তকাল এলে
কেন যে আমরা লুকিয়ে দেখা করি, অন্ধকার
বেছে নিই, আমাদের নীরবতা দেখে সকলের সন্দেহ
কেন হয়?"[৭১]

ক্ষুধার্ত প্রজন্মের সঙ্গে যুক্ত আরেক কবি অরুণেশ ঘোষ *দরজা খোলা নদীর* শৈলেশ্বর ঘোষকে চিনেছেন এইভাবে — ১৯৭৪-এর *অপরাধীদের প্রতি* বেরোনোর পর প্রায় সাত বছরের নীরবতা যখন সবাই ধরেই নিয়েছিলেন যে শৈলেশ্বর আর লিখছেন না সেই সময় *দরজা খোলা নদী*-র নতুন কবিতাগুলি যেন জমাট পাথুরে হিমবাহ গলে গলে তৈরি হয়েছে। এক এক রাতে সাত থেকে দশটি কবিতাও লেখা হয়ে গেছে। দু'মাসের মধ্যে একশোটির মতো কবিতা। অথচ — "এই যে ভাষা, যে ভাষাকে নির্মাণ করতে যেকোনো একজন মাঝারি কবির হয়তো সারা জীবন লেগে যেতে পারে, "[৭২] যেমন,

> "সরস্বতী একদিন আমাকে ভালোবাসতে রাজী হয়েছিল-
> সরস্বতী, তার গাল সামান্য ভাঙা, বাবা মাকে সে
> ভয় পায় না আর, তারা ওকে খাঁচায় ভরে দিয়েছিল
> আমি সরস্বতীকে বুঝিয়েছিলাম বাবাদের কথা
> মেয়েদের সাথে তাদের কোণাকুনি ব্যবহার
> মাংশাসী তারা শ্রমের পরে দাবী করে আহার"[৭৩]

> "দরজা খোলা নদীর এই ভাষা আমাকে অভিভূত করে, যখন ঢুকে পড়ি এক-একটি কবিতার মধ্যে আমাকে হতবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাতেই হয় কবির দিকে মাটি থেকে মহাকাশের দিকে যার যাত্রা, এক নক্ষত্রলোক থেকে আরেক নক্ষত্রলোকে ভ্রাম্যমান আর সেকারণেই এই মুহূর্তে আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করা। কি ঘটছে আমার মধ্যে, দরজা খোলা নদীর অভ্যন্তরে একজন পাঠক হিসেবে ঢুকে যাওয়ার পর এমন কিছু ঘটনা নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে গভীরে যা আমি টের পাই অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারি না।"[৭৪]

দরজা খোলা নদী-র আবেগের তরলতা কিংবা ছিন্নভিন্ন শব্দ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে কবির বয়স আর অভিজ্ঞতা যেন বেড়েছে খুব দ্রুত। এই কবিতার বই আমাদের নিজস্ব ভূমি থেকে দূরের আকাশ কিংবা পাখী, ফুল, লতা, ভালোবাসা, নদী, সমুদ্র গোটা বইয়ের প্রায় সব কবিতায় যেন নেমে আসে জ্যান্ত হয়ে। ক্রমে ক্রমে যেন ময়লা পরিষ্কার করার দৈহিক পরিশ্রম

শ্রমসাধনায় শৈলেশ্বর হয়ে ওঠেন নির্ভীক। আমাদের নীরবতা দেখে সকলের সন্দেহ হয়, কেননা যে আগুন আমাদের বাঁচিয়ে রাখে দেহাতীরা মারা গেল শীতে সেই আগুনের অভাবে, এই বাঁচিয়ে রাখা আগুনের অভাব শৈলেশ্বরকে প্রতি মুহূর্তে তাড়িত করে। এক অর্থে বলা যায়, *জন্মনিয়ন্ত্রণ* থেকে যে কাব্যের ধারার শুরু, *অপরাধীদের প্রতি*-র পর তাতে একটি বড়সড় বাঁক দেখতে পাওয়া যায়। আর এই বাঁকটির নামই *দরজা খোলা নদী*। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় শৈলেশ্বর ঘোষের কাব্যগ্রন্থ *পূর্ণগ্রাস*। এটিরও প্রকাশক ক্ষুধার্ত প্রকাশনী। সংকলিত কবিতা ৬৫-টি। ১৯৬৪-তে *টাইম্‌স ম্যাগাজিন* কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "হোয়াট ইজ ইয়োর থিম?" তার উত্তরে শৈলেশ্বর বলেছিলেন, "মাই থিম ইজ মি"। একাধিক কবিতায় এই কবির উচ্চারণে যে 'আমি'র উপস্থিতি দেখা যায় তাই-ই যেন আস্তে আস্তে বিবর্তিত হয়ে ধরা দেয় এক কাব্যগ্রন্থ থেকে আরেক কাব্যগ্রন্থে। ছয়ের দশকে একদল যুবক, যাঁরা কবিতা লিখতে এসে যাবতীয় স্বীকৃত নন্দনতত্ত্বের বাইরে নিজেদের কবিতা অথবা শিল্পের ভাষা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, শৈলেশ্বর তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। আর তাই ১৯৮৮-র *উৎসব* কিংবা ১৯৯৮-এর *কালু ফকিরের আজান* শৈলেশ্বরের কাব্যযাত্রা যেন "আধুনিকতার শবদেহের ওপর উল্লাসময় নৃত্য"। শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতাকে কোনো একটি রেখা বা একটি মাত্রায় ধরে ফেলা সম্ভব নয়। তথাকথিত ছন্দের কোনো বৈভব তাঁর কবিতায় নেই। কখনো একটি পঙক্তি, কখনো বা দুটি, কখনো তিন, কখনো চার — দীর্ঘ কবিতার ভেতরে বেশিরভাগ সময়েই ঢুকে থাকে অসংখ্য ছোটো ছোটো কবিতা। কবিতায় কখনো 'আমি', কখনো 'আমরা' — এই দুটি সর্বনামের বহুল প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। আর যদি ছেদ-যতি চিহ্নের দিকে যাওয়া যায়, তাহলে '—' (ড্যাশ) প্রয়োগের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। অসম পঙক্তির ছোটো-বড়ো কবিতাগুলো মিলে যে বড়ো কবিতা — দীর্ঘ কবিতা শৈলেশ্বর ঘোষে লেখেন সেগুলোকে মাঝে মাঝেই এক-একটি উপন্যাস বলে মনে হতে পারে। সেই উপন্যাসের ভেতরে থাকে অনেকগুলো ছোটো ছোটো চরিত্র — কেউ খুনী, কেউ মাতাল, কেউ সাধু, কাপালিক, কেউ

সন্ন্যাসী, কেউ ফকির, কেউ শিকারী। যাঁরা তাঁর লেখা বা কবিতা পড়বেন, সেই সমস্ত অগণিত পাঠকদের জন্য শৈলেশ্বর লিখে যান —

> "আমি চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি না—আমি ভালোবেসে নিজেকে সমর্পণ করতে পারি না — আমি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বাজে, আমার কোনোই দাম নেই — কিছু থাকলেও তা আমি নষ্ট করেছি নষ্ট না করে উপায় নেই — কারণ আমি বুঝতে পেরেছি পৃথিবীতে নিঃস্বের স্বস্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে আমাকে — আমি যা করি তার কোনো অর্থ আছে কিনা আর ভাবি না, ভাবি না কারণ আমি যা করি তার সবই আমি করি না যা করা উচিত তা আমি সব করতে পারি না — এসব খুব অন্যায় — কিন্তু বিশ্বাস করুন এসব ভেবে ভেবে আমি আবিষ্কার করিনি এসব আমি বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি — পৃথিবী আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বলেছে — দণ্ড দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে, হবে"৭৫

ছয়ের দশকে যে কবিরা এই পৃথিবীর অভিশাপের দণ্ড নিজেদের কাঁধে নিয়ে মানুষকে নতুন কবিতা, নতুন ভাষার সঙ্গে পরিচয় করাতে চেয়েছিলেন, তার প্রতিনিধি হিসেবে শৈলেশ্বর ঘোষ তাই ক্ষুধার্ত প্রজন্মের সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম।

২.২ মলয় রায়চৌধুরী

কলকাতা শহর থেকে অনেক দূরে, পাটনায় বসে পাঁচের দশকের শেষ দিকে বাংলা কবিতার নতুন রাস্তা খুঁজছিলেন যে কবি, তিনি হাংরি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা এবং তত্ত্বনির্মাতা মলয় রায়চৌধুরী। পাঁচের দশকের শেষ দিকে একই সঙ্গে ইতিহাসের দর্শন এবং মার্ক্সবাদের উত্তরাধিকার নিয়ে কাজ করছিলেন এই কবি। প্রসঙ্গত তিনি জানিয়েছেন, হাংরি আন্দোলনের 'হাংরি' শব্দটি তিনি পেয়েছেন ইংরেজ কবি চসারের 'ইন দ্য শাওয়ার হাংরি টাইম' বাক্যটি থেকে —

> "১৯৬১ সনে আমার মনে হয়েছিল যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদী নেতারা যে সুখী, সমৃদ্ধ, উদার, কুসংস্কারমুক্ত উন্নত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা টকে গিয়ে পচতে শুরু করেছে উত্তর ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে।"[৭৬]

স্বাধীনতা পরবর্তী এই ছেঁড়াফাটা নিরাশার সময়ে তাই কবিতাকে খুঁজে নিতে হবে নতুন রাস্তা। যুক্তিবাদ ও রোমান্টিসিজম বাংলার শিল্প সাহিত্যকে রেখে গেছে এক খাঁ খাঁ প্রান্তরে। তাই সেইখান থেকে বাংলা কবিতাকে তুলে আনতে হবে নতুন কোন পরিসরে।

যে সময়ে বাংলা কবিতা তথা সাহিত্যের জগতে *কৃত্তিবাস*, *শতভিষা* প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথের পর পেরিয়ে এসেছে চারের দশক, পাঁচের দশক ধরে বিভিন্ন কবিদের কাব্যগ্রন্থের রাস্তা, সেও সময় মলয় রায়চৌধুরী খুঁজতে চাইলেন —

> "আমি কী? আমি কে? আমি কেন? আমি কেমন করে? আমি কোথায়?- এই সকল প্রশ্নের চোট ও বিস্ফোরণ ছাড়া কবিতার আর কিছু পড়ার নেই। অস্তিত্বের সমস্ত বিদকুটেপনাকে চিরে, তার অন্তরমহল দেখার নিদারুণ অপ্রতিহত চেষ্টা থেকে কবিতা। আমি প্রাণ, না, আমি বস্তুপিণ্ড, এ ভাবনায় মানুষের হৃৎপিণ্ড এখনও ছাঁৎ করে ওঠে। পৃথিবীর শীতল বিশ্বাসঘাতকতা থেকে যেহেতু পুনরায় গর্ভের গোলাপী উষ্ণতায় ফিরে যেতে চায় অসহায় ব্যক্তিমানুষ, কবিতা, হাংরি জেনারেশনের কবিতা ঐ অসহিষ্ণু প্রত্যাবর্তনের আপ্রাণ ব্যর্থ চেষ্টার অসহ্য অদম্য গোঙানি দিয়ে তৈরি। আমরা জানি, আর সেটা সকলকে বলেওছি যে আমিই আমার থিম।"[৭৭]

সংকটাপন্ন সময়ের সংকটাপন্ন অস্থির মানুষ। আর যেহেতু আমিই আমার থিম, তাই সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের ব্যর্থ চেষ্টার অসহ্য অদম্য গোঙানি দিয়েই প্রকাশিত হয় মলয় রায়চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *শয়তানের মুখ*, ১৯৬৩ সালে। এরপর একে একে *জখম* (১৯৬৫), *আমার অমীমাংসিত শুভা* (১৯৬৫), *তুলকালাম আত্মহত্যা* (১৯৬৫)। যদিও জীবনের প্রথম চারটি কবিতা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত *কৃত্তিবাস* পত্রিকায়, এমনকি *শয়তানের মুখ* এই প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনাও করেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথম কবিতা 'স্পর্ধা' রচিত হয়েছিল

১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৮। 'স্পর্শের প্রহরে শিল্প' লিখিত হয়েছিল ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৮। 'মৃত্যুমেধ' লিখিত হয়েছিল ১৪ মার্চ, ১৯৫৯ এবং 'প্রব্রজনিকা' সেই একই ১৯৫৯ সালে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি কবিতাই পরবর্তীতে *শয়তানের মুখ* কাব্যগ্রন্থে জায়গা পেয়েছে। —

> "কোনো কোনো রাতে চাঁদ বড় জোরে জ্বলে ওঠে, এত জোরে, যেন
> কাটআউট উড়ে যাবে। গেলে কাদের সুবিধা হবে
> আপনারা ভালো করে তা জানেন। তা স্বীকার করুন বা না করুন কারো ক্ষতি নেই।
> 'বাঞ্চোৎ তোমার এত তেল কেন?' এরকম প্রশ্ন ওঠে যদি
> উহুঁ চোখেতে আঙুল দিয়ে দেখাব না ওতে লাভ নেই তত
> শহরের এক কোণে, ভাড়া ঘরে, প্রতিদিন নিয়ে যাব ডেকে, সমারোহে;
> পোষাক-আশাক দূরে ছুঁড়ে দিয়ে ল্যাবিয়া ম্যাজোরাখানি টেনে
> চিরে বর্ত্মে ঢেলে দেব হৃদয় নামক গর্তে অধিগম্য চূড়া।"[৭৮]

এছাড়াও 'কবিতার প্রতি', কিংবা 'ধোলাই', 'মৃত্যুমেধ', 'অধঃপতন', 'একিলিসের গোড়ালিতে নিক্ষিপ্ত তীরের প্রতি' অথবা 'অমীমাংসিত আবাস' — প্রথম কাব্যগ্রন্থেই জানান দিয়ে দিয়েছিলেন এই কবি বাংলা কবিতার আবহমান শব্দ, ছবি অথবা ছন্দের রাস্তায় হেঁটে চলার পক্ষপাতী ইনি নন। ১৯৬৪-র অক্টোবরে লেখা প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার সেই সময়েই প্রকাশিত হয় হাংরি বুলেটিনে। প্রসঙ্গত এই কবিতাটিকে ঘিরে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন মলয় রায়চৌধুরী এবং এই সময়েই গোটা হাংরি আন্দোলনের উপর নেমে এসেছিল পুলিশি উৎপীড়ন। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হওয়া এই কবিতাটা সম্পর্কে মলয় রায়চৌধুরীর নিজের বক্তব্য, —

> "আমার নিরীক্ষার আগ্রহে অন্যান্য যে ব্যাপারগুলি এই পাঠকৃতিটি তৈরি করার সময়ে ছিল তার মধ্যে প্রধান দুটি হল দীর্ঘ কবিতার কাঠামোয় স্পিড বা গতি আনা এবং তাকে চিৎকার নির্ভর করা। এই দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা কবিতায় তার আগে বোধহয় পরেও বিশেষ কাজ হয়নি। উদ্দেশ্য ছিল পাঠ বস্তুটিকে ইলেকট্রিফায়িং করে

তোলা এবং পাঠককে তুমুল বৈদ্যুতিক প্রবাহে আটকে রাখা, যা থেকে সে ছাড়াবার চেষ্টা করবে কিন্তু পারবে না।”[৭৯]

কবিতা লেখার, কবিতার পড়ার যাবতীয় অভ্যাসকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে সপাটে সরিয়ে রেখে কবিতাকে জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করার জন্য তাই কি প্রয়োজন হয়েছিল এমন ভাষা, এমন কবিতার —

“শুভা, ওঃ শুভা,
তোমার সেলোফেন সতীচ্ছদের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখতে দাও আমায়
পুনরায় সবুজ তোষকের ওপর চলে এসো শুভা,
যেমন ক্যাথড রশ্মিকে তীক্ষ্ণধী চুম্বকের আঁচ মেরে তুলতে হয়
১৯৫৬ সালে সেই হেস্তনেস্তকারী চিঠি মনে পড়ছে
তখন ভাল্লুকের ছাল দিয়ে সাজানো হচ্ছিল তোমার ক্লিটোরিসের আশপাশ
পাঁজর নিকুচি করা ঝুড়ি তখন তোমার স্তনে নামছে
হুশাহুশহীন গাফিলতির বর্ত্মে স্ফীত হয়ে উঠছে নির্বোধ আত্মীয়তা
আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আঃ
মরে যাব কিনা বুঝতে পারছি না
তুলকালাম হয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরকার সমগ্র অসহায়তায়
সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিয়ে যাব
শিল্পের জন্য সক্কোলকে ভেঙে খান খান করে দেব
কবিতার জন্য আত্মহত্যা ছাড়া স্বাভাবিকতা নেই”[৮০]

জীবনদেবতা, কিংবা বনলতা সেনের রূপ ভাবতে অভ্যস্ত বাংলা কবিতার দুনিয়া এই চিৎকার এবং শুভাকে আবিষ্কারের ভয়ঙ্কর গোঙানি সামলে উঠতে না উঠতেই ১৯৬৪-র ডিসেম্বরে আবার লেখা হয়েছিল ‘আমার অমীমাংসিত শুভা’। বৈদ্যুতিক ছুতারের সমস্ত শব্দ, বাক্য যেন কিছুটা শান্ত হয়ে শুভার সঙ্গে অভিমানের কথা, যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার কথা, কবিতার যৌনাঙ্গে হাত দেওয়ার কথা বলে উঠেছে আমার অমীমাংসিত শুভায়। হাংরি আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থার সময়েই মলয় রায়চৌধুরীর চতুর্থ বই প্রকাশিত হয়, নাম *জখম*

(১৯৬৫)। প্রায় একই সময় মলয় রায়চৌধুরীর হাংরি আন্দোলনের কাব্যদর্শন প্রকাশিত হয়, যে কাব্যদর্শনের শিরোনাম ছিল 'মৃত্যুমেধী শাস্ত্র'।—

> "চাঁদোয়ায় আগুন লাগিয়ে
> তার নীচে শুয়ে আকাশের উড়ন্ত নীল দেখছি এখন
> দুঃখে কষ্টর শুনানী মুলতুবি রেখে
> আমি আমার সমস্ত সন্দেহকে জেরা কোরে নিচ্ছি
> হাতের রেখার ওপর দিয়ে গ্রামোফোনের পিন চালিয়ে জেনে নিচ্ছি আমার ভবিষ্যত"[৮১]

হাংরি আন্দোলনের যৌথতা ভেঙে গেছে, পুলিশী গ্রেপ্তারির পর পারস্পরিক অভিযোগের ভিত্তিতে হাংরি আন্দোলনে তখন অবিশ্বাস ও সন্দেহ। মলয় রায়চৌধুরী অভিযুক্ত হয়েছেন, বাদবাকীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ হয়েছেন রাজসাক্ষী। সম্ভবত এই কারণেই *জখম*-এর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে মলয় রায়চৌধুরীর ক্লান্তি, হতাশা কিংবা শুনানী, জেরা প্রভৃতি শব্দ উঠে আসে বার বার। প্রসঙ্গত হাংরি আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৬১-র নভেম্বরে এবং মলয় রায়চৌধুরীর মতে যে আন্দোলন শেষ হয় ১৯৬৫-তে। ঐ বছরে হাংরি আন্দোলন সংক্রান্ত মামলায় নিম্ন আদালত তাঁকে সাজা দেয় এবং ১৯৬৭-তে উচ্চ আদালতের রায়ে তিনি মুক্তি পান। এক সময়ের বন্ধুদের তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকতায় আহত হয়ে বাংলা সাহিত্য থেকে প্রায় নির্বাসন নিয়ে নেন এই কবি। দীর্ঘ কয়েক দশক লেখালেখির দুনিয়া থেকে দূরে থাকার পর *কৌরব* পত্রিকায় আটের দশকে প্রথম তাঁর কয়েকটি প্রকাশিত হয় এবং এর পর আটের দশকের শেষ দিকে মহাদিগন্ত প্রকাশনা থেকে বেরোয় একে একে *কবিতা সংকলন, মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর,* । 'কবিতা পাক্ষিক' থেকে ১৯৯৫-এ প্রকাশিত হয় *চিৎকার সমগ্র*। 'কবিতীর্থ' প্রকাশ করে *ছত্রখান*। ১৯৯৬-এ 'কৌরব' থেকে প্রকাশিত হয় *যা লাগবে বলবেন*। ছয়ের দশকের প্রথমার্ধে যে চিৎকার বাংলা কবিতার দিক বদলের চেষ্টা করেছিল, সাময়িক অবসরের পর আবার আটের

দশকের শেষে সেই চিৎকারের অন্য রূপ নিয়ে বাংলা কবিতাকে প্রকাশ করতে আসেন মলয় রায়চৌধুরী। ১৯৮৭-র *মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর*-এর 'এ কেমন বৈরি' কবিতাটি যেন প্রমাণ বহন করছে বাংলা কবিতায় আবার কয়েক দশক পরে এই কবির ফিরে আসার কারণ —

"ভাবা যায় কোনো প্রতিপক্ষ নেই!
সব কটা আধমরা হয়ে আজ শুয়ে আছে জুতার তলায়?
কিছুই করিনি আমি
কেবল মুখেতে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করেছি থেকে থেকে হা-হা-হা হা-হা-হা হা-হা হা-হা
পিস্তল কোমরে বাঁধা তেমনই ছিল সঙ্গোপনে ক্ষুর বা ভোজালী বের করিনিকো
বোমাগুলো চুপচাপ শান্তিনিকেতনী ব্যাগে যেমন কে তেমন পড়ে আছে
আমি তো আঁটঘাট বেঁধে ভেবেছি বদলা নেব, নিকেশ করবো একে একে
সকলেই এতো ভীতু জানতে পারিনি
একা কেউ যুঝতে পারে না বলে দল বেধে ঘিরে ধরেছিল
এখন ময়দান ফাঁকা
তাবৎ মস্তান আজ গরুর চামড়ায় তৈরি জুতোর তলায়
কিংবা পালিয়েছে পাড়া ছেড়ে কোনো জ্ঞাতির খামারে
আমি তো বিধর্মী যুবা এদের পাড়ার কেউ নই জানালার খড়খড়ি তুলে তবু যুবতীরা
আমার ভুরুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে
ছ্যাঃ এরকম জয় চাইনি কখনো
এর চেয়ে সামনে শিখণ্ডী রেখে জেতা ছিল ভালো"[৮২]

হাংরি জেনারেশনের কাব্য দর্শনে সাড়ে তিন দশক আগে যে কবি বেঁচে থাকার কার্যকারণ আবিষ্কার করতে চাইছিলেন কবিতায়, দীর্ঘ নির্বাসনের পর কবিতার জগতে ফিরে এসে যেন বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বের করতে চাইলেন ক্ষুধার জঠর অন্ধকার থেকে। নিজের সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বিশেষত দাঙ্গা ও দেশভাগের পর উত্তর-ঔপনিবেশিক পশ্চিমবাংলায় উনিশ শতকীয় মূল্যবোধের ধ্বংস হয়ে যাওয়া পরিবেশকে ইঙ্গিত

করেছেন মলয় রায়চৌধুরী। এই কবি বিশ্বাস করেন শেষ বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুনিয়ায় এবং দেশভাগের পরবর্তীকালে বাঙালির যে হালচাল, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি তাতে সেরকম মডার্নাইজড, স্পেশ্যালাইজড ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সার, বীজ সব পচে হেজে নষ্ট হয়ে গেছে। আধুনিকতা ব্যাপারটাই এখন একখানি ধ্রূপদী জোচ্চোর — কবিতায় বলেছেন মলয়। আর সে কারণেই কবিতা সম্পর্কিত যে কোনো বিদ্যায়তনিক প্রথা ও অবয়বকে ভেঙে চুরে এগিয়ে যেতে চায় মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা।

২.৩. ফাল্গুনী রায়

১৯৪৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত — মাত্র ৩৬ বছরের কবি-জীবন যাঁর, ক্ষুধার্ত প্রজন্মের সেই 'জীবনান্দের সন্তান' ফাল্গুনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নষ্ট আত্মার টেলিভিশন* প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। বাসুদেব দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত রাজলক্ষ্মী প্রেস, হাবড়া, ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত। এই কাব্যগ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছিল ১৪টি কবিতা। সাক্ষাৎকারে ফাল্গুনীর যমজ ভাই লক্ষ্মীকান্ত জানিয়েছেন ফাল্গুনীর নাম রাখা হয়েছিল নারায়ণচন্দ্র। পরে তাঁদের 'ইউনিভার্সাল' ছোড়দি ওঁর নাম রাখেন 'ফাল্গুনী'। ১৯৬৪-৬৫'র ভয়ঙ্কর অবস্থায় — যখন হাংরি জেনারেশনের মামলা চলছে কোর্টে — কেসের ডেট, অ্যাপিল, হেয়ারিং, সাক্ষী, ফরিয়াদী, সওয়াল-জবাব — এই সমস্ত মিলে ক্ষুধার্ত প্রজন্মের এক-এক জন লেখকের নাম তখন ধিকৃত, নিন্দিত। উপহাস, অবহেলা, উপেক্ষা, অপমান, কটূক্তির কালো পালক নিয়ে যাঁরা প্রায় 'আন্ডারগ্রাউন্ড' জীবন কাটাচ্ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে কয়েকজনের উৎসাহে গোপনে বহরমপুর থেকে ছাপিয়ে আনা এবং তারপর কলকাতা থেকে প্রকাশ হয়েছিল 'জেব্রা-১'—

> "জেব্রা প্রথম বার হবার পর, একদিন, তখন বিকেল, ফাল্গুনী এসে হাজির আমার আস্তানায়। যেহেতু যোগাযোগের ঠিকানা ঐ। আস্তানা বলতে ১০ বাই ১০ চৌকো ঘর, দোকান বাইরের দিকে বলে, প্রবেশ প্রস্থানের সুবিধা ছিল বাধাহীন — যা ছিল আমার জ্যাঠামশায়ের। রাতের আশ্রয় ব্যতীত অন্য সব দরকারী — অপ্রয়োজনীয়

> সারতে হত বাইরে। ফাল্গুনী ১৯, শীর্ণ, মাঝখানে সিঁথি কাটা ঘন কেশ, ভাঙা গাল, গাল জুড়ে ঘন শ্মশ্রু, উপচে বেরনো কণ্ঠা, কোর্স ধুতি এবং গলাবন্ধ লম্বা কালো মিস-ফিট গরম কোট। কোটটি, নিঃসন্দেহে ফাল্গুনীর নিজস্ব নয়, অন্তত কোটটির ঝুল ও ব্রেস্ট সাইজ দেখে তর্ক করার অবসর ছিল না। পুরনো এবং ব্যবহৃত, নিশ্চিত তার দাদার বা কারোর। প্রথম দর্শনে যা বিদ্ধ করেছিল, ভয়ঙ্কর, তা হল ফাল্গুনীর চক্ষুদ্বয়। বস্তুত তা ছিল আয়ত — উজ্জ্বল ও ভাষাময়, আমর্ম আবেগচঞ্চল করে তোলার মত প্রাণবন্ত, একগাদা স্বপ্নের প্রতিফলন। সবে সে প্রেম পেতে শুরু করেছিল, তারই ছটা ছিল মুখশ্রীতে, দৃষ্টিতে হাবভাবে, চালচলনে। পরবর্তীকালে, ফাল্গুনী দাড়ি বাদ দিয়েছিল, চুলের সিঁথি পরিবর্তিত হয়েছিল, আরও পরে, তার চোখের দৃষ্টিও হয়েছিল পোড়খাওয়া। প্রেম সাফল্য অর্জন করেনি, ব্যর্থতা ঘিরে ধরেছিল সাময়িক। সেই প্রেমিকা, গ্রহণ করেছিল এমন একজনকে — যার পটভূমি ছিল সুখী জীবন। অর্থাৎ আমৃত্যু নিরাপত্তা, প্রচুর অর্থ, স্বচ্ছলতা, বিলা, জীবন উপভোগের আরো, আরো অনেক উপকরণ ফাল্গুনীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না কোনোটাই, একমাত্র পূর্বপুরুষের আভিজাত্য বংশমর্যাদা ছাড়া।”[৮৩]

যশোরের নড়াইল থেকে বিখ্যাত জমিদার কালীশঙ্কর রায়ের সন্তান রাধাচরণ রায় যাঁরা কলকাতায় এসে সাজিয়েছিলেন তাঁদের জমিদারবাড়ি, যাঁদের পরবর্তী উত্তরপুরুষ এবং ফাল্গুনীর পূর্বপুরুষ রতন বাবুর নামে কলকাতার বিখ্যাত ‘রতন বাবু রোড’ এবং ‘রতন বাবু ঘাট’ এহেন জমিদার এবং আভিজাত্যপূর্ণ পরিবারের ঘেরাটোপ ছেড়ে ক্ষুধার্ত প্রজন্মের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ ঘটে ফাল্গুনী রায়ের। স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথা অবসানের কারণে ফাল্গুনীর প্রজন্মে তাঁদের পরিবার অকল্পনীয় দুর্দশায় আক্রান্ত হয় এবং ফাল্গুনীর চরিত্রে এর প্রভাব পড়ে। তাঁদের পারিবারিক ভাঙনই ফাল্গুনীর কবিতার ভাঙা আঙ্গিকে বারবার প্রতিফলিত হয়েছিল বলে মনে করেন তাঁর কবিতার আলোচকরা। ফাল্গুনীর চোখে মুখেও একসময় ছিল একরাশ স্বপ্নের প্রতিফলন যা ছয়ের দশকের উন্মত্ত ঢেউয়ে ভেঙেচুরে এক এক রকম কবিতার রূপ নিয়েছিল বলে অনুমান করেছেন কেউ কেউ। ক্ষুধার্ত প্রজন্মের এক-এক জন কবি যখন বিভিন্নভাবে নিজেদের কবিতার রাস্তাকে খুঁজে নিতে চাইছেন — কেউ বা যৌনতার মুক্তির কথা

কিংবা কেউ বা অন্য কোনো রাস্তায় নতুন ভাষা নির্মাণের মধ্য দিয়ে নিজেদের কাব্যশৈলী তৈরি করে নেওয়ার কথা ভাবছেন সেখানে ফাল্গুনী রায় কেবলই হতে চেয়েছেন ফাল্গুনী রায়।

> "আমায় পরমেশ চাটুজ্জে বলেছে : তুমি বড় জোর কফিহাউসের
> ইন্টালেক্চুয়াল হতে পারবে —
> আমায় বুলু ভট্চায বলেছে : তুমি রবীন্দ্রনাথও হতে পারবে না
> রঘু ডাকাতও হতে পারবে না। ...
> আমি তাদের বলেছি : আমি রবীন্দ্রনাথও হতে চাই না
> রঘু ডাকতও হতে চাই না —আমি ফাল্গুনী রায় হতে চাই—
> শুধু ফাল্গুনী রায়।"[৮৪]

নষ্ট আত্মার টেলিভিশন-এর পেছনের মলাটে লেখা ছিল —

> "জীবনানন্দ যে সব শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর চোখে দেখেছিলেন, যে সব শূকরীর চিৎকার কানে শুনেছিলেন, তাদের সন্ততিরা — সন্ততির সন্ততিরা আমার চারপাশে এখন চিৎকার করছে — আমি জানি না আমার কবিতা দিয়ে সেই সব চিৎকার থামানো যাবে কি না"৮৫

সময়ের অভিঘাতে নষ্ট হয়ে গেছে যে আত্মা সেই আত্মার যে টেলিভিশন সেই টেলিভিশনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফাল্গুনী রায় জীবনানন্দের পরবর্তী সময়ে মানুষের যাবতীয় যন্ত্রণা, জীবনের জটিলতার মুখোমুখি হয়ে আবিষ্কার করতে চাইছেন নিজের কবিতা। যে কবিতা ক্ষুধার্ত প্রজন্মের ইস্তেহার হয়ে দাঁড়িয়েছে পরবর্তী সময়ে।

> "ফ্রয়েড পড়বার অনেক আগেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম কাকে বলে অয়দিপাউস কমপ্লেক্স কিন্তু নিজের মার সঙ্গে করতে ভালো লাগে না আমার কিন্তু অনেক সময় মায়ের বয়সী মহিলার শরীরের স্বাদ নেবার প্রবণতা আমার থেকে গেছিল। কিশোর কালের দুরন্ত দুপুরে আমি আত্মহত্যা করবার জন্য একবার বেরিয়েছিলুম পথে কিন্তু পেটোর উপর্যুপরি শব্দে ফিরে আসি প্রাণভয়ে আমি দাস ক্যাপিটাল না-হিংসা ভালো

লাগে না আমার বিপ্লব ভালো লাগে জোতদার ও কৃষকের যুদ্ধময় ধানক্ষেতে আমিও খেয়েছি খুব ধান শীষের দুধ...”[৮৬]

যে প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুধার্ত প্রজন্মের লেখকরা নতুন সাহিত্য ভাষা তৈরি করবার চেষ্টা করছিলেন সেভাবেই বাংলা কবিতার এক সম্পূর্ণ নতুন বাঁকে দাঁড়িয়ে আছেন ফাল্গুনী রায়। যিনি নিজের মতো করেই তাঁর কবিতার ভাষা তৈরি করে নিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত কবি আসলে তাঁর লেখার প্রতি সৎ থাকবেন। কবির কবিতায় উঠে আসবে তাই যা আসলে তাঁর নিজস্ব যাপনের ভাষণ। ফাল্গুনী রায়ের কবিতায় তাই মিলে মিশে যায় তাঁর নিজের বোধ, অস্তিত্ব, তাঁর ক্ষয়ে যাওয়া জমিদারী আভিজাত্য ছেড়ে আসার ব্যথা এবং যে সময়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই সময়ের বিপ্লব অধ্যুষিত স্বপ্ন অথবা স্বপ্ন ভাঙার শব্দ। ফাল্গুনীর মৃত্যুর পর *আমি অপদার্থ* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে গ্রাফিত্তি থেকে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত লিখিত বিভিন্ন কবিতাগুলোকে সংগ্রহ করে এই অংশে মুদ্রিত করা হয়। এই সংকলনে পাওয়া যায় প্রায় ২৬ টি কবিতা। এছাড়াও হাওয়া-৪৯ কিংবা মনচাষা আলাদা করে প্রকাশ করেছেন ‘গুরুত্বপূর্ণ ফাল্গুনী রায় সংখ্যা’। সাহিত্যকে ক্ষমতার মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন এই কবি। ক্ষুধার্ত প্রজন্মের যাবতীয় ইস্তেহারগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে আসলে এতকাল পর্যন্ত কবিতায় যে সব শব্দ, যে সব প্রসঙ্গকে জায়গা দেওয়া হয়নি তাদেরকে যেন তুলে আনার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছিল এই সময়ের কবিদের। ফাল্গুনীও তার ব্যতিক্রম নন। তাই কবিতা লিখতে গিয়ে অনায়াসে এই কবি বলে উঠতে পারেন — “কবিতা হঠাও” কিংবা তাঁর কবিতায় রূপসী প্রেয়সীর কথা বলতে গিয়ে তাঁর কলমে চলে আসে দাদ-হাজা-চুলকানির কথা কিংবা দাদ-হাজা-চুলকানির কথা লিখতে গিয়ে তাঁর কলমে চলে আসে রূপসী কিংবা প্রেয়সীর কথা। কখনও কবিতার মধ্যে নাটকীয়তার সঞ্চার করে, কখনও ছোট ছোট কিছু ইমেজের দ্বারা কিংবা কখনও পূর্ণচ্ছেদ ছাড়াই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় একটিই বাক্যের মত রচনা করে যান ফাল্গুনী এবং ‘একজন অশিক্ষিত ও তিনজন হাংরি গদ্যকার’ – এই রচনাটি পড়লে বোঝা

যায় কিভাবে সুভাষ ঘোষ বা বাসুদেব দাসগুপ্তর আলোচনা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গদ্য এবং পদ্যের সীমারেখাকেই অতিক্রম করতে চাইছিলেন ফাল্গুনী নিজেই। ফাল্গুনীর নিজের মতে,

> "বাংলা ভাষায় যা লেখা হয় (অবশ্যই শেয়ার মার্কেট, বাজারদর, হেমন্ত, মহম্মদ রফির ফাংশন, উত্তম কুমারের হার্ট অ্যাটাক এগুলো বাদে) মানে সাহিত্য কবিতা-টবিতা ইত্যাদি, তা বাড়িতে লাইব্রেরিতে, পত্র-পত্রিকার স্টলে দাঁড়িয়ে পড়বার অভ্যাস রয়ে গেছে আমার — এসব পড়তে ফরতে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম একঘেয়ে মনোটোনাস মনে হচ্ছিল — ঠিক সে সময়ে আমি পর পর কয়েকটা বই পড়ি যেমন প্রদীপ চৌধুরীর 'চর্মরোগ', সুভাষ ঘোষের 'আমার চাবি', বাসুদেব দাসগুপ্তের 'রন্ধনশালা', মলয় রায়চৌধুরীর 'জখম', শৈলেশ্বর ঘোষের 'জন্মনিয়ন্ত্রণ', সুবিমল বসাকের 'ছাতামাথা' এইসব কবিতা ও গদ্যের বই ছাড়া কয়েকটি ম্যাগাজিনও পড়ে ফেলি, যেমন 'জেব্রা-১', 'জেব্রা হাংরি জেনারেশন-১', '৯৯', 'ক্ষুধার্ত খবর' ১ ও ২, 'ফুঃ' ১, ২, ৩, 'উন্মার্গ' ১, ২, ৩, 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ১, ২, ৩, 'ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ' ১ ও ২, 'ওয়েষ্ট পেপার' ১ ও ২, ইত্যাদি। এই সব ম্যাগাজিনে প্রাগুক্ত লেখক ছাড়া আরও কয়েকজনের লেখা ছিল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে সুবো আচার্য এই সব কবি-লেখকদের লেখা পড়বার পর আমার মধ্যে এক প্রকার জন্মান্তর ঘটে যায় অবশ্য প্রায়শই আমায় একপ্রকার অলৌকিক মৃত্যুর মধ্যে চলে যেতে হয় অর্থাৎ চেতনার মৃত্যু তার ফলে নবজন্ম ঘটে পুনরায় এবং আমি মানে আমার চেতনা প্রতিনিয়ত এই মৃত্যু প্রতীক চক্রে আবর্তিত হয়।"[৮৭]

আর এভাবেই ক্ষুধার্ত প্রজন্মের অন্যান্য লেখকদের লেখা ক্ষুধার্ত প্রজন্মের আবর্তে টেনে আনে তরুণ ফাল্গুনী রায়কে। 'আমার রাইফেল আমার বাইবেল', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চশমা', সাইট্রোনিক কবিতা, 'আমরাই রেনেসাঁ ও রেজারেকশন', 'কৃত্রিম শাপ', 'বিপ্লবের গান', 'কবিতা বুলেট', 'আমি এরকমই', 'প্রখর পাণ্ডুলিপি', 'ব্রেনগান', 'আমি আর আমার বেঁচে থাকা' ইত্যাদি পড়তে পড়তে মনে হয় আমাদের তথাকথিত সহাবস্থান ও শান্তির নীতি ফাল্গুনীর কবিতার সামনে ভেঙেচুরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। ফাল্গুনীর কবিতা ঠাণ্ডাঘরে বসে আয়েশ করে পাঠ করার নয়। সূচিতা ও শুদ্ধ কবিতার যে ধারণা আবহমান বাংলা সাহিত্যে চলেছিল পাঁচের দশক পর্যন্ত ফাল্গুনী রায়ের কবিতার ভাষা তাদেরকে ভেঙেচুরে তছনছ করে।

"দলীয় পতাকা ছাড়াই আমি বেঁচে আছি, মেয়েমানুষের ভালোবাসা ছাড়াই আমি বেঁচে আছি, সাড়ে বারোটার রোদ্দুরে রবীন্দ্রনাথের গান শোনার জন্য আমি বেঁচে আছি"[৮৮]

কিংবা —

"রাষ্ট্র কি সবকিছু দিতে পারে লাস্টবয়কে ফার্স্ট বয় করে দিতে পারে সাম্যবাদ, বাজে কবিকে ভালো কবি করে দিতে পারে সমাজতন্ত্র"৮৯

ফাল্গুনীর কবিতা যেন সুনামীর মতো আমাদের শান্ত সহাবস্থানময় চিন্তায় আছড়ে পরে। এইসব কবিতার ভাষা জ্বালাময়ী। যা একই সঙ্গে বাংলা কবিতার ইতিহাসে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যে ভাষা সুকোমল কবিদের কাছে 'স্ল্যাং' বলে ধিকৃত হয়, সেই ভাষাকেই সাবলীল ভাবে কবিতায় ব্যবহার করে ফেলেছেন ফাল্গুনী রায়।

"মা আমি আর তোমাদের অভিজাত সমাজের মাজাঘষা বাঁকা হাসি হাসতে পারব না। করুণাঘন ঈশ্বরের কেলানে কেষ্ট সাদা দাঁত নিয়ে শয়তানের মেধাবী চোখ নিয়ে আমি আর পারব না রামকৃষ্ণীয় ভঙ্গিতে স্ত্রীকে ব্যবহার করতে, মাতৃতান্ত্রিক প্রথায় চিনির বদলে স্যাকারিন খেয়ে ডায়াবেটিসকে ভয় করতে পারব না। আমি পারব না অসুখী লিঙ্গ নিয়ে প্রাক্তন প্রেমিকার গায়ে হলুদের দিন দেবদাস হতে খালাসীটোলায়।"[৯০]

একজন কবি জানেন যে এই সময়ের অসুস্থতা তাঁকেও গ্রাস করবে, তাঁর এই ব্যর্থতা যে কতটা অসহনীয় বা একজন কবিকে যেভাবে সমাজ প্রায় আউটকাস্ট করে দেবে তারই প্রকাশভঙ্গী যেন ফাল্গুনীর এক-একটি লাইনে। কিংবা —

"কোথায় শহীদ বেদি ভেঙে তৈরি হয়েছে শনির মন্দির
চল চল চল রে মন্দির ভেঙে ফের
তুলি গড়ে সর্বহারা বাহিনীর কেন্দ্র সামরিক"[৯১]

ফাল্গুনীর সময়ের বাস্তবতা যেভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর সামনে, তাও যেন হয়ে উঠেছে কখনও ফাল্গুনীর কবিতার বিষয়।

২.৪. অরুণেশ ঘোষ

ক্ষুধার্ত প্রজন্মের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি অরুণেশ ঘোষ। বাকি সমস্ত কবিদের রচনার দিকে তাকালে মূলত কলকাতা শহরকেন্দ্রিক তাঁদের অবস্থান চোখে পড়লেও অরুণেশ ঘোষের জন্ম ও বসতি কলকাতা শহর থেকে অনেক দূরে কুচবিহারের প্রত্যন্ত হাওয়ার গাড়ি গ্রামে। হাংরি আন্দোলন তৈরি হওয়া এবং তথাকথিত ভাবে ভেঙে যাওয়ার অনেক পরে ১৯৭৩-'৭৪ নাগাদ অরুণেশ ঘোষ হাংরিদের সংস্পর্শে আসেন। সেই সময় হাংরিদের কেউই প্রায় লিখছেন না। একমাত্র প্রদীপ চৌধুরী আগরতলা থেকে 'স্বকাল' নামে একটি কাগজ মাঝেমধ্যে বের করছেন। শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অরুণেশ এবং তারপর ১৯৭৪-এ 'ক্ষুধার্ত'-র তৃতীয় সংখ্যা বেরোয় মূলত শৈলেশ্বর, প্রদীপ ও অরুণেশ ঘোষের উদ্যোগে। নিজের জবানিতে হাংরিদের সংস্পর্শে এসে তিনি কি কি পেয়েছেন বলতে গিয়ে অরুণেশ ঘোষ 'আমার কবিতা যাত্রা'য় বলেছেন, —

> "১. একজন লেখকের প্রয়োজন প্রচণ্ড মানসিক ক্ষুধার। উদরপূর্তির মত সে যদি মানসিক উদর অর্থাৎ মনের পাকস্থলী ভরাতে না পারে তাহলে এই সময়কে নতুন সৃষ্টি দিতে পারবে না। খাদ্যের সন্ধানে তাকে সমাজের বাঁধা সড়ক ছেড়ে অন্য পথে যেতে হবে। নগর সভ্যতার জঙ্গল থেকে গ্রামীন সভ্যতার জঙ্গলে, আদিমতায়, আধুনিকতায় — সব জায়গা থেকে খাদ্য গ্রহণ করবেন।
>
> ২. পেটের দায়ে কোনো লেখক গণিকাবৃত্তি করতে পারে না। তার সৃষ্টি তথা শিল্পকে, জীবন ও ভাবনাকে বিক্রির একটা কাঁচা মালে পরিণত করতে পারে না। তাকে খুঁজে নিতে হবে নতুন পাঠক — যে পড়ে ও ভাবে। যে কবন্ধ নয়।
>
> ৩. এই যে আমরা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বলছি বা লিখছি — এর অর্থ কি, এ যে জড় ব্যবস্থার সঙ্গে জীবনের যুদ্ধ, অবদমনের সঙ্গে আত্মপ্রকাশের যুদ্ধ, বহমানের সঙ্গে বদ্ধতার, মুক্তির সঙ্গে রুদ্ধতার যুদ্ধ — সর্বোপরি ব্যবস্থা চায় মানুষকে স্বপ্নহীন করে এক আধুনিক দাসে পরিণত করতে — বিপ্লবী লেখক চায় তার মধ্যে স্বপ্নের বীজ বুনে দিতে — বিদ্রোহ করতে শেখে যেন সে।"[৯২]

এহেন অরুণেশ ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *শব ও সন্ন্যাসী* প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। তারপর ১৯৮৫-তে *গুহামানুষের গান*, ১৯৮৯-এ *সহজ সন্তান যারা*, ১৯৯৪-এ *দীর্ঘ নীরবতা*, ১৯৯৫-এ *মাতাল তরণী* যা আসলে র‍্যাবো-র কবিতার ভাবানুবাদ, ২০০০ সালে *কাল কবিরের দোঁহা*, ২০০৬ সালে কবিতীর্থ থেকে প্রকাশিত হয় *কবিতা সংগ্রহ-১*, ২০০৮-এ *পশুরাও অন্তর্লীন হাসে* ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কেন লেখেন কবি অরুণেশ ঘোষ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিজেরই স্মৃতির এক অভিজ্ঞতা তুলে এনেছেন এই কবি —

> "আপনি লেখেন কেন? অনেককাল আগে এই ক্লিশে প্রশ্নটি আমাকেও করা হয়েছিল। করেছিল যে সে আবার কোনো এক সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদকদের একজন। সময়টা প্রায় মধ্যরাত্রি, কাজের শেষে হাই তুলতে তুলতে ভেবেছিল, পাওয়া গেছে এক বোকা, গেঁয়ো, অর্ধশিক্ষিত লিখিয়েকে, কলকাতাইয়া স্টাইলে হাতের সুখ না হোক কথার সুখ ঝেড়ে নেওয়া যাক। সঙ্গে সঙ্গে চপেটাঘাত : আপনি চো-ে-ন কেন? না আমি তাকে ইংরেজিতে বলিনি, ইন্টারকোর্স করেন কেন? বরং খাঁটি ও পবিত্র বাংলা ভাষার 'চ' অক্ষর দিয়ে শুরু যে শব্দটি — তার চোখে চোখ রেখে তাই উচ্চারণ করেছি। সে একেবারে ভেঙে পড়ে। হতাশ। কি আর বলব আপনাকে, বলে অন্যদিকে তাকায়।"[৯৩]

অরুণেশ বিশ্বাস করেন, 'সৃষ্টি' শব্দটির সঙ্গে 'সঙ্গম' শব্দটি জড়িয়ে আছে নানা ভাবে। সঙ্গম না হলে সৃষ্টি হতে পারে না। একজন সৃষ্টিশীল লেখকের চেতনে অবচেতনে প্রতিনিয়ত তাঁর চিন্তা ভাবনা কল্পনা স্বপ্নের সহবাস চলে। মুহূর্তে মুহূর্তে সে সহবাস হয় আর মুহূর্তে মুহূর্তে তারা সন্তান প্রসবও করে। সেই সব সন্তানরাই কখনো কবিতায়, কখনো গদ্যে ভাষায় শব্দের রূপ নেয়। শিল্পী, ভাস্কর বা যেকোনো সৃষ্টিশীল মানুষের ক্ষেত্রেই এই অমোঘ সত্য। আর এই সত্যের উৎস এক সহজাত প্রেরণা। কোথা থেকে সৃষ্টিশীল মানুষ তা পায় সে নিজেই জানে না। হয়তো জানার প্রয়োজনও নেই তার। সেই রহস্যময় উৎস থেকে প্রবাহিত সেই প্রেরণাকে নতুন নতুন ভাষায় রূপ দেন স্রষ্টা। একেকজনের ভাষা ও শব্দ নির্বাচন একেকরকম হয় তার

জীবন ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। আর এর জন্যই অরুণেশের চোখে দুনিয়াটা কেমন অরুণেশের উত্তরে যার চোখে যেমন —

"নক্ষত্রের তলায় যেখানে এই
ভাঙাচোরা বাস আর লরির আস্তাবল
যেখানে মরচে পড়া লোহালক্করের
আবর্জনার মধ্যে আমাদের মদ ভাঙের আড্ডা
ফিশফিশানি মেয়েদের চাপা হাসি আর থুতু ছেটানো
দুই পা দুই দিকে ছড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাই তোলা
সেইখানে, ভাঙা গাড়ির আস্তাবলে
তোকে বয়ে নিয়ে এসেছে তোর মা
এযেন আমাদের ছোটো শহরের বেঁটেখাটো আর দাড়িওয়ালা
ঈশ্বরের সঠিক নির্দেশ : এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে
পালিয়ে না বেরিয়ে সোজা চলে আয় আমার এখানে।
এই ভাঙা গাড়ি, নেশুরে আর বেশ্যাদের আস্তানায়।"[৯৪]

শহর কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে কত দূরের এক অখ্যাত গ্রামে বসে কবি অরুণেশ ঘোষ যেন নিজের জীবনের বোধকে মিলিয়ে নেন বিশ্ব সাহিত্যের খিদের সঙ্গে। আর তাই, বেঁটেখাটো আর দাড়িওয়ালা ঈশ্বরের নির্দেশেই যেন অমোঘ ভাবে তার কবিতায় উঠে আসে 'বুড়ি বেশ্যার গান'। বাংলা কবিতায় অরুণেশের এই বেশ্যা বন্দনা এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। তার পাশাপাশি অরুণেশের এক-একটি গল্প যেন এক-একটি টুকরো টুকরো ছবি। যেমন 'এবাড়ির পাগল' কবিতাটির কথা, যেখানে খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে এক পাগল, তার ছেনাল বৌ আর তার লম্পট বন্ধু তার সামনেই দিয়েই ঢুকে যায় ঘরে। জ্ঞানপাপী সেই লম্পট বন্ধুর জবানীতেই লেখা একটি কবিতা —

"আরো একবার একই জায়গায় ফিরে আসতে হয়
সেইখানে, যেখানে বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে

এবাড়ির পাগল, দেখেই কল কল করে হেসে উঠবে
তার বউ, এদ্দিন পরে মনে পড়ল বন্ধুকে, কি যে
মানুষ আপনারা...”[৯৫]

দরজা বন্ধ করে স্বামীর বন্ধুর সাথে সঙ্গম করার পর দরজা খুলে বেরিয়ে আসে পাগলের বউ, চেয়ারে আন্ডারওয়্যার পড়ে বসে থাকে সেই লম্পট বন্ধু। কলতলায় সারা গায়ে সাবান মাখতে মাখতে হাসতে হাসতে বউটি বলে ওঠে —

“দ্যাখেন তো, ত্যানা ন্যাকড়া কিছু একটা পড়াতে পারেন কিনা বন্ধুকে
সব সময় ল্যাংটা, কি বিশ্রী, এর জন্য বাড়িতে
কেউই — কোনো লোকই আসতে চায় না”[৯৬]

অরুণেশের তীব্র স্যাটায়ারে পাঠক ধন্ধে পড়ে যান আসলে ল্যাংটা কে? আসলে পাগল কে? এমনই বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটে অরুণেশের কবিতায়। অরুণেশ ঘোষের কবিতার অন্যতম প্রেরণাকে যৌনতার সংজ্ঞায় ভাবতে চেয়েছেন একাধিক গবেষক। কারো কারো মতে অরুণেশের কবিতার মূল থিম যৌনতা নয়, বেশ্যাগমন, যেটি আসলে যৌনতার সবচেয়ে করুণ, নিষ্প্রাণ, অন্ধকার রূপ। যান্ত্রিক অলঙ্ঘ্য হাতে নোট গুঁজে দেওয়া বেশ্যাগমন। কেননা —

“পায়ের তলায় প্রতিটি সভ্যতার আবর্জনা, প্রতিটি হাহাকারের
ওরে শহর, ঘেয়ো ও উন্মাদ শহর, তোকেও দাঁড়িয়ে দেখে নিতে হবে
সন্ত্রস্ত আত্মার এই ঝাঁপিয়ে পড়া, দেওয়ালে হেলান দিয়ে
এগিয়ে দেওয়া শরীর
কোমরের ওপর তুলে নেওয়া সায়া এবং শাড়ি
দেখে নে এই শতাব্দীর বাকল ওঠা আর ভেঙে পড়া।”[৯৭]

ছয়ের দশকের শুরুতে যে ক্ষুধার্ত প্রজন্মের কবিতা যাত্রার শুরু, তাকেই যেন আরও এক দশক পরে পুনরুজ্জীবিত করেছেন অরুণেশ ঘোষ। ঘেয়ো ও উন্মাদ শহরের জীবন, তার প্রতিটি নগ্ন

অন্ধকূপ তাকে আবিষ্কার করতে করতে শব ও সন্ন্যাসের অন্ধকার যাত্রায় ভরে ওঠে অরুণেশের কবিতার মানচিত্র। কোনো কোনো আলোচকের মতে, অরুণেশ ঘোষের কবিতায় মুক্তি ঘটেছে যৌনতার। যৌনতা বিষয়ে এর আগে ক্ষুধার্ত প্রজন্মের একাধিক কবিদের অভিজ্ঞানের পরিচয় মিলবে শৈলেশ্বর ঘোষ অথবা মলয় রায়চৌধুরীর কবিতায় অথবা ফাল্গুনীর কবিতায়। অরুণেশও যেন যৌনতার আদিম আকাঙ্ক্ষার নবভাষ্য রচনা করেছেন তাঁর কবিতায় —

"তুই তো মাতাল হলি না টেনেই মদ
আমার যে হচ্ছে না নেশা — খাচ্ছি ঢক ঢক
তাকাও চোখের দিকে — কাঁধে রাখো হাত
এখনও আড়ষ্ট তুমি — এখনও আঘাত
আমাকে করোনি ভয়ে — দাও নাই টোকা
আমার অপেক্ষা দ্বারে — এমনই বোকা!
মিতুল সহসা ঝুঁকে এমন চুম্বন
সব দ্বিধা ঝরে গেলো — দুহাট অতল"[৯৮]

যৌনতার অমোঘ ক্রীড়া, মানব মনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা যে আদিম প্রবৃত্তি, তার মধ্যেই যেন আছে সৌন্দর্য ও কুৎসিত উভয়েরই প্রকাশ। অরুণেশের কাব্যে তাই যৌনতা খোলামেলা। কেননা কৈশোরবেলা থেকেই অরুণেশের বিশ্বাস, যৌনতা মানবজীবনের আদিম অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে এবং তা সত্যি। যে সত্যির অবদমন চলে না। তাই অনায়াসে প্রৌঢ় লেখকের সঙ্গে কিশোরীর যৌনতার ছবি আঁকেন নিপুণভাবে অরুণেশের কবিতা—

"এ রাত্রিতে প্রৌঢ় কবি আর সেই মেয়েটি
ডানা মেলে নীচে নামে — স্পর্শ করে মাটি
এই যে খুলেছি জ্যেঠু — শরীর, শরীর
জলে ও কাদায় চলো — চূড়ান্ত রতির
পাখিরা ওড়ার কালে সঙ্গম করে না
অনন্ত বৃক্ষের ডালে আমাদের বাসা !

কিংবা কোনো বাসা নেই — শূন্যে বা ধুলোয়
ক্লান্ত তো হচ্ছে না মানে — মিতুল শুধোয়
যৌবন কি ফিরে পেলে হতভাগ্য কবি?
একবার, দুইবার... হাঁপায় কিশোরী!
এই যে শরীর থেকে সরিয়ে শরীর
রেখে দিচ্ছি এক পাশে — সমুদ্রতো স্থির
কেটে গেছে মেঘ, বৃষ্টি — পূর্ণিমার চাঁদ
এখনও হয়নি তৃপ্ত — চায় আরবার!"[৯৯]

এই অপার যৌনতার ছবি নিয়ে লজ্জাহীন পবিত্রতার পথে হেঁটে যান তৃপ্ত অথবা অতৃপ্ত কবি অরুণেশ ঘোষ। যৌনতা সংকোচহীন এবং স্বাধীন বলেই অরুণেশের কবিতায় এই ছবি আঁকা সম্ভব। তবে শুধুই কি যৌনতা? উনিশ শতকীয় নবজাগরণ, রবীন্দ্রনাথ কিংবা '৩০-এর রবীন্দ্র-বিরোধিতা, জীবনানন্দ, পঞ্চাশের দশক, কৃত্তিবাস পেরিয়ে যে হাংরি জেনারেশনের হাত ধরে আসলে নতুন পথ খুঁজে নিচ্ছিল বাংলা কবিতা. আধুনিকতার প্রকরণে একাকী নিঃসঙ্গ মানুষের নতুন পথ খুঁজে নেওয়ার যাত্রায় অরুণেশ তাই লিখে ফেলেন —

"প্রতিটি মধ্যরাতে তোমাকে পেরোতে হয়
নরক ও নক্ষত্রলোকের নদী, কোথায় স্পষ্টতা? হেসে বাঁ হাতে সরিয়ে দাও সব হাঁ হাস্যকর
শুধু একটি আঙুলে স্পর্শ করো মাটি।"[১০০]

যে সময় আসলে অস্পষ্ট, যে সময়ে আসলে মধ্যরাতে নরক ও নক্ষত্রলোক পেরিয়ে যান কবি, সেই সময়ের অভিজ্ঞান তো এই শব্দমালাতেই হওয়ার কথা। হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কারণে উত্তরবঙ্গের অখ্যাত হাওয়ার গাড়ি গ্রাম যেন বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল একসময়। অরুণেশ দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছেন 'জিরাফ' পত্রিকা এবং একই সময় উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ি, মাথাভাঙা থেকে একঝাঁক বিদ্রোহী আত্মার তুলকালাম শব্দে আলোড়িত হয়েছিল বাংলা কবিতার মানচিত্র। মলয় রায়চৌধুরীর স্বীকৃতি অনুযায়ী—

১৯৬৫ সালের মে মাসের ৩ তারিখে হাংরি আন্দোলন প্রকৃত অর্থে ফুরিয়ে যায়। কেননা সেইদিন ব্যাংকশাল কোর্টে আমাকে যে চার্জশিট দেওয়া হয় তার সঙ্গে হাংরিদের দেওয়া জবানবন্দী মুচলেকাগুলো জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তারপরে আন্দোলনকে কিছুদিন হিঁচড়ে নিয়ে যান মলয়, কিছুদিন শৈলেশ্বর, কিছুদিন সুবিমল বসাক, তারপর অরুণেশ।

হাংরির চিতাভস্ম থেকে '৭০ দশকে ফিনিক্সের মতো যেন উঠে আসেন অরুণেশ ঘোষ। নকশাল আন্দোলনের পর কলকাতা থেকে বহু দূরে উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রাম ও গঞ্জের পাগল, বেশ্যা, মাতাল, নগ্ন কিশোর, দালাল, ধর্ষক, খুনী, অপরাধী, প্রসবঘর, ভাঁটিখানা, গ্রামীন রাজনীতি, দলতন্ত্র ইত্যাদির এক অনবদ্য সমাবেশ তাঁর কবিতায়। প্রথম পর্বের হাংরিদের রচনা থেকে সম্পূর্ণ অন্য মাত্রায় হাংরি আন্দোলনকারী হয়ে অরুণেশ ঘোষ তুলে আনেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জারিত জীবনযাত্রা। ব্যক্তিমানুষের প্রান্তিক অস্তিত্ব, কৌম জীবনের ব্রাত্য অন্ধকার দিকগুলি বারবার উঠে আসে অরুণেশ ঘোষের কবিতায়।

২.৫. প্রদীপ চৌধুরী

"চামড়ার নীচে জমে যাওয়া প্লিন্টারের মত আমাদের জীবন। –সীমা ও সময়— রবারে তৈরি সারা শরীরময় শিরা, মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া ভিটামিন বড়ি, শরীরের দুঃসাহসী বিবেচনাহীন উত্থান—রাত্রি শেষ হয়ে এভাবেই এগিয়ে আসে রক্তময় দিনের ইশারা। রক্ত-মাংস সবল করার যান্ত্রিক প্রবণতা জেগে ওঠে মনে—এবং এই অন্তর-যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হয় সামাজিক বোধ—শূন্য আকাশে কোটি শব্দে লেখা হয় দিনের প্রবেশ—মিছিল বেড়ে যায়, মিছিলের মানুষী ধাতু-পতন শুরু হয়—শুরু হয় নিজের কাছ থেকে নিজেরই পলায়ন..."[১০১]

জীবনকে এইভাবেই দেখতে চেয়েছিলেন হাংরি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক প্রদীপ চৌধুরী। বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে প্রথমে কলকাতা এবং তারপর ত্রিপুরায় বসবাস করতে শুরু করেন এই কবি। পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তু প্রদীপের পিতা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনকেই নিজের ছেলের লেখাপড়ার উপযুক্ত জায়গা মনে করেছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে পা দেওয়ার আগেই প্রদীপের আসল শিক্ষা হয়ে গেছিল—

"শান্তিনিকেতনের ছাত্রী, কলকাতার বড় ঘরের মেয়েদের প্রেমপত্র লেখা এবং তাদের ডেকে এনে এমন সব কবিতা শোনান, যা শুনলে রবীন্দ্রনাথ ভিমরি খেতেন।"[১০২]

হাংরি জেনারেশনের ওপর নেমে আসা প্রাতিষ্ঠানিক আক্রমণের সময়ে শান্তিনিকেতন থেকে বহিষ্কৃত হন প্রদীপ। শৈলেশ্বরের স্মৃতিতে,

"কুড়ি-একুশ বছরের রোগা যুবক, দাঁড়াবার সময় দু'পা যথেষ্ট ফাঁক করে দাঁড়ানো যার স্বভাব, চোখে সবসময় একটা অজানা আতঙ্কের ছাপ—নাম প্রদীপ চৌধুরী।"[১০৩]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি নিয়ে লেখাপড়া করা প্রদীপ ১৯৬৩-তেই নিজের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কবিতায়—

"কে তার পেশীর মাংস খাবলে ধরবে আমি ছাড়া কে ঐ দগদগে মূত্রাশয়ে
আঙ্গুল চালাতে গিয়ে ঘৃণা ও লজ্জার চেয়ে আরো দীর্ঘ অনাহার ও সাঙ্ঘাতিক
চরিত্রহীনতা
নষ্ট হও ! অপদার্থ স্ত্রীলোকের গলিত ছোকরারা, আমি বলছি নষ্ট কর নষ্ট
কর নষ্ট কর আগুন জ্বলছে না তাই বর্বরের শেষ ক্রোধ প্রথমতঃ তোমার চেয়ে
ঢের ভ্রষ্ট ঢের বেশি নরম
ও ঢের বেশি বর্জনীয় জননীর আর্দ্র চাতালে
একসঙ্গে জখম কর পৃথিবীর জঘন্য তিনটি ঋর্ণার ক্ষিপ্রতা
রক্ত বলাৎকার কর স্বীয় কিংবা বন্ধুদের পিতৃপরিচব (কত বড় উল্লেখ্য বিকারে পিতৃব্য
হত্যার জন্য অতিরিক্ত শ্রদ্ধা করা চলে) শিরাউপশিরাহীন বাবাধর্ম
নষ্ট কর দালান সভ্যতা, বুদ্ধি, সভ্যদের মুল সখ্যতাকে
তোমরা পতিত বাজে নির্বোধ ছোকরারা
এইমাত্র আমরা বিপণ্ণ কনসার্ট হ'ল নষ্ট করেছি
তোমরা নাগরিক ছোকরারা এবং আমি

এবং আমাদের চারকোটি বছরের পায়খানা অন্তমুলে রেখে

মা, শেষ দুষ্কৃতিকারী আমি তোর নীল মূত্রাশয়ে

বাবা, আমার বর্বরতা তোমার বর্বরতাকে ধর্ষণ করেছে !"[১০৪]

প্রদীপ চৌধুরীর প্রথম গ্রন্থ *অন্যান্য তৎপরতা ও আমি* ১৯৬৪ সালে ত্রিপুরার আগরতলা থেকে প্রকাশিত হয়। হাংরি জেনারেশনের অন্যান্য লেখকদের মতো প্রদীপও গদ্য, পদ্য, কবিতার সীমারেখাকে অস্বীকার করেছেন। তাই এই প্রথম গ্রন্থটিও এককথায় গদ্য ও কবিতার মিশ্রণ। কবিতা অংশে আছে ১১টি রচনা সমাজ, সভ্যতা, ইতিহাস, নগর ও প্রকৃতির টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে যেখানে এক তরুণ নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'শহর শহর' কবিতায় প্রদীপ লিখছেন—

"আমার ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছ

আমার মা

ওহঃ

অসহ্য

অসহা

ইতিহাসের পাতায় পাতায়

মানুষের

রক্ত

এবং

বুটের ঘা

ইতিহাস

আমাকে ফোঁপড়া করে দিয়েছে।"[১০৫]

হাংরি জেনারেশনের যে যূথবদ্ধ স্পিরিট কবিতার নতুন নতুন দিক চিহ্ন তৈরি করেছিল এইসময়, প্রদীপ চৌধুরীয় সেই পথেরই পথিক—

> "কবিতার আগ্রাসী সর্বগ্রাসী ক্ষমতাই আধুনিক মানুষের কাছে কবিতাকে এবং পরোক্ষভাবে কবিকে এতটা ভীতিকর করে তুলেছে...কবিতা জীবনকে জাস্টিফাই করে ব্যক্তিকে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার নির্দেশ দেয়...কবিতা আমাদের ক্ষয়িষ্ণু জীবনের এক প্রাণময় অবস্থা।"[১০৬]

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *৬৪ ভূতের খেয়া* প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে। ৩০টি কবিতার সংকলন এই কাব্যগ্রন্থে কলকাতা শহর, তার যান্ত্রিকতা, মানবিক সম্পর্কের অন্তসার শূন্যতা, প্রদীপের নিজস্ব আমির খোঁজ ছড়িয়ে পড়েছে—"এই শহরের শেষ মোমবাতিও আমার টেবিলে জ্বলে গেল

এই টেবিল থেকে লাফিয়ে পড়েই আমার
বিড়াল খুঁজবে তার ক্ষুধার্ত আত্মা
তার লালসা পিঙ্গল চোখ, নরম থাবা
দিয়ে সে আমার আন্ডারওয়ার
ছিঁড়েছে মানুষের বিবেকের মতো
লীন হয়ে গেছে আমার সঙ্গে
মানুষের মতোই সে আমাকে ব্যবহার করে
পাণ্ডুলিপি ছিন্নভিন্ন করে "১০৭

'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলনে 'শব্দ ও সত্য' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। ওই একই সংকলনে 'শব্দ ও গোপন সত্য (অথবা কনিংবেল যাদের আতঙ্কিত করে)' এই শীর্ষক একটি লেখায় কবি শঙ্খ ঘোষের আলোচনার প্রতি আক্রমণ লেখেন প্রদীপ চৌধুরী। প্রদীপের কথায়— "হাংরি জেনারেশন কোন সিস্টেমই আত্মস্ত করতে পারেনি এবং হাংরি জেনারেশনের লেখকদের মধ্যে কোন আদেশ নামাই কাজ করে না। তারা কোন রিক্রুমেন্টে বিশ্বাস করে না। তাই প্রতিষ্ঠান ভেঙে যাওয়ার ভয়ের বদলে প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দেওয়ার

কাজেই হাংরিরা বেশি উৎসাহী। ঘৃণা, ক্লান্তি, অপ্রাপ্তি কিংবা শূন্যতা নিয়ে নাগরিক কলকাতার আলোকোজ্বল রাস্তার মাঝখানে নিজেকে একা আবিষ্কার করেন এই কবি

"আমার কোন ভবিষ্যত নেই, প্ররোচনা ছাড়াই
আমি পার্কের রেলিঙের ভেতর ঢুকে পড়েছি
করিডর থেকে করিডরে আর শহরের কানাগলিতে
আমার এলোমেলো ২০ বছর এখানেই বেঁচে আছে।
তাদের সকলের বুক চিরে একটি পায়েচলা পথ
দিগন্তরেখা ও আঁতুর থেকে সোজাসুজি
এখানে এসে মিশেছে। রেলিঙের ভেতর আমি একা।"১০৮

প্রদীপ চৌধুরীর তৃতীয় কবিতা গ্রন্থ *কালো গর্ত* ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সংকলিত কবিতার সংখ্যা ৫২টি। প্রেম এবং উদ্দেশ্যহীন বিশৃঙ্খলার চিৎকার যেন প্রদীপ চৌধুরীর কবিতায় একধরনের বৈপরীত্য তৈরি করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংকলিত কবিতা অথবা কাব্যগ্রন্থ গুলোর দিকে তাকালে প্রদীপ চৌধুরীর কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস শেষ পর্যন্ত হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মূল ভাবাদর্শের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া পৃথক কোন নিজস্ব পরিসর গড়ে তুলতে পারেনি বলেই আমাদের মনে হয়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতে,

"চর্মরোগ গ্রন্থের মলাটে ওর দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ানো ছবিটা যেন স্বভাবের ইমেজ
ও সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।"[১০৯]

প্রদীপের কবিতায় যেন সভ্যতা শহর যৌনতার ভণ্ডামির বিরোধিতা এবং সশস্ত্র প্রতিরোধই মূল বিষয়। "জন্ম প্রসঙ্গে জন্ম জননী ও পিতা তার কাছে সমালোচ্য—বোধহয় হাংরি লেখকদের মধ্যে প্রদীপই এ-ব্যাপারে সবথেকে বেশি সতর্ক। এবং এই সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতা প্রকাশে প্রদীপ শব্দকে নিদারুণ আর্তিতে আলিঙ্গন করে বলে ওঠে :

আমি শব্দের ভেতর ফেটে যাই
শব্দের ভেতর গলিত আত্মা বিষাক্ত করে শহর

শব্দের ভিতর আমি বোবা হয়ে যাচ্ছি

শব্দের ভিতর আমি হোহো শব্দে দেখি

একটা মৃত বেড়াল প্রস্রাব থেকে স্বর্গের নিশান দুলিয়ে ওঠে...”[১১০]

প্রদীপ চৌধুরীর কবিতা সম্পর্কে এহেন মতামত বা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আমাদের মতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মতামতটি রেখেছে অমিতাভ দাসগুপ্ত —

> “লেখার রীতির দিক থেকে প্রদীপ সুভাষ ঘোষের কাছাকাছি, আত্মায় বাসুদেব-কে ছাপিয়ে তিনগুণ রোমান্টিক। দুর্ভাগ্যবশত এরই পাশাপাশি রয়েছে শস্তা চালবাজি থেকে কীর্তিমাৎ করার দুরারোগ্য অবশেস্ন। ভেতরটা পুরোপুরি পেঁকে না গেলে যেহেতু মোক্ষম লেখা হয় না — প্রায় কাছে ভিতে ছুঁই ছুঁই করেও তাই তার অস্তিত্বের টোটালিটিকে ভেজে তোলা অভিজ্ঞতার পর্যায়ে এখনো নিয়ে যেতে পারে নি। যেখানে অক্ষমতার ফাঁক, সেখানেই এলোমেলো হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি — আমাদের পড়তে পড়তে পচে যাওয়া চোখ অন্তত এটুকু বোঝে এবং এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র বিনয় দেখানো যা দয়ালু হওয়ার সদিচ্ছা নেই। আমার জ্বলে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে বলে বাথরুমে লাফালাফি আর্তনাদ তুলে পৃথিবীর সমবেত নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কী ছিঁড়তে পারি আমরা? আর এ সবের পাশাপাশি, না ভাই প্রদীপ, KAFKA কী বলেছেন, ভার্সিটি-তে অস্তিত্ববাদ পড়ানো হয় কিনা, রবীন্দ্র সংগীতের কী অর্থ, কেন বেদনাপ্রধান চিঠি আমার পকেটে লিখেছে শৈলেশ্বর ঘোষ, জীবনানন্দ তাঁর সুবিনয় মুস্তাফীর চেয়ে কমদামি, বিশ্বভারতী বিদ্যালয় থেকে কেন বিতাড়ন, সন্দীপন কী দেখল সন্দীপন কী জানে না সন্দীপন কী বলল, সুনীল কেমন লেখে, এসব জরুরি হয়তো তোমার কাছে প্রচুর জরুরি ইনফর্মেশনের কিস্যু পাঠক জানতে চায় না। জানতে চায় তুমি কী বলো, লেখো বা স্পষ্ট করে ভাবো। নিজেকে নিজের চারপাশ থেকে শেকড় সমেত উপড়ে না নিতে পারলে আর যাই হোক লেখা হয় না। কোনো প্রয়োজনে প্রদীপের ‘অন্যান্য তৎপরতা ও আমি’—র সর্বাঙ্গ লেপটে থাকে লীনা সুকুমার সুকুমার লীনা লীনা সুকুমার লেখক মানেই তো পুরো ব্যাটাছেলে। যে কারোও পরোয়া করে না যাকে সবাই পরোয়া করে। যষ্টিবিহীন হয়ে কেন হাঁটতে শিখল না এ যাবৎ প্রদীপ ? ওর লেখার মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ইলুমিনেশন আছে, স্পার্ক আছে মাঝে মাঝে অসম্ভব সত্যবাদী — কিন্তু প্রয়োজনীয় ঔদাসীন্য, নির্লিপ্ত বা যে জরুরি নিষ্ঠুরতা ছাড়া, মোহিতের ভাষায়, কোনো বৃক্ষ মাটির বুক

ভেঙে ওঠে না—সেই আল্‌টিমেট্‌ জিনিসেরই মর্মান্তিক অভাব। '....বার আত্মহত্যা' করা, ভারতের '৩,০০০০ কর্পোরেশনে চূড়ায় নিজের চেহারা লট্‌কে দেওয়া বা ১,০০০ পূর্বপুরুষকে চ্যালেঞ্চ' জানালেই নগ্ন আত্মমোচন হয় না। সমান নিরর্থ মনে হয় সারা বইয়ে ভালোবাসা মমতা ইত্যাদির জন্য হেদিয়ে মরে এ হেন লেখা, 'কোথায় ভালোবাসা ভালোবাসা বলে সময় নষ্ট করব—শান্তি নিকেতন ?"[১১১]

২.৬. বাসুদেব দাসগুপ্ত

১৯৬২ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত হন ক্ষুধার্ত প্রজন্মের আরেকজন উল্লেখযোগ্য গদ্যকার বাসুদেব দাসগুপ্ত। কলেজে পড়ার সময়ই ১৯৫৯ সালে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার'-এ বাসুদেবের প্রথম গল্প 'চোরাবালি' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৯৬৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'রন্ধনশালা' গল্পটি বের হয়। 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' এবং 'রন্ধনশালা' অনেকাংশেই হাংরি সাহিত্যের উৎস ভূমি তৈরি করেছিল। ১৯৬৪-তে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বাসুদেব দাসগুপ্তর গল্প 'রতনপুর'। ১৯৬৫-তে 'জেব্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'রিপুতাড়িত' নামে একটি গল্প। ১৯৬৭-র 'জেব্রা' পত্রিকায় 'অভিরামের চলাফেরা' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'লেনি ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে', ১৯৭১ সালে ক্ষুধার্ত পত্রিকায় 'দেবতাদের কয়েক মিনিট' গল্পটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালে 'নিষাদ' পত্রিকায় 'আনন্দবাজার গোয়েন্দা আর্তনাদ রিট্রিট' নামে প্রকাশিত হয় আরও একটি গল্প। ১৯৬৫-তে বাসুদেবের কয়েকটি গল্পকে একসঙ্গে করে *রন্ধনশালা* গল্পগ্রন্থটি প্রকাশ করেন উৎপল কুমার বসু। গ্রন্থাকারে *রন্ধনশালা* প্রকাশিত হওয়ার সময় প্রথম সংস্করণে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল চারটি গল্প, যথাক্রমে 'রন্ধনশালা', 'রতনপুর', 'বমনরহস্য', 'বসন্তউৎসব'। উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছিল, —

"আগুন জ্বালা রিংয়ের ভেতর দিয়ে খাঁচার বাঘ লাফিয়ে পড়লো আর আকাশ ফাটা করতালির শব্দ বাধা দিল না। কাউন্টারে আর বিক্রি হল না তিন আনা চার আনার টিকিট। খেলা শেষ হতে সামনের মাঠে ধান ছড়িয়ে সার্কাসের পাখিগুলোকে

খাওয়ালেন ম্যানেজারমশাই। খাওয়া শেষ হলে সার্কাসের পাখিগুলো ছুটি চায় তিন মাসের। ওরা ঘুরবে দশ সমুদ্র আর সাত মহাদেশ। ওদের পায়ে রুপোর মল ঝুমঝুমিয়ে ওঠে, আমারও ছুটি দরকার। আমারও মনে পড়ল আমাকে মায়ের জন্য কিনতে হবে আলতা, সিঁদুর আর মনোহারী ফিতে। আজ বুধবার, দূরের গাঁয়ে হাট বসেছে, খেলা দেখাবার লাঠিখানার বদলে বাঘের কাছ থেকে আমি লাল কম্বলের জামাখানা ধার করলুম। নতুন জামায় রং চং সেজে হাটে যাই, হাটের লোকেরা আমার জামা দেখে ভাবে, আমিই নাকি বাঘ।"[১১২]

হাংরি আন্দোলনের সূত্রে বাংলা সাহিত্যে বাসুদেব দাসগুপ্ত নামক বাঘের আবির্ভাব ঘটেছিল সন্দেহ নেই। আর তাই প্রথম গল্প 'রন্ধনশালা'ই যেন ক্ষুধার্ত প্রজন্মের যাবতীয় ক্ষুধা নিয়ে পাঠকের সামনে মোড়ক উন্মোচন করে। 'রন্ধনশালা' গল্পের শুরুতেই দেখা যায় একটা ভেড়ার বাচ্চাকে খপ করে ধরে দুই ক্ষুধার্ত বন্ধু তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে রান্নাও করে ফেলে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই মাংস খাওয়া হয় না। ভেড়ার বাতিল নাড়িভুড়ি, শিং, চামড়া ইত্যাদি খেতে শুরু করে তারা। শৈলেশ্বর ঘোষ এই গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, —

"ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ক্ষুধা এইভাবে তৃপ্তি খুঁজছে। সর্বগ্রাসী এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের আত্মার প্রতিটি কোষে আজ বিরাজ করছে। বাসুদেবের রন্ধনশালা গল্পে সেই সর্ব অস্তিত্বগ্রাসী ক্ষুধা এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ লেখা এককথায় আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল। শক্তির সেই হাংরি জেনারেশন বিষয়ক প্রস্তাবে ক্ষুধা সম্পর্কে অতি সীমিত যে ধারণা দেওয়া হয়েছিল, বাসুদেব এই লেখায় তাকে সুদূরপ্রসারী করে দেন।"[১১৩]

বস্তুত, হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুধার্ত প্রজন্মের এই ক্ষুধা নামক শব্দটিকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক কবি বা গদ্যকার তাদের লেখায় বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে আলোচকদের আলোচনাতেও ক্ষুধার বিভিন্ন মাত্রা তথা প্রসঙ্গ এসেছে। বাসুদেব দাসগুপ্ত স্বয়ং 'এখন এইরকম' পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন — "আমার ক্ষুধা ছিল মানুষের সার্বিক মুক্তির ক্ষুধা।" আর সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যেই 'রন্ধনশালা' গল্পটিও যেন বাংলা গল্পের যাবতীয় চিরাচরিত রাস্তা ছেড়ে মুক্তির পথে হাঁটে। পাঠককে দেয় নতুন আলোর

দিশা। দুটি চরিত্র কথক এবং রবীন, তারা পরস্পরের বন্ধু, রন্ধনশালায় আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যান। বিকট চেহারাওয়ালা পাখির কান্নার আবহে সমবেত অচেনা মানুষের আক্রমণে এই গল্প যেন কবিতার মতো আচ্ছন্ন করে দেয় পাঠককে।

এই বইয়ের দ্বিতীয় গল্প 'বমনরহস্য' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৩-তে। এ গল্পের পটভূমি বন্ধু সুকুমারের বিয়ের অনুষ্ঠান। অথচ বিয়েবাড়ির সামাজিকতা, লৌকিকতা, তথাকথিত সাজ-পোষাক, আড়ম্বর, সৌন্দর্যকেই যেন নগ্ন করে দেওয়ার গল্প এটি। বিয়ে এবং বিয়েকে কেন্দ্র করে তথাকথিত সামাজিকতার ভড়ং এই গল্পটি যেন প্রতিটি পোষাক-আশাক খুলে দেয় পাঠকের সামনে —

> "চোখ বন্ধ করতে চাই। চোখ বন্ধ হয় না। পায়ের নীচে রক্তে ভেজা পথ পিছল হয়ে ওঠে। পা পিছলে যায় বারবার। 'এইখানে হৈমন্তীর মাংস পাওয়া যায়' — একটা দোকানের সাইনবোর্ড। আঁৎকে তাকাই সেদিকে। চামড়া ছাড়ানো একটা নারীদেহ ঝুলছে। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে লাল দগদগে শরীর থেকে, লম্বা কালো চুল রক্তে ভিজে জট পাকিয়ে গেছে, নীল শিরাগুলি বুঝি শরীর ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়, তীব্র আর্তনাদ করে বসে পড়ি আমি। ডানদিকে আরও একটি দোকান। এইখানে সুকুমারের মাংস পাওয়া যায়। সামনে আরেকটা! 'এইখানে চম্পার মাংস পাওয়া যায়' আচ্ছন্নের মতো চোখ মেলে তাকাই, দড়িতে ঝুলতে থাকা ছাল ছাড়ানো মানুষগুলি এইবার আঙুল দিয়ে চোখের ওপর থেকে জমাটবাধা রক্ত মুছে নেয়।"[১১৪]

বিবাহের অনুষ্ঠান কি নিতান্তই মাংশাসী আয়োজন মাত্র? তাই এই অনুষ্ঠানের সামাজিকতাকে তীব্র নৈরাজ্যে আক্রমণ করেন বাসুদেব। জীবনভর ধরে খেয়ে যাওয়া যাবতীয় মাংসের টুকরো বমি হয়ে উগরে বের হয়ে আসে।

তৃতীয় গল্প 'রতনপুর' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। এযেন এক স্বপ্নপুরের গল্প। কবেকার কিশোরবেলার নববর্ষ উৎসব, কলেজস্ট্রিট, কফিহাউস মিলে মিশে একাকার। যেখানে দেখা যায় ছোটোবেলার প্রেমিকা রুমকি, রুমকির দিদি শেফালীদি, তার ছোটো বোন চুমকি, সবাই

এসে উপস্থিত। আরও গ্রামের বহু পরিচিত লোক। স্মৃতি, সৌন্দর্য, প্রেম সব যেন ফিরে ফিরে আসে। আসলেই কি রতনপুর কোনও জায়গা? না বাসুদেব দাসগুপ্তের স্মৃতি? যে সমস্ত আসলে ছয়ের দশকের এই ক্ষুধার্ত প্রজন্মের গদ্যকার হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, ফিরে পেতে চাইছিলেন এক ক্রমনৈরাশ্যমান অবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

চতুর্থ গল্প 'বসন্তউৎসব'। এটিও ১৯৬৪-তে লিখিত, ১৯৬৫-তে প্রকাশিত। 'বসন্তউৎসব' কিন্তু আসলে 'বসন্ত' বা 'উৎসব'-এর গল্প নয়। যে অসুস্থ সময়ের আখ্যান লিখে যাচ্ছিলেন ক্ষুধার্ত প্রজন্মের গদ্যকার সেই সময়েরই অস্থিরতা নিয়ে এই গল্পের নায়ক মণিকা ও শঙ্কর এই গল্পের কথা শোনায় আমাদের। যে সৌন্দর্যের জগৎ, উৎসবের জগৎ আমাদের নিয়ত হাতছানি দেয়, আমাদের আহ্বান জানায়, তার মাঝখানেই যে জমে থাকে আসলে কত কুৎসিত কদর্যতা। 'বসন্তউৎসব'-ও যেন সেই বিকার ও অসুস্থতার ভয়াবহ চিত্র।

রন্ধনশালায় সঙ্কলিত গল্পগুলি ছাড়াও ১৯৭২ সালে 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল 'ডক্টর ওয়াংয়ের গোপন সঙ্কেত' গল্পটি। ১৯৭৫-এ 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় বাসুদেব দাসগুপ্ত লেখেন 'বাবা' নামের একটি গল্প। ১৯৮৬ এবং ১৯৮৭-তে 'বিজ্ঞাপন পর্ব' পত্রিকায় তিনটি সংখ্যায় 'মৃত্যুগুহা থেকে' প্রথম কিস্তি, 'মৃত্যুগুহা থেকে' দ্বিতীয় কিস্তি ও 'মৃত্যুগুহা থেকে' তৃতীয় কিস্তি মুদ্রিত হয়। ১৯৮৬ সালে 'বর্ণপরিচয়' পত্রিকায় 'বন্দী বাস্তবতা আমার অলিখিত গদ্যের ছিন্ন রূপ' নামে ভিন্ন স্বাদের একটি গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালে 'প্রতীক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'শেষ প্রহরের অভিযান' গল্পটি। ১৯৯০ সালে 'এখন এইসময়' পত্রিকায় রচিত হয়েছিল 'এসো'। এরই মধ্যে 'দ্বন্দ্বশূক' পত্রিকার অষ্টম সংকলনে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় বাসুদেব দাসগুপ্তর উপন্যাস 'খেলাধূলা'।

বাসুদেব দাসগুপ্ত সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে আলোচকেরা বাসুদেব দাসগুপ্তের লেখন কালের মধ্যে দুটি স্তর বা দুটি ভাগ করতে চেয়েছেন। এক, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত — মাত্র ১৫-টি গল্প

তিনি লিখেছিলেন এবং তারপরে দীর্ঘ সময়ে প্রায় দশ বছর বাসুদেব দাসগুপ্তের কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি। ১৯৮৬ সালে 'বর্ণপরিচয়' পত্রিকায় দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে যখন বন্দী বাস্তবতা এবং অলিখিত গদ্যের ছিন্ন রূপ প্রকাশিত হচ্ছে, বাসুদেব দাসগুপ্ত তাতে লেখেন, — 'সুসময় আবার ফিরে পেয়েছে তার পুরানো নাম- বিপ্লবের দিন ফিরে এসেছে বইয়ের তাকে- সংবাদপত্রের প্রতি সহনশীল হয়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক মানুষ — এখন মেয়েরা আরও চিত্তাকর্ষক ভাবে কবরীবিন্যাস করুক।'

১৯৬৪-তে প্রকাশিত বাসুদেব দাসগুপ্তের 'দূরবীন'। যেন অমলের স্বপ্নপূরণের গল্প — হঠাৎই একদিন ওলটপালট হয়ে যায় সবকিছু। অমলের হাতে আসে আশ্চর্য এক যন্ত্র, দূরবীন। বন্ধু শোভনের কাছ থেকে ধার নেওয়া এই দূরবীন লাগিয়ে অমল যেন আশেপাশের পৃথিবীকে জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখে। খালাসিটোলায় বসে চোখে দূরবীন লাগিয়ে অমল দেখতে পায় কুয়াশার মধ্যে সরে সরে যায় বাড়িঘর, দোকানপাট, ল্যাম্পপোস্ট। অনেক দূরে সরে যায় শহর, আর তারই মাঝে জেগে থাকে তপতী। কিন্তু তপতী যখন দূরবীন দিয়ে দেখে তখন সে দেখতে পায় ভয়ানক। সে দেখতে পায় অমল একটি জানোয়ার হয়ে গেছে। গায়ে তার গজিয়েছে বড়ো বড়ো লোম, মাথায় গজিয়েছে শিং, দূরবীন যেন ভালোবাসার কাছে পৌঁছতে চাওয়ার আকুতি এবং না পৌঁছতে পারার যন্ত্রণার গল্প হয়ে দাঁড়ায়।

ষষ্ঠ গল্প 'রিপুতাড়িত' ১৯৬৫-তে প্রকাশিত হয়েছিল 'জেব্রা' পত্রিকায়। প্রসঙ্গত ক্ষুধার্ত প্রজন্মের একাধিক সাহিত্য সম্পর্কে যে যৌন আসক্তির অভিযোগ, লেখালেখির মধ্যে কেবলই মাত্র নারীদেহের প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকে, বাসুদেব দাসগুপ্তের এই গল্প যেন সেই সমস্ত অভিযোগকে নস্যাৎ করে। যে গল্প শুরুই হয় সুন্দরী, সুগায়িকা তরলার প্রতি লেখকের তীব্র আকর্ষণের ঘোষণার মধ্য দিয়ে। তরলাকে তার চাই। তরলাকে বড় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে তার সান্নিধ্য পেতে

পেতে গল্প কথক খুঁজে বেড়ান এ-গলি সে-গলি। কোথাও পেচ্ছাপ করার জায়গা পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত পার্কের ধারে গিয়ে ভারমুক্ত হন কথক —

> "এদিকে ফোঁটা ফোঁটা পেচ্ছাপে আমার জাঙ্গিয়া বেশ কিছুটা ভিজে উঠেছে। আমিও আর সাড়াশব্দ না দিয়ে প্যান্টের বোতাম খুলে ছড়ছড় করে পেচ্ছাপ করতে শুরু করি। শব্দ পেয়ে ছেলেটা চমকে তাকায়, দেখে আমাকে, তারপর মেয়েটাকে আবার কাছে টেনে নেয়।"[১১৬]

তরলা আর কথক নায়ক যখন প্রেম, রোম্যান্স ও শরীরের আকাঙ্ক্ষায় তুমুল আবেশে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল পাঠককে, তখনই নায়কের এই পেচ্ছাপ বেগ, যা আসলে রোম্যান্টিকতাক ভেঙে খান খান করে দেয়। প্রেমিকাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে নায়কের পেচ্ছাপের জায়গা খোঁজা এবং শেষটায় পার্কে অন্য প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের নাকের ডগায় পেচ্ছাপ করার ঘটনা প্রেম সম্পর্কিত যাবতীয় রোম্যান্টিক নির্মাণকে ভেঙে ফেলে। এহেন গল্প 'রিপুতাড়িত'। শুধু 'রিপুতাড়িত'ই নয়, ১৯৬৮-তে প্রকাশিত 'লেনি ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে' এই গল্পটির মধ্যেও যেন একই রকম ভাবে জন্মাবার পর থেকে রক্তবাহিত সমস্ত সংস্কার, মূল্যবোধ, যা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ভেঙে ফেলার অপরূপ ছক কষে ফেলেন বাসুদেব দাসগুপ্ত। 'লেনি ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে' গল্পটি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। যার প্রথম অধ্যায়টি ঘিরে থাকে লেখকের সকল আত্মীয়ের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক ছিন্ন করে বারো টাকায় পাইকপাড়ার এক বস্তিবাড়িতে জীবন যাপন, যেখানে ঘরের সামনেই খাটাল, যেখানে গোবরের দলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভনভনিয়ে ওঠে মাছির ঝাঁক, এমনকি মুখে ভাত তোলার সময়ও কখনো কখনো ঢুকে যায় মাছি। এমনই দিনে, এমনই জায়গায় কখনো কখনো পাশের দরমায় ঘেরা পাঠশালায় দুপুরবেলায় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে লেখক আবিষ্কার করেন পাঠশালের এই এক বেঞ্চে হরকিষণ তার কালো মোটা ধুমসী বৌটাকে —

"ঠেসে ফেলে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে সঙ্গমে রত — দেখে তৎক্ষণাৎ আমি খাটিয়া থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে যাই-দড়াম করে।... কমসে কম তিন ঘণ্টা আমার লিঙ্গে কোনো প্রকার সাড় থাকে না। নেতিয়ে পড়ে।"[১১৭]

আর এই বস্তি থেকে শুরু হয় জীবনের গল্প যা পৌঁছে যায় এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যেখানে আমরা পাই সুমিতা এবং সুমিতাদের বাড়ি। সুমিতার বাড়ি রুচিশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ি। সেই বাড়িতে গান শেখানোর সূত্রে প্রবেশাধিকার পান লেখক। প্রসঙ্গত সুমিতার ভাইয়ের সঙ্গেও তার ছিল বন্ধুত্ব। একদিন এরকমই গান শিখিয়ে ফিরে আসার সময় সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই লেখক বুঝতে পারেন আর সামলানো যাবে না —

"তখন কোনো কিছু আর ভাবার সময় নেই, মুহূর্তমাত্র, তারপরেই ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়ানো পার্থকে বলি,

পার্থ পাইখানায় যাব।"[১১৮]

থতমত খেয়ে গেলেও পার্থ বাথরুমে নিয়ে যেতে দেখে বাথরুম বন্ধ, রান্নাঘরের কল থেকে মগ ভর্তি করে জল দেয়, রান্নাঘরের সামনে বসে একটা বড় রুইমাছ কুটতে থাকা মাসিমা সেদিন খেয়ে যাবার অনুরোধের কোনো জবাব না দিয়েই সোজা পায়খানায় ঢুকে যায় লেখক —

"পাদানিতে পা দিয়ে বসতে না বসতেই ছড়ছড় করে স্বশব্দে তরল নোংরা পদার্থ সব বেরুতে শুরু করে, কতদিন জমেছিল পেটে কে জানে। আমার তলপেটে চিলচিনে ব্থা হয়...আর থেকে...।

'অ্যাই দাদা কী হচ্ছে ? সুস্থমতো স্থান করতে দিবি না ?...

-পোঁউক-পোঁ-ও-ও-ও ফর্—র-র্-র্ ফট্— র-র্

-আঃ, বললাম অতগুলো মাংস খাস না, খাস না...

একী, এ যে সুমিতার গলা...। ভয়ে লজ্জায় কাঁটা আমি কী করব কিছু বুঝে উঠতে না পেরে উঠই দাঁড়াই...কিন্তু কতক্ষণ...। তলপেটের নিদারুণচাপে ফের বসে পড়তে হয় আমাকে

-ভট্...ভট্...পোঁওও... ট-ফুট্ ফুশ্—শ্—শ্—শ্...

-অ্যা মা, অক্ থুঃ

....

ইশ্ মাগো কী গন্ধ মরে যাব"[১১৯]

ভদ্রতার, রুচিশীলতার যাবতীয় আখ্যানে থাপ্পড় মেরে 'লেনি ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে'র তৃতীয় অধ্যায় শুরু করেন বাসুদেব দাসগুপ্ত, যেখানে কুমুদ ও সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে কথক মদ ও মেয়েমানুষের প্রয়োজনে বেরিয়ে পড়ে এবং তারপর দীপ্তির ওখানে পৌঁছে যান —

> "দীপ্তির আঁচল সরিয়ে দেয় ওরা, খুলে দেয় ব্লাউজ, বডিস। ঢাউস বেগুনের মত সাদা ধবধবে দুই স্তন ফেটে বেরোয়। ওরা লুফোলুফি খেলে, পাছায় চিমটি কাটে, কাপড়ের মধ্য দিয়ে হাত চালিয়ে দেয়।"[১২০]

এরই মধ্যে দীপ্তিকে কোলে তুলতে চায় কেউ, দীপ্তি বলে এসো আমি তোমাদের কোলে নেব। আর সেই সময়েই কোনো রকম সিগন্যাল না দিয়ে অকস্মাৎ —

> "ভক্ করে পেঁদে ফেলি আমি... দীপ্তি এক ঝটকায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে বলে, কেমন নাগর লো তুমি, মেয়েমানুষের গায়ে পেদে দাও!"[১২১]

বাংলা গল্পকে তার ছক ভেঙে অন্য রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল হাংরি জেনারেশনের অনেক আগেই। বিশ শতকের শুরুতে 'কল্লোল', 'কালি-কলম'-এর লেখকরা নতুন বিষয় ও নতুন ভাবনার বাংলা গল্প লেখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই বিষয় এবং এই ভাষা বাংলা গল্পে বাসুদেব দাসগুপ্তের আগে আর কেউ লিখে যেতে পারেন নি। হাংরি জেনারেশনের লক্ষ্যই যে ছিল মধ্যবিত্তের যাবতীয় সীমানা এবং সংস্কার ও রুচিবোধকে তাঁদের সাহিত্যকর্ম দিয়ে ভেঙে ফেলা। তার যেন অমোঘ নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে বাসুদেব দাসগুপ্তের এই সমস্ত লেখাগুলি।

হাংরি প্রজন্মের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হিসেবে বাসুদেবের 'দেবতাদের কয়েক মিনিট' 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় সংকলিত হয়েছিল। ১-২-৩ এইভাবে ক্রমান্বয়ে ২৫-টি মিনিটে গল্পটিকে

চিহ্নিত করা হয়েছে। গল্পটির উপস্থাপনা, বর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ এই সব মিলিয়েই অনেকে গল্পটিকে বিখ্যাত 'কাট-আপ' মেথডের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বলতে চান। হাংরি আন্দোলন সাময়িক স্থিমিত হলে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন বাসুদেব এবং এই সূত্রেই লেখেন *খেলাধূলা* উপন্যাস।

২.৭. সুভাষ ঘোষ

ক্ষুধার্ত প্রজন্মের অন্যতম গদ্যকার সুভাষ ঘোষের *আমার চাবি* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। প্রকাশক শৈলেশ্বর ঘোষ। এই বইটিকে অনেকেই হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলেছেন। *যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট* প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। *ধ্রু-গাড়ির টিকিট* মলয় রায়চৌধুরী প্রকাশ করেন, বইটি কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ নেই। সুভাষ ঘোষের একটি অ্যান্টি- 'নাইট মেয়ার' প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯৮২-তে। ডিসেম্বর ১৯৮৩-তে প্রকাশিত হয় 'অ্যামবুশ'। ১৯৮৫-র বইমেলায় সুভাষ ঘোষের একাঙ্ক নাটক 'শহীদ চাই' প্রকাশিত হয়, এরপর ১৯৮৭-তে 'নেশাকলোনি', ১৯৯৩-এ 'গোপালের নয়নতারা', ১৯৯৪-এ 'সাবিত্রীবালা', ১৯৯৫-এ 'প্যানোরামা', ১৯৯৭-এ 'শীর্ষ অভিযান', ১৮৯৮-এ 'সেভেন্থ কার্ড', ২০০০ সালে 'হ্যালো অ্যালেন'। সুভাষ ঘোষের এহেন রচনার সঙ্গে আমরা একে একে পরিচিত হই। বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে স্টাইলের কথা বলতে গিয়ে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ভালো গদ্য রচনার কি কি গুণ হতে পারে তার উল্লেখ করতে গিয়ে সংক্ষিপ্ততা ও বৈচিত্র্য, স্বচ্ছতা বা পরিচ্ছন্নতা, নাগরিকতা ও সারল্য বা প্রাঞ্জলতা, সরসতা, মাত্রাজ্ঞান, আন্তরিকতা ইত্যাদি কথাগুলোর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ছয়ের দশকে যে হাংরি জেনারেশন মুভমেন্ট এবং তার গর্ভ থেকে উঠে আসা একজন লেখক সুভাষ ঘোষ, প্রথাগত গদ্য রচনার যাবতীয় ভাষা, শব্দব্যবহার — এ সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে যিনি ভাষার নতুন বয়ান পাঠকের সামনে তিনি তুলে ধরলেন, তা যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুনিয়ার। ক্ষুধার্ত প্রজন্মের গদ্যকারদের মধ্যে সুভাষ ঘোষকে সবচেয়ে

‘ইমাজিনেটিভ’ ও আকর্ষণীয় কিংবা ‘ডেলিবারেট’ ও অমোঘ বলেছেন অমিতাভ দাসগুপ্ত। গদ্য ও পদ্যের মাঝখানের দেওয়াল, ফারাক, কোমর ভেঙে ভেঙে যেন তুলে দিয়েছেন সুভাষ। ‘আমার চাবি’ কিংবা ‘যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট’ সুভাষের ডায়েরির ভাঁজে ভাঁজে লেখার এক-একটি পাতা যেন সময়ের সমস্ত ক্ষোভ এবং চিৎকার নিয়ে পাঠকের মনে আছড়ে পড়ে। ১৯৬৫-তে ‘আমার চাবি’-তে প্রকাশিত হয়েছিল ছয়টি লেখা। ‘হাঁসেদের প্রতি’, ‘খালাসীটোলার তিন নম্বর’, ‘নৈশ টেলিগ্রাম’, ‘ব্যাংক ডায়েরির পাতা’, ‘রেডরোড’ এবং ’২৯ ধারা ও আমার রক্তের পরিণতি’। ১৯৮৪-তে ‘আমার চাবি’র দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বন্দ্বশূক প্রকাশনী থেকে প্রকাশ হওয়ার সময় তার ভূমিকায় সুভাষ ঘোষ লিখেছিলেন, —

> “হাংরি জেনারেশন আন্দোলন যা মূলত ঐ বুর্জোয়া মূল্যবোধ সৃষ্ট টোট্যাল ফর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই সময় প্রতিষ্ঠানকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তোলে-বুর্জোয়ারা শুরু করে দেয় প্রচণ্ড আক্রমণ- আমরাও প্রস্তুত ছিলাম প্রতি আক্রমণ করতে কেননা আমরা ওদের মানসপুত্রদের ধাতুহীনতা অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম--ঐ সময় প্রকাশিত হয় আমার লেখা হাঁসেদের প্রতি, যা এই গ্রন্থের প্রথম গদ্য। ঐ লেখাই আমাকে পাঠায় জেল হাজতে (১৯৬৪)। প্রতিষ্ঠানের কাগজে খবর হয় অশ্লীলতার দায়ে লাইব্রেরিয়ান গ্রেপ্তার।”[১২৩]

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের এক অঙ্গরাজ্যের তুমুল রাজনৈতিক উথালপাথালের মাঝে দাঁড়িয়ে শব্দ, বাক্য ভাঙতে ভাঙতে সুভাষ ঘোষ যেন আবিষ্কার করেন আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি ডিম পাড়া হাঁস।

> “যখন ঘর থেকে বেরোই, তখন রাত ঠিক কত, কখন সন্ধ্যা উতরিয়ে গেছে, কিছুই অনুমান করতে পারি না। কিছুদূর এগোনোর পর পা অতর্কিতে থেমে যায়। চারিদিকে থৈ থৈ করা হাঁস দেখে পা আর কিছুতেই এগোতে পারে না। হাঁসেদের পাখা, পালক, পালকের সাদা বিস্তারের রাস্তাঘাট, ফুটপাথ, গাড়ি বারান্দা, ট্রামলাইন ছেয়ে যায়। হাঁসগুলি তাদের লাল আলতা পা থ্যাপ থ্যাপ করে ফেলতে থাকে। ঠাসাঠাসি ও গাদাগাদি হয়ে হাঁসগুলি লাল পদ্ম খায়, ছেঁড়ে, ছেঁড়ে ও খায়, তারা পরস্পরের গায়ে ছুঁড়েও মারে সেই সব ফুল।”[১২৪]

‘আমার চাবি’কে ফাল্গুনী রায় বলেছেন কবিতা, যা বাংলা ভাষায় লেখা একমাত্র গল্পহীন সিক্যুয়েন্স-লেস কবিতা। যেখানে কোনো গল্পের আভাস নেই, প্রতীককে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার না করে প্রতীককে ব্যবহার করা হয়েছে ‘র-মেটেরিয়াল’ বা কাঁচামাল হিসেবে।

‘আমার চাবি’র পর ‘যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট’-এর দিকে তাকালে দেখি ১৯৬২-র চিন-ভারত যুদ্ধ, এমনকি ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সাজো সাজো রবের মাঝখানে ক্ষুধার্ত প্রজন্মের গদ্যকার সুভাষ ঘোষ নিজেকে খুঁজছেন তৃতীয় একটি রণাঙ্গনে। ভারত-চিন যুদ্ধের সুবাদে গোটা ভারতে তখন দেশপ্রেমের বন্যা। আর তারই মাঝখানে আয়ুব খানের পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে ভারত। ছয়ের দশকের নতুন প্রজন্মের দিন কাটছে যুদ্ধ বিমানের আনাগোনায়, ক্ষিধের আন্দোলনে, অভাবের নিষ্প্রদীপ অবস্থার মধ্যে। আর তাই —

> “রাতে আজ কিছুতেই ঘুম আসে না, ঘুমেও কখনো আমি মাইলস্টোন পড়ে পথের দূরত্ব বুঝতে পারি না, জল খাই ও পেচ্ছাপ করি, পেচ্ছাপ করি ও জল খাই, কুঁজো ফাঁক হয়ে যায়, ১ ২.. করে ১০০, ৯৯... করে রাত কেটে যায়। কখনো বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে জানালা ধরি, বাইরের আকাশে রাতের পাখি উড়ে যায় কেবল বাইরে আকাশ — বিমান — মহড়া — মিলিটারি সকাল ৭। ৮। ৯– যে কোনো সময়ই ঘুম ভাঙবে দাঁড়িয়ে থাকবে ইন্সিওরেন্সের দালাল, আবার যে কোনো দিন বড়দার চিঠি
>
> ‘তুমি তোমার প্রিমিয়াম জমা দাও’
> ‘তুমি তোমার প্রিমিয়াম জমা দাও’
> ‘তুমি তোমার প্রিমিয়াম জমা দাও’।”[১২৫]

তাৎপর্যহীন বেঁচে থাকার ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে এই সমস্ত যুদ্ধের দামামার শব্দকে ছাপিয়ে যেন তৃতীয় ফ্রন্ট থেকে বার্তা পাঠান সুভাষ ঘোষ। গোটা দেশ জুড়ে যুদ্ধের বাজার, তারই মাঝখানে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে ছড়ানো হয় রাজনৈতিক ঘৃণা। একদিকে যখন দেশপ্রেমের উন্মাদনা, আরেকদিকে সিল্ক হাউসের পাশে সুভাষ দেখতে পান ফাটানো বডিস, সায়া, সিল্ক শাড়ি এবং বিলিতি এসেন্সের গন্ধে উদ্দাম আরেক ছবি। —

> "কেবলই প্রেম, প্রেম কেবলই, কেবলই চা কফি, কোর্মা কারি, এত হাসাহাসি, কেবলই মিলন, মিলন কেবলই, মিলনের মনোপলি, দূরে রাস্তায় তেরাস্তায় যুদ্ধের ব্যানার।"[১২৬]

বাজারি সাহিত্যের চটক কিংবা উৎপাদনের হাতে নিয়ন্ত্রিত সাহিত্যের মাপ ও শব্দের সীমানা এর বাইরে বেরিয়ে সুভাষ ঘোষ বুর্জোয়া সমাজের সঙ্কটকে যেন তাঁর শব্দের ভেতরে বিস্ফোরকের মতো পুরে দেন। প্রসঙ্গত তাঁর রচনা 'অ্যামবুশ' যেখানে প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত যেন ক্যামোফ্লেজে সুভাষ তীর ছুঁড়ে গেছেন একের পর এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। এই আক্রমণ অমোঘ, শাণিত এবং নির্মেদ। প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য যা মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় ভাষার দ্বারা, সেই ভাষার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন হাংরিরা। ভাষার যাবতীয় নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েই এঁদের সাহিত্য যাত্রা। আর এই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা ভাষার ক্ষমতাকে ভেঙে ফেলার চূড়ান্ত নমুনা পাওয়া যায় সুভাষ ঘোষের একেকটি রচনায়। যেমন 'গোপালের নয়নতারা' অথবা 'সাবিত্রীবালা'। শৈলেশ্বর ঘোষের মতে —

> "বুর্জোয়া সভ্যতার সৌন্দর্য চেতনাকে ধর্ষণ করে গলা টিপে মারার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা শুভাষের লেখায় কাজ করে। শুভাষের সমস্ত লেখাই আক্রমণাত্মক... সুভাষ বাংলা গদ্যের একটা নিজস্ব বাচনভঙ্গী আবিষ্কার করে। যে পদ্ধতি তার আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।"[১২৭]

কিরকম এই আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ? বা কিরকম এই শব্দের অপূর্ব জ্যামিতি!

'নিশ্চয়তা প্রাপ্ত মানুষ ওই বঙ্কিমবাবু
নিশ্চয়তা প্রাপ্ত মানুষ ওই রবিঠাকুর
এঁদের একজন 'আনন্দমঠ' / 'কৃষ্ণচরিত্র' ধরে আর
স্থির নিশ্চয় হয় —
এদের একজন গোরা ধরে আর স্থির নিশ্চয় হয় —
বলবন্ত মানুষ এঁরা সব বলবন্ত বাবা'।"[১২৮]

পাশ্চাত্যের ডাডাবাদীরা যেমন তীব্র ঘোষণায় সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সুভাষ ঘোষও কি তেমনি প্রত্যাখ্যানের ভাষায় জানাতে চান তাঁর আশেপাশের সমাজকে। যে অন্তঃসারশূন্যতাকে ছয়ের দশকের কবিরা ধরতে চেয়েছিলেন তাদের কবিতায় সেই অন্তঃসার শূন্য অসংলগ্ন সময়কে ধরার আকাঙ্ক্ষাতে যেন একের পর এক অসংলগ্ন অসংবদ্ধ বাক্যরাশি সুভাষ ঘোষের লেখায় বোমারু বিমানের মতো আছড়ে পড়ে। মূলধারার সাহিত্য বলে যা আসলে পাঠক জানেন, তার অধিকাংশই উৎপাদিত হয় বাজারের স্বার্থে। যে বাজারের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ রূপে সাহিত্যকে পরিচালিত করে। ক্ষুধার্ত প্রজন্ম এই নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেছে, এই নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে। কেন শুভাষের গদ্যে এত নিষিদ্ধ শব্দ, বাক্য ও বিষয়? স্বয়ং সুভাষ ঘোষের মতে—

> "আমাদের কেউ কখনও ভদ্রলোক বলেনি, আমরাও জানি আমরা ভদ্রলোকের কেউ না। যে নোংরা জীবনের ভেতর, অশ্লীল জীবনের ভেতর ভদ্রলোকের জাত মানুষকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, সেই মানুষের ভাষা, কথা কী করে শুদ্ধ শুচিময় হবে ? আসলে আমরা তাদেরই নোংরামি, অশ্লীলতা তাদেরকেই ফিরিয়ে দিয়েছি। তাদের সামনে মেলে ধরেছি তাদের ভণ্ড, ডি-হিউম্যানাইজড জীবনপ্রণালী — তাদের কোড ল্যাংগুয়েজ ধরে ফেলি আমরা, তাই অপরাধ — অপরাধ আমাদের তাই —তাই আমরা নোংরা, কুৎসিত, অসভ্য, মেয়ে সংক্রান্ত, যৌন সংক্রান্ত, নৈরাজ্য সংক্রান্ত, অপাঠ্য, অবোধ্য আমরা।"[১২৯]

সুভাষ ঘোষের এই মন্তব্য থেকেই অনুমান করা যাবে কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত থেকে এই গদ্যগুলো একের পর এক রচিত হচ্ছিল। 'সাবিত্রীবালা' এবং 'গোপালের নয়নতারা'কে আলোচকরা বলেছেন সুভাষ ঘোষের সবচাইতে 'সুপাঠ্য' গ্রন্থ। কেবলমাত্র এই দুটি লেখাতেই খানিকটা গল্পের আভাস অথবা উপন্যাসের ফর্ম ব্যবহার করেছিলেন সুভাষ ঘোষ। সাবিত্রীবালা, যে ধর্ষিত হয়, ধর্ষিত হয়ে খবর হয়, বাজারের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাবুর বাড়ির কাজে যাচ্ছিল সাবিত্রীবালা, বাজারের পশ্চিম ধারে ছাইগাদার পাশে সবিতা হার্ডওয়্যারের মালিক শচীন

শা সাবিত্রীবালাকে আচমকা চেপে ধরে পেড়ে ফেলে। সাবিত্রীকে ধর্ষণ করে। সাবিত্রীর শাড়িতে রক্তের ছোপ লাগে, শায়াতে লাগে —

"সত্য যে সাবিত্রীবালা স্বামীপরিত্যক্তা,
সত্য যে বত্রিশ সাবিত্রী দুই সন্তানের মা,
সত্য যে সাবিত্রী তিন বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে
সত্য যে সাবিত্রী রেলস্টেশনের পাশে নয়ানজুলি বরাবর ঝুপড়িতে থাকে,
সত্য যে রেললাইনের পাশে বটগাছতলায়
ঝুপড়ি আছে, সত্য যে সীমান্ত পার হয়ে আসা মানুষজন
সার সার ঝুপড়িতে থাকে..."[১৩০]

ক্ষুধার্ত প্রজন্মের একাধিক লেখালেখির প্রতি বা ক্ষুধার্ত প্রজন্মের একাধিক কবি-গদ্যকারদের প্রতি যৌনতার বাড়াবাড়ির অভিযোগ ছিল। কিন্তু সুভাষ ঘোষের এই 'সাবিত্রীবালা' যেন একজন নারীর প্রতি হওয়া অসম্মানের বিরুদ্ধে একজন পুরুষের ঘোষিত যুদ্ধ। কেননা, যে ক্ষমতার লক্ষ্য আসলে শরীর, যে ক্ষমতা আসলে নারীর শরীরকে অত্যাচারের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার চিহ্ন ফুটিয়ে তুলতে চায় এই সমাজে সেই ক্ষমতাকেই সরাসরি যেন চ্যালেঞ্জ করেছে এই লেখা। আর তাই মানসকন্যা তুলসীকে দিয়ে বদলা নিয়েছেন সুভাষ ঘোষ।

> "মালতী এখন কোথায়, জানে না সাবিত্রী — পরী কোথায়, কেমন জানে না সে- কোথায় কেমন এখন ঈশ্বরদি পার হয়ে আসা তুলসী জানে না তাও। পরী বলে, ওদের তলার সাত নম্বরের মাসী একদিন ডাগর লাজুক তুলসীকে এক মাস আগে এনে তোলে। মাঝবয়সী লোকটা সারারাত 'স্বামী-স্ত্রী' হিসেবে থাকবে বলে আসে, ভালো পয়সা দেয়। তুলসী লোকটাকে নিয়ে সন্ধের পর পরই দরজা দেয়, লোকটা নাকি ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়ে, তখনই তুলসী (১৯) আচমকা কাঁচি দিয়ে নুনু একেবারে কাটে। চিৎকার করে লোকটা। বাড়ির সবার ঘুম ভাঙে। চিৎকারে সবাই ছুটে আসে। তুলসীর ঘরের দরজা ভাঙে। রক্তে গড়াগড়ি খাওয়া লোকটা তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

কি বলব সাবিত্রীদি, লোকটা নুনু কই – নুনু কই বলছে, কাঁদছে, কাতরাচ্ছে — পাঁচজনে মিলে তুলসীকে সামলাতে পারি না।

তুলসী বলে, কারা সব তাকে তাড়া করেছে...

সে বলে, সে নাকি মা কালী...

তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক...তাকে খাঁড়া... রামদা দেওয়া হোক... যেখানেই নুনু দেখবে, সেখানেই নুনু কাটবে... নুনু কাটলে ঘুম হবে..."[১৩১]

সুভাষ ঘোষ থাকতে শুরু করেছিলেন শৈলেশ্বরের সঙ্গে শ্যামাচরণ মুখার্জি স্ট্রিটের একটা ছোট্ট ঘরের মেঝেতে পাশাপাশি দুটো বিছানা পেতে। সম্পাদনা করতে শুরু করেছিলেন 'এষণা'। আর তারপর একে একে হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে যোগাযোগে হয়ে উঠেছেন ক্ষুধার্ত প্রজন্মের গদ্যকারদের অন্যতম এক মুখ। বুর্জোয়া সভ্যতার সৌন্দর্য চেতনাকে ধর্ষণ করে গলা টিপে মারার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন সুভাষের গদ্যে। হাজার হাজার বছরের মার খাওয়া পলাতক অনার্যের হৃদয়ের তীব্র প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা যেন সুভাষ ঘোষের কলমে। আর তাই সাহিত্য-শিল্পের তথাকথিত আধুনিকতার ধারণাকে ধ্বংস করে চলে সুভাষ ঘোষের গদ্য।

২.৮. সুবিমল বসাক

সুবিমল বসাকের প্রথম বই *ছাতামাথা* প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-র ৩০ জুন। প্রকাশক হাংরি প্রকাশনী শ্রী সুভাষ ঘোষ। বইটির প্রথম পাতায় লেখা হয়েছিল, —

"এই গ্রন্থ আঞ্চলিক নয় এযাবৎ জিভ দিয়ে উপন্যাস লেখা হয়েছে, এবার আলজিভ ব্যবহার করা হল। ব্যবহৃত হল রক্তের ভিতর দিয়ে ভেসে যাওয়া লঞ্চের ঢেউ। নারীর কাছে গিয়ে জ্ঞানী ও গুটিপোকার উত্থান পতন দেখায় নিজের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরার অতি ব্যক্তিগত আবিষ্কার এই সুবিমল বসাকের দুর্মর দুর্দমনীয় ও পৈশাচিক মনুষ্যত্বের মহাপ্রস্থানহীন পুরুষার্থ। এই গ্রন্থে ঘোষণা করা হল কি করে মৃত্যুর পর চিতায় শুয়ে মুখাগ্নিরত শোকাতুর হাতকে হঠাৎ কামড়ে ধরতে হয়।"[১৩২]

হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যিকদের লেখার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সুবিমল বসাকের তথাকথিত এক্সপেরিমেন্ট একেবারেই অনন্য। ঢাকাই কথ্য ভাষাকে গদ্যে ব্যবহার করার প্রয়োগমূলকতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সুবিমল বসাক হাংরি জেনারেশনের আন্দোলনের সময়কালে —

> "সুবিমল বসাকের গদ্যে ঢাকাই ভাষার ব্যবহার নিয়ে কারোর উৎসুক্য, কারো বা প্রশ্ন বৃদ্ধদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র আর মণীশ ঘটকের কাছে মূলত এই ভাষা ব্যবহারই কৌতুহলের কারণ হয়েছে। ঢাকায় যাঁরা থেকেছেন বা যাঁরা ঢাকার লোক — তাঁরা যে খুবই আনন্দিত হবেন সন্দেহ কি? অন্য পক্ষে কোনো কোনো ক্ষুধার্ত তরুণ মনে করে, সুবিমলের গদ্য থেকে ঢাকাই ভাষার ছাল চামড়া তুলে নিলে আর বেশি একটা কিছু থাকবে না।"[১৩৩]

এসব বিতণ্ডায় না গিয়ে স্বয়ং সুবিমল কি বলছে শোনা যাক! —

> "নিজের ভাষাতেই লেখা উচিত। আমি পূর্বে জানিয়েছিলাম — যে ভাষায় আমি বাড়িতে কথা বলি, মা, ভাই, বোন, জ্যাঠা, বৌদি, সুনু এবং ওরাও যে ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলেন — সেই ভাষাই আমি ব্যবহার করেছি।"[১৩৪]

ভাষা ব্যবহার, ভাষা সম্পর্কে এই আন্দোলনকারীদের মনোভাব ইত্যাদি শৈলেশ্বর ঘোষের বিভিন্ন প্রবন্ধে, মলয় রায়চৌধুরীর বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এই — যে ভাষায় আমি বাড়িতে কথা বলি কিংবা যে ভাষায় মা, ভাই, বোন, জ্যাঠা, বৌদি, সুনু আমার সঙ্গে কথা বলেন, সেই ভাষাই আমি ব্যবহার করছি। এই অ্যাপ্রোচ বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নতুন রাস্তার পথিক হিসেবে সুবিমল বসাককে চিহ্নিত করে। কোনো কাহিনির আদল নেই, ছাতামাথায় যেন সুবিমলের আত্মপ্রক্ষেপণ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ অন্ধকার ঘরে কিংবা ফাঁকা কুঠুরিতে শুয়ে সুবিমল খুঁজছেন শয়তানকে। যে শয়তানের দেখা পাওয়ার জন্য ঘরে কিংবা ঘরের বাইরে রাস্তায় সুবিমল হাঁটতে থাকেন। নরকের রাস্তা জানা থাকলে নয় একবার ঘুরেই আসা যেত নরক থেকে —

"আন্ধার আর শুমশাম কুঠুরিতে একলা থাকলেই আমার খালি খালি নরক আর হয়তানের কথা মনে আহে। নরক যাওনের রাস্তাঘাটগুলা চিনা নাই, চিনাজানা থাকলে মাঝেমধ্যে আউন যাউন যাইত। পূজা পাইলের দিনে তেহার-পরবে উহানে গিয়া দুই দিনের লাইগ্যা ঘুইর‍্যা আউন যাইত। শরীল মন উস খারাপ হইলে হাওয়া বদলাউনের এউগা জায়গা হইত। আয়েরও পথ হইত। রোজ নিত্যিধর্মের তিরিশ দিন ডাইল ভাত মাছ চরচৈটা পাতড়ি আর খাউন যায় না। মুহে য্যান ঠেইলা ঠুইল্যা হান্দাইতে হয়। ময়দা খিচুড়ি ঠাণ্ডি পোলাও এই হগলও মাঝেমধ্যি খাওন দরকার। হয়তানের কথা হগল সময়ে মনে আহে, ওর কথা ভাইবা ভাইবা শরীর নিপাত করি অথচ কোনো কুল কিনারা পাই না।"[১৩৫]

বইটির প্রথম প্রকাশের সময় এর পশ্চাৎপটে লেখা হয়েছিল —

"সুবিমল বসাক কলকাতায় আসেন ১৯৬৪ সনে। সেই বছরই তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন তরুণোত্তর কবি যশোপ্রার্থীর হাতে কলেজ স্ট্রিট এলাকায় প্রহৃত হন। তাঁর দ্বিতীয় লেখাটির জন্য বাংলার জনাকয়েক মাসকাবারী সাহিত্যিকের উস্কানীতে বেরোয় পরোয়ানা। এই হ্যাটট্রিকে সুবিমল বসাক এগিয়ে দিয়েছেন শানানো ছুড়ি।

...সুবিমল বসাক, ২৫, বলগাহীন একদা দারুন উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র পবিত্র নাইট্রিক অ্যাসিড পানে পিতার মৃত্যুর পর তাকে রিপাবলিক হোটেলের বেয়ারা থেকে সাইকেল মিস্ত্রি থেকে ইঁটখোলার মুন্‌সী থেকে আঁকা স্কুলের শিক্ষকতা অবধি বিভিন্ন কাজ পর পর করে যেতে হয়। তাঁর কাছে ডান হাত ও বাম হাতের কোনো স্থূল ভেদাভেদ নেই।"[১৩৬]

ডান ও বাম হাতের স্থূল ভেদাভেদ থাকুক আর না থাকুক, ফর্ম হিসেবে গদ্যের এবং পদ্যের ভেদাভেদ যে এঁরা উড়িয়ে দিতে চাইছিলেন, মুছে দিতে চাইছিলেন এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এহেন সুবিমলের দ্বিতীয় গ্রন্থ *গেরিলা আক্রোশ* প্রকাশিত হয় ১৯৭৪-এ। প্রকাশক 'জেব্রা বুকস্'। উৎসর্গ পত্রে লেখা হয়, —

"মাটি কহে কুমহার সো, তু কা রৌঁধে মোহিঁ
একদিন এয়সা আয়গা, ম্যয় রৌদুগীঁ তোহিঁ"[১৩৭]

বইটিতে পর পর পাঁচটি গদ্যের সংকলন ঘটেছে, প্রথমটি ‘গেরিলা আক্রোশ’ — জেব্রা-১ পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৯৬৫, দ্বিতীয়টি ‘আগ্রাসী অপকর্ম’ ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’র দ্বিতীয় সংখ্যায় বেরিয়েছিল ১৯৬৬ সালে, তৃতীয়টি ‘হুশাহুশহীন ছোবল’ ‘আবহ’ পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৯৭০, চতুর্থটি ‘অপ্রতিরোধ্য ভাইরাস’ ‘অধুনা সাহিত্য’-এ বেরিয়েছিল অগাস্ট ১৯৭১, পঞ্চম তথা শেষ লেখাটি ‘তেজস্ক্রিয় দুঃস্বপ্ন’ ‘গল্পকবিতা’য় প্রকাশিত হয়েছিল সেপ্টেম্বর ১৯৭২। ‘গেরিলা আক্রোশ’ যেন এক আধুনিক তরুণের অস্তিত্বের যন্ত্রণা। সে ডায়েরি লেখে কিন্তু ডায়েরি পড়ে শেষ করতে পারে না। নিজের ডায়েরি সে নিজেই মাঝে মাঝে নিতে পারে না। ডায়েরিও শেষ হয় না, তার সাথে সাথে অস্থির হয়ে ওঠে বেতার যন্ত্র। বেতার যন্ত্র এবং ডায়েরির মাঝে যেন গোটা আবহে অস্থিরতা ভেসে বেড়ায়। যুবক বেতার যন্ত্রের কাছে যায়, ডায়েরির লাল মলাটের ওপর মাথা রেখে ঘুমোনোর চেষ্টা করে, কিন্তু ঘুম আসে না। আধুনিক মানুষের যান্ত্রিক জীবন এবং লেখকের গেরিলার মতন আক্রোশ যেন মিলেমিশে যায়।

দ্বিতীয় লেখাটি ‘আগ্রাসী অপকর্ম’ যেন আসলে শব্দের বিভীষিকা। বিভিন্ন শব্দের বাহুল্য, বিভিন্ন শব্দের অত্যাচার, বিভিন্ন শব্দের অসংযম লেখককে বিপন্ন করে তুলেছে। শব্দের রহস্যময়তাকে লেখক খুঁজে বেড়াচ্ছেন কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না। শব্দই যেন জীবনের পরিপূরক।

তৃতীয় গল্প ‘হুশাহুশহীন ছোবল’। এই গল্পে একটি তরুণ বেডরুমে শুয়ে আছে, সে নিঃসঙ্গ। একের পর এক সিগারেট শেষ হয়ে যায়, চোখের সামনে কড়িকাঠ, সিলিং, কালো ছায়া, রহস্যময় ঘর আর চোখের পেছনে স্মৃতিতে পুরনো ফেলে আসা বাড়ি, দুপুরের স্কুল, প্রেমিকা, স্মৃতির এবং বাস্তবের মধ্যে যেন বিপর্যাস তৈরি হয়ে যায়। সহসা বেড়াল ভাবনাগুলোকে ছড়িয়ে দেয়, যুবক জানালা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু দরজায় সুতো বাঁধা জীবের মত জীবনের রহস্য শেষ হয় না।

‘অপ্রতিরোধ্য ভাইরাস’ গল্পে তপন আর অরুণিমার কথা। অন্ধকারে আশঙ্কিত হয়ে তপন ভাবে যেকোনো মুহূর্তে অরুণিমা তার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অরুণিমাকে তপন ভালোবাসে না। সে ভালোবাসতে চায় তার প্রেমিকাকে। যৌবনের প্রেমিকা, স্বপ্নের নারী যার সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না আর্থিক ও সম্প্রদায়গত হীনতার কারণে। সুবিমলের একাধিক লেখায় যেন ‘বিউটি অ্যাণ্ড বিস্ট’-এর বৈপরীত্য ফুটে উঠেছে। এই গ্রন্থের শেষ গল্প ‘তেজস্ক্রিয় দুঃস্বপ্ন’। যেন একটি চরিত্র এই বিরাট পৃথিবীতে গোটা পৃথিবীর একক প্রতিপক্ষে হিসেবে আবিষ্কার করে। যুদ্ধ শুধু নিজের সঙ্গে নয়, যুদ্ধ নিজের মেরুদণ্ডহীন অসুস্থ সময়, সর্বোপরি যৌন কাতরতার বিরুদ্ধে।

সুবিমলের *আত্মার শান্তি দু’মিনিট* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। বইটির অন্তর্গত ছিল ১. ‘গেষ্টাপো অভিযান’, ২. ‘গোপন আঁতাত’, ৩. ‘আত্মার শান্তি দু’মিনিট’, ৪. ‘মাংস খাওয়া হল’, ৫. ‘মেফিস্টোফিলিসের হাত’, ৬. ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’। ‘জেব্রা বুকস্’ থেকে প্রকাশিত এই বইটির ব্যাক কভারে লেখা হয়েছিল, —

> “গপ্‌পো লিখিয়ের দিগন্ত উন্মোচন নয়, সংবাদ ভাষ্যকারদের প্রত্যাশিত কবিত্ব নয়, প্রতিষ্ঠানবিরোধীর সমষ্টিগত অসুবিধার নামচা নয়, সেই ছাতামাথা গ্রন্থগদ্যটির সময় থেকেই ভাষার নিজস্ব অস্তিত্ব শব্দের ভেতর অর্থ ও ধ্বনিকে সেঁধিয়ে দেওয়া বা বের করে নেওয়ার কৌশল শনাক্ত করেছেন সুবিমল বসাক। তাঁর অসাধারণ ভাষা উদ্যমে অগ্রজদের ছায়াপাত নেই। মগহী, ভোজপুরী, মৈথিলী, পাহাড়ী, ঢাকাই কুট্টি থেকে যেমন আহরণ করেছেন গঠনরীতি, তেমনই নগর ঝামেলার ধনতান্ত্রিক কথাব্যবস্থায় আবিষ্কার করেছেন গদ্যের চতুরালি। ফলপ্রসূ ঘটনা এবং বিষয়হীনতা দুই-ই পেয়েছে তার স্বকীয় ভাষার মনোনয়ন। তল্লাশ করেছেন স্বদেশ সমাজের আলোড়ন উৎক্ষেপ ও চাঞ্চল্যে আটক বৈষ্ণব মাংশাসীর দুঃসাহস। কেবল প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ নয়। প্ররোচনা। আক্রমণ। ধাতু স্বর্ণের অদ্বৈত চমকে যে বিদ্রূপ। জিভের অকপট পেশকারি। বাংলা ভাষার মূল মেজাজ। গদ্যই সুবিমলের উপজীব্য। গরিমা।”[১৩৮]

১৯৮৫-তে প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থের মধ্যেও প্রতিরোধ আক্রমণের কথা ছিল সুবিমল বসাক প্রসঙ্গে। কেননা খুব স্বাভাবিক ভাবেই যে অন্যরকম ভাষাকে তুলে আনতে চাইছিলেন নিজের গদ্যে, বাসুদেব দাসগুপ্ত কিংবা সুভাষ ঘোষের মতই নিজের পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে, নিজের পৃথক স্টাইল নিয়ে প্রকাশিত হতে চাইছিলেন সুবিমল বসাক।

'অযথা খিটকেল' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে 'এবং' প্রকাশনী থেকে। ভূমিকায় সুবিমল লিখছেন, —

> "এই গ্রন্থে সব কটি গদ্য ১৯৬৪ ৬৫ সালে রচিত। প্রায় ১৯/২০ বছর আগের এই সব গদ্য এ যাবৎ পড়েছিল বই চাপা অবস্থায়"[১৩৯]

বইটিতে যে গদ্যগুলি রাখা হয় সেগুলি হল যথাক্রমে 'পরস্তাব', 'গিদরামি', 'জাব্রা', 'আটামি', 'খতিয়ান', 'আপিলা চাপিলা', 'অযথা খিটক্যাল', 'ছুচুমুচু', 'ইচড় অঙ্গুঠ', 'ভোগলামি'। সুবিমলের মতে —

> "এই সব লেখা বিশেষ একটি সময়ের, বয়সের ও মানসিকতার প্রতিফলন। এই গ্রন্থে ২৩-২৪ বছরের একজন যুবকের প্রেম-অপ্রেম, সাফল্য-ব্যর্থতা, অভিজ্ঞতা-খেসারত, গোপন গতিবিধি, চোরা ভাবনা সবই আন্তরিক ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।"[১৪০]

অমিতাভ দাস 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় 'ক্ষুধার্ত তরুণদের গদ্য বা তদ্‌জাতীয় কিছু' এই শিরোনামে আলোচনা করতে গিয়ে সুবিমল বসাকের গদ্য সম্পর্কে বলেছেন, —

> "অতএব সুবিমলের লেখার খোসা খুলতে খুলতে আমার মাথা ধরে যায়, স্যারিডন খাই, আর ওই বই নিয়ে পাশের বাড়ির মানিকগঞ্জের ভদ্রলোকের বাড়ি যাই। অথচ সুবিমলের লেখায় তো সত্যিকারের কাঁচামশলা আছে — আঁতের ভেতরে ছোরা চালাচালির ব্যাপার আছে। বিনয়ের কবিতার অসাড়ে প্রস্রাব ঝরে যাওয়ার মতো সব কিছু ঝরে যাওয়ার, আঙুল থেকে স্পর্শ পালিয়ে যাওয়ার আলটিমেট বিপন্নতা আছে, একটা গোটা মানুষের সমস্ত কিছু দিনকে দিন অ্যানিমিক টং টং ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ওর প্রায় তামাম লেখার ভেতরে। ছাতা মাথার আগাপাশতলায় আছে, গিধরামিতে আছে, জাবরায় আছে সুবিমল চাক বা না চাক ফিলজফি আছে।"১৪১

১৯৬১-৬৫ পর্যন্ত যদি হাংরি আন্দোলনের তুঙ্গ সময় ধরি তাহলে দেখব গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ হাংরি সাহিত্য কর্ম গুলোই প্রকাশিত হয়েছিল এই পর্বে। ১৯৬৫ এর পর সাময়িক স্তব্ধতা কাটিয়ে শৈলেশ্বর, বাসুদেব, সুভাষ এঁরা বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা ও লেখালেখি চালিয়ে যান। দীর্ঘ বিরতির পর আটের দশকে লেখালেখির দুনিয়ায় ফিরে আসেন মলয় রায়চৌধুরী। আমরা খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে এঁদের সাহিত্য কৃর্তির উদাহরণ পেশ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হাংরি সাহিত্য পরিমাণে আরও বিস্তৃত। কবিতার পাশাপাশি মলয় রায়চৌধুরী অসংখ্য গস্য এবং নাটকেরও রচয়িতা। শৈলেশ্বর ঘোষও একাধিক গদ্যগ্রন্থ লিখেছেন। মৃত্যুর আগে দু'ই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে অরুণেশের গল্প সমগ্র। হাংরি জেনারেশনের বিরাট সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে থেকে যে প্রবণতাগুলি মূলত নৈরাজ্যময় দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছে এই অধ্যায়ে আমরা তাদেরই গুরুত্ব দিতে চেয়েছি বেশি। এই সাহিত্যিক নিদর্শনগুলোর মধ্যদিয়েই হাংরি সাহিত্য কীভাবে নৈরাজ্যের পথে হেঁটেছিল তার বিশ্লেষণই আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

তথ্যসূত্র :

১. দাশ, উত্তম, ২০১৩ : ৯

২. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৯৩ : ৪-৫

৩. রায়চৌধুরী, সমীর, এ এম মুর্শিদ (সম্পা), জুলাই ২০১৩ :৩৬

৪. তদেব: ৩৭

৫. চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার (সম্পা), ২০১৫ : ৩০৮

৬. সেন, সব্যসাচী (সম্পা), ২০১৮-২০১৯ : ৩৪

৭. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ১৪

৮. সেন, সব্যসাচী (সম্পা), ২০১৮-২০১৯ :৯

৯. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ১৪-১৫

১০. তদেব : ১৫

১১. তদেব : ১৬-১৭

১২. সেন, সব্যসাচী (সম্পা), ২০১৮-২০১৯ : ১৭

১৩. তদেব : ১৯

১৪. তদেব : ৩১

১৫. তদেব : ১১৫

১৬. তদেব : ১৩৭

১৭. তদেব : ১৩৬

১৮. তদেব : ১৩৮-১৩৯

১৯. চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার (সম্পা), ২০১৫ : ২৬৭

২০. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৯৩ : ৫

২১ .তদেব : ৬

২২. তদেব : ৮

২৩. তদেব : ৮

২৪. তদেব : ১০

২৫. তদেব : ১০

২৬. তদেব : ১০

২৭. তদেব : ১২

২৮. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ১৭-১৮

২৯. সেন, সব্যসাচী (সম্পা), ২০০৮-২০০৯ : ১১৮

৩০. ঘোষ , শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ৩১

৩১. তদেব : ২৬

৩২. তদেব : ৩০

৩৩. তদেব : ৪০

৩৪. তদেব : ৪১

৩৫. তদেব : ৪২

৩৬. ঘোষ শৈলেশ্বর (সম্পা), ২০১১ :১৪৬

৩৭. তদেব : ১৪৬-১৫৩

৩৮. তদেব : ১৪৬-১৫১

৩৯. তদেব : ১৫১-১৫৩

৪০. ঘোষ , শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ৪৩

৪১. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৯৩ :১৭

৪২. তদেব : ১৭

৪৩. তদেব : ১৮

৪৪. তদেব : ১৮

৪৫. তদেব : ১৮-১৯

৪৬. তদেব : ১৯

৪৭. তদেব : ১৯-২০

৪৮. চট্টোপাধ্যায় , প্রণবকুমার (সম্পা), ২০১৫ : ২৯১-২৯২

৪৯. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা), ২০১১ : ১৫৩-১৫৪

৫০. চট্টোপাধ্যায় , প্রণবকুমার (সম্পা), ২০১৫ : ১৫৬

৫১. দাশ, উত্তম, ২০১৩ :২০

৫২. তদেব : ২০

৫৩ তদেব : ২১

৫৪. তদেব : ২২-২৩

৫৫. তদেব : ২৩-২৪

৫৬ .তদেব : ২৫

৫৭ .তদেব : ২৬

৫৮ .তদেব : ২৬

৫৯ .তদেব : ২৮

৬০. তদেব : ২৯

৬১ .তদেব : ৩০

৬২ .ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ৩৬

৬৩ .সেন, সব্যসাচী, নভ ২০১২ : ১৬

৬৪. সেন, সব্যসাচী, ২০০৮ : ২৮

৬৫ .তদেব : ১১

৬৬ .তদেব : ১১

৬৭ .সেন, সব্যসাচী (সম্পা), ২০২০ : ৩২

৬৮ .তদেব : ৩৩

৬৯ .তদেব : ৩৪

৭০ .রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৯৪ : ৬৮

৭১ .সেন, সব্যসাচী (সম্পা), ২০১২ : ৪

৭২ .ঘোষ, অরুণেশ, ২০১৮ : ২২

৭৩ .সেন, সব্যসাচী (সম্পা), ২০১২ : ৫

৭৪ .ঘোষ, অরুণেশ, ২০১৮: ৭৪

৭৫ .ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা), ২০১১ : ১১৬

৭৬ .চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার (সম্পা), ২০১৫ : ২৬২

৭৭ .তদেব : ৩৫০

৭৮ .রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৯ : ২২১

৭৯ .চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার (সম্পা), ২০১৫ : ২২০

৮০ .তদেব : ৩৩

৮১ .মিশ্র, বৈদ্যনাথ (সম্পা), ২০১৫ : ৩০

৮২ .রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৯ : ১৬১

৮৩ .মিশ্র, বৈদ্যনাথ (সম্পা), ২০১৫ : ১২৯

৮৪ .তদেব : ১২

৮৫.রায়, ফাল্গুনী, ১৯৯৬ : ১০

৮৬.মিশ্র, বৈদ্যনাথ (সম্পা), ২০১৫ : ২৮-২৯

৮৭. তদেব : ৮১

৮৮.রায়, ফাল্গুনী, ১৯৯৬ : ৭

৮৯.তদেব : ৮

৯০. মিশ্র, বৈদ্যনাথ (সম্পা), ২০১৫ : ২৪

৯১. তদেব : ৫৪

৯২. ঘোষ, অরুণেশ, ২০১৩ : ১৪

৯৩. তদেব : ৭ ১

৯৪. ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পা), ১৪১৮ : ২০

৯৫. তদেব : ২১

৯৬. তদেব : ২১

৯৭. তদেব : ২২

৯৮. তদেব : ৫১

৯৯. তদেব : ৫৫

১০০. উপাধ্যায়, পার্থসারথি, নিয়োগী, সঞ্জীব (সংকলিত), ২০১৬ : ২০

১০১. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা) , ২০১১ : ৬১০

১০২. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ৩০

১০৩. তদেব : ২৯

১০৪. তদেব : ২৯

১০৫. চৌধুরী, প্রদীপ, ১৯৯৯ : ৩৪

১০৬. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ৩০

১০৭. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা), ২০১১ : ১২০

১০৮. তদেব : ৫২২

১০৯. তদেব : ৮২

১১০. তদেব : ৮৭

১১১. তদেব : ৬৪

১১২. সাহা, অপূর্ব (সম্পা), ২০১৭ : ৪৩৩

১১৩. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ২৬

১১৪. সাহা, অপূর্ব (সম্পা), ২০১৭ : ৪৭-৪৮

১১৫. তদেব : ১০

১১৬. তদেব : ১১৪

১১৭. তদেব : ১৭৩

১১৮. তদেব : ১৭৯

১১৯. তদেব : ১৭৯-১৮০

১২০. তদেব : ১৮৪

১২১. তদেব : ১৮৫

১২২. হালদার, স্বপনরঞ্জন, ২০১৬ : ২১১

১২৩. সেন, সব্যসাচী, বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল (সম্পা), প্রথম খণ্ড, ২০১৭ : ১৪৪

১২৪. তদেব : ৩৩

১২৫. তদেব : ৭৯-৮০

১২৬. তদেব :৮১

১২৭. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ২৮

১২৮. হালদার, স্বপনরঞ্জন, ২০১৬ : ১১২

১২৯. সেন, সব্যসাচী, বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল (সম্পা), প্রথম খণ্ড, ২০১৭ : ১৬

১৩০. সেন, সব্যসাচী, বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল (সম্পা),দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৭ : ৯৫-৯৬

১৩১. হালদার, স্বপনরঞ্জন, ২০১৬ : ২৬৯

১৩২. ভট্টাচার্য, তন্ময় (সম্পা), প্রথম খণ্ড, ২০১৬ : ২৩৯

১৩৩. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা), ২০১১ : ৬২

১৩৪. তদেব : ৬২

১৩৫. ভট্টাচার্য, তন্ময় (সম্পা), প্রথম খণ্ড, ২০১৬ : ১১

১৩৬. তদেব : ২৪১

১৩৭. তদেব : ২৪২

১৩৮. তদেব : ২৪৩

১৩৯. তদেব : ২৪৪

১৪০. তদেব : ২৪৫

১৪১. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা), ২০১১ : ৬২

চতুর্থ অধ্যায়

হাংরি জেনারেশন : নৈরাজ্যের নন্দন

গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে 'নৈরাজ্য'-এর ধারণা ও তার ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত, নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'নন্দনতত্ত্ব'র ক্রমবিবর্তিত ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে নৈরাজ্যের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের সম্পর্ক খতিয়ে দেখা হবে, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশনের মধ্যে দিয়ে যে নৈরাজ্যময় ভাষা, শব্দ, কবিতা, গদ্য উঠে এসেছিল, শেষপর্যন্ত তা কোনো নন্দনতত্ত্বে পৌঁছতে পারল কিনা, সেই আলোচনা আমাদের অভীষ্ট।

বার্টল্ড রাসেলের মতে, —

> "সাধারণ লোকে অ্যানার্কিস্ট বলিতে বোঝে এমন ব্যক্তি যাহার মস্তিষ্ক অল্পবিস্তর বিকৃত বলিয়া অথবা যে তাহার অপরাধ প্রবণতাকে উগ্র রাষ্ট্রমতের আবরণে ঢাকিতে চায় বলিয়া বোমা ছোঁড়ে কিংবা অন্য কোনো নৃশংস কাণ্ড করিয়া বসে। এ ধারনা আদৌ ঠিক নয়। কোনো কোনো নৈরাজ্যবাদী বোমা ছোঁড়ায় বিশ্বাস করে, অনেকে করে না। অন্যান্য মতাবলম্বীরাও অবস্থা বিশেষে বোমা ছোঁড়ায় বিশ্বাস করে — যথা, যাহারা সেরাজিভোতে বোমা ছুঁড়িয়া বর্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহারা ছিল জাতীয়তাবাদী, নৈরাজ্যবাদী নয়। যে সকল নৈরাজ্যবাদী বোমা ছোঁড়ায় সমর্থন করে, এবিষয়ে তাহাদের সঙ্গে অন্যদের কোনো মৌলিক নীতিগত পার্থক্য নাই — অবশ্য যে নগণ্য কয়জন টলস্টয়ের মতো নির্বিরোধী শান্তির পথ বাছিয়া লইয়াছেন, তাহাদের কথা আলাদা। সমাজবাদীদের মতো নৈরাজ্যবাদীরাও শ্রেণিসংগ্রামের মত পোষণ করে। সরকার যেমন যুদ্ধ চালাইবার জন্য বোমা ব্যবহার করে, তাহারাও তাই করে। তবে নৈরাজ্যবাদী যেখানে একটি বোমা তৈয়ার করে, সেখানে সরকার করে লক্ষ লক্ষ। নৈরাজ্যবাদের হিংসায় যেখানে একটি লোক নিহত হয়, সেখানে সরকারি হিংসায় মরে লক্ষ লক্ষ। সুতরাং যে হিংসার প্রশ্নটি সাধারণের কল্পনা জুড়িয়া বসিয়া আছে, তাহা আমরা আমাদের মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি, কারণ নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে হিংসার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নাই।"[১]

নৈরাজ্য শব্দটি বললেই আমাদের মনে যে বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর এবং সন্ত্রাসের ছবি ভেসে ওঠে, নৈরাজ্যের দার্শনিক অবস্থানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই নৈরাজ্য যে শুধুমাত্র

বিশৃঙ্খলা অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে, তা নয়। ছয়ের দশকে গোটা পৃথিবী জুড়েই স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের দমন ও পীড়নের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যের দর্শনের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছিল —

> "The 1960's are rightly viewed as a time of renewal in the history of 20th century anarchism, when mass aprising in places as far flung as the United States, France, Checoslovakia and Mexico challenged the status quo inexplicitly anti-authoratorian terms. In America, the civil rights movement merged with the anti-Vietnam war movement giving rise to a richly diverse counterculture with strong anarchist current that carried over into the 1970s."[২]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছয়ের দশকে এবং সাতের দশকে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে নতুন করে নৈরাজ্যময় ভাবনার উন্মেষ ঘটতে দেখা গিয়েছিল। প্রসঙ্গত ১৯৬০ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে দেশভাগ, তথাকথিত স্বাধীনতা এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় বয়ে এনেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে এই ধারণার চর্চার একটি উন্মুখ অঙ্গন প্রস্তুত ছিল এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শৈলেশ্বর ঘোষ উল্লেখ করেছেন, —

> "যে কজন এই আন্দোলন সৃষ্টি করেছে তারা প্রত্যেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু। কিছুদিন আগে এক প্রাক্তন হাংরি যে নিজের পিঠ বাঁচাতে ১৯৬৫ সালে আন্দোলন ছেড়ে পালায় সে উদ্বাস্তুদের নিয়ে তামাশা করতে শুরু করে এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করতে থাকে উদ্বাস্তুদের। এই প্রাক্তনটির নাম শ্রী মলয় রায়চৌধুরী। উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা যে উদ্বাস্তু হয়নি তার পক্ষে বোঝা কোনোদিনই সম্ভব নয়। জীবনের এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য থেকেই এসেছিল সেদিন ঐ বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, সুবো আচার্য, প্রদীপ চৌধুরী এবং শৈলেশ্বর ঘোষ। বাল্যকালেই তারা যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিয়েছিল সেই অভিজ্ঞতার নির্যাসটাই নিদারুণ হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে তাদের রচনায়। বাংলার সুদূর গ্রাম-গঞ্জ থেকে এসে কলকাতায় আকস্মিক ভাবে মিলিত হয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে তারাই হাংরি জেনারেশনকে আন্দোলনে পরিণত করবে।"[৩]

অর্থাৎ, এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের অতীত ইতিহাস দেশভাগ এবং দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে আসার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত। ফলে আমরা অনুমান করতে পারি শৈলেশ্বর ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, সুবো আচার্য, প্রদীপ চৌধুরী তারা যে নিদারুণ জীবনের অভিজ্ঞতা বয়ে এনেছিলেন কলকাতায়, সেখান থেকেই রাষ্ট্রের তৈরি করা অবরোধগুলো ভাঙার প্রেরণা তৈরি হয়েছিল এবং এই অবরুদ্ধ দরজাগুলোকে খুলতে খুলতেই সংবেদনার নতুন আখর হিসেবে তাদের সাহিত্য প্রাণ পেয়েছিল প্রতিবাদের ভাষায় —

> "তাজমহল সুন্দর এই বাক্যটি স্ববিরোধী। কারণ কোনো বহির্বস্তু সুন্দর হইতে পারে না। আমাদের অন্তরের বীক্ষাবৃত্তির প্রসারকেই সুন্দর বলা যায়। কোনো বহির্বস্তু যখন সে বীক্ষাবৃত্তির স্মারক হয়, তখন সে স্মারকত্বলক্ষণাপুরস্কারে তাহাকে সুন্দর বলিয়া থাকি। কোনো বহির্বস্তুকে সুন্দর বলা সুন্দর শব্দের গৌণ বা লাক্ষণিক প্রয়োগ মাত্র। কেবলমাত্র আমাদের অন্তরের বীক্ষা বৃত্তির অন্তর্গত ব্যাপারকে মুখ্যভাবে সুন্দর বলা চলে।"[৪]

রাষ্ট্রের অঙ্গুলিহেলনে ভিটেমাটি ছেড়ে উচ্ছেদ হওয়া যে মানুষ খিদের তাড়নায়, আশ্রয়ের খোঁজে পরিবার, মানুষ এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গচ্যুত হয়ে রাস্তা খুঁজে বেড়িয়েছে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় — তার ভেতরকার সৌন্দর্য যদি চিৎকৃত হয়ে প্রকাশিত হয় কবিতা অথবা গদ্যে, তার ভেতরকার কষ্ট, দুঃখ, হতাশা কিংবা ক্রোধ যদি চিৎকৃত হয়ে প্রকাশিত হয় সাহিত্যে তাহলে তা কি 'অন্তর্বস্তুর প্রসার' হিসেবে বিবেচিত হবে?

নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় আমরা সুন্দরের কথাও বলেছি —

> "সুন্দর হল আকার আর বিন্যাসের ব্যাপার, সুন্দর জিনিস মানে : বিভিন্ন অংশ মিলে যা পূর্ণ রূপ পায়; অংশগুলি সাজানো থাকে এক বিশেষ বিন্যাসে, আর থাকে এক নির্দিষ্ট পরিমাপ। খুব ছোটো হলে তাই কোনো জিনিসকে সুন্দর বলা যায় না, আবার অতিমাত্রায় বড় হলেও না। তার আকার এমন হওয়া উচিত যাতে এক নজরে তা ধরা পড়ে।'[৫]

কিংবা —

> "সুন্দরের লক্ষণ হল সমগ্র বা নিখুঁত, কারণ খুঁত থাকলে যে কোনো বস্তুই কুৎসিত হয়ে যায়; সঠিক অনুপাত বা সঙ্গতি; আর স্বচ্ছতা, উজ্জ্বল রঙের বস্তুকে তাই সুন্দর মনে করা হয়।"[৬]

সুন্দরের আলোচনায় বা সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় বারবারই এসেছে সুসংগতির কথা, অনুপাতের কথা, সুসংহত বিন্যাসের কথা। সময়ের পারিপার্শ্বিকতায় অসহায় ব্যক্তিমানুষের অবদমিত যে চিৎকার তার প্রকাশের ক্ষেত্রেও আমরা কি সুসংগত বিন্যাস খুঁজব? যে চিৎকার হাংরি জেনারেশনের কবিতা ও গদ্যে ধ্বনিত হয়, যে শব্দের ভেতরকার অভ্যাসকে নষ্ট করার ইচ্ছাকৃত প্রক্রিয়া হাংরি জেনারেশনের কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখালেখিতে চালিয়েছেন, তার মধ্যে কি সংগতির অভাব বলেই তা আপাত ভাবে আমাদের চোখে সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হবে না? হাংরি লেখকরা তাঁদের পদ্যে বা গদ্যে যে ভাষাকে তুলে আনতে চান, তা আমাদের অভ্যাসের ভাষা নয়। আবহমান বাংলা সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য পড়তে গিয়ে বারবার বিঘ্নিত হয়, বারবার আক্রান্ত হয়। এঁদের রচনা এমনই যা প্রথম পড়তে গিয়ে প্রত্যাখ্যান করতে ইচ্ছা হলেও সতর্ক হলে বোঝা যায়, এ কোনও কৃত্রিম ভাষার ব্যবহার নয়। এ যেন ভেতর থেকে উঠে আসা। তাই আমরা নিজেদের অভ্যাসের মুখোশ নিয়ে লুকিয়ে এদেরকে আড়াল করতে চাই। কিন্তু হাংরি জেনারেশনের চিৎকার আমাদের সেই কথার তথাকথিত মুখোশ ধরে টান দেয়। লেখক অমর মিত্রের মতে, —

> "তখন সেই সব লেখাই খুঁজে বের করতে চাইছিলাম যা দাঁড়িয়ে ছিল স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে। রাজনৈতিকভাবে ভাঙতে চাইছিলেন নকশালপন্থী যুবকেরা, আর সাহিত্যের স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন অনেকেই। তাদের ভেতরে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন ক্ষুধার্ত প্রজন্ম। হ্যাঁ, ক্ষুধার্ত লেখকরা বিব্রত করতেন, পড়তে পড়তে সরিয়েও দিতে হয়েছে বারবার, আবার হাত বাড়িয়ে প্রথম পাতা থেকে পুনঃপাঠে মগ্ন হতে হয়েছে। ক্ষুধার্তের লেখকরা বাংলা সাহিত্যের পড়ুয়াদের পাঠ অভ্যাসকে ডিস্টার্ব

করতে চাইছিলেন। তা করেছিলেনও। বিব্রত হতে হতে আমি মুগ্ধ হয়েছি বারবার। টের পাচ্ছিলাম তাদের ঐ নৈরাজ্যময় লেখালেখির ভেতরেও শুরু হয়ে গেছে আমাদের সাহিত্যের এক নতুন নির্মাণ।"[৭]

এই যে বিব্রত করতে করতে মুগ্ধ করার বিন্যাস, হাংরি আন্দোলনের নন্দন তথা সৌন্দর্য কি আসলে এর মধ্যেই নিহিত আছে? আমাদের পাঠকৃতির অভ্যাসকে যা বিঘ্নিত করে, যা আক্রান্ত করে, যা বারবার আমাদের তৈরি করা সভ্যতার মেকি মুখোশ ধরে টান দেয় আর তাই এই নৈরাজ্যের সৌন্দর্যকে খুঁজতে আমরা হাংরিদের গদ্য এবং পদ্যের দিকে তাকাতে চাই। *ক্ষুধার্ত* পত্রিকার প্রথম সংকলনে প্রথম সংখ্যায় হাংরি জেনারেশনের কবিদের কাছে মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন রেখেছিলেন যে তাঁরা কবিতা লেখেন কেন। অথবা কবিতাকে 'ডিরেক্ট' বলতে গিয়ে কি তাঁরা নিজেদের রক্তে এবং কালিতে মাখামাখি করে নিতে পেরেছিলেন?

এই প্রসঙ্গে আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে ক্ষুধার্তদের প্রচেষ্টা আসলে জীবনের নগ্নতাকে ভাঁজ খুলে দেখানোর এবং তাতে যত ভয়ঙ্কর সত্যই থাক না কেন জীবনের যাবতীয় সম্পর্ক, আচার এবং যুক্তি-শৃঙ্খলকে যদি ভণ্ডামি বলে তাঁদের মনে হয়, তা তাঁরা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন এবং এসব কিছুকে প্রতারণা বলেই তাঁরা ভাবেন। সবরকম প্রতিষ্ঠান, যা আসলে সাহিত্য তথা জীবনের মূল নিয়ন্ত্রক, তারা সেই প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতার বলয়ের বাইরে পা রাখতে চান। পূর্ববর্তী যাবতীয় শিল্পকর্ম যা এই মূঢ় বিশ্বাসের উপর এবং তথাকথিত মেকি নন্দনতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে, তাকেও এঁরা অস্বীকার করতে চান —

"আমার ভাষার চেতনার নৈরাজ্য এবং অবচেতনার গাঢ় রাত্রি প্রকাশ করে — এভাষা direct এবং অজ্ঞাত অন্ধকার থেকে উঠে আসে বলে কোথাও indirect মনে হতে পারে — চেতনা এবং অবচেতনার সংযোজন হলে অভিজ্ঞতা কেবল অভিজ্ঞতাই থাকে না, বোধে রূপান্তরিত হয় — কিন্তু এ বোধ কলঙ্কিত, বামপন্থী, ভয়ংকর শূন্যের ভেতর টেনে নিয়ে যায়, বুর্জোয়া একে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করে — চরম অভিজ্ঞতার ফল হলে সব লেখাই direct। আমার কাছে স্বপ্নও direct অভিজ্ঞতা এবং সত্য।"[৮]

চেতনার নৈরাজ্য থেকে বা অবচেতনার অন্ধকার থেকে সত্য এবং ডিরেক্ট ভাষা উঠে আসে বলেই হাংরি কবি বলে উঠতে পারেন, —

"আমি নারী মুখ দ্যাখার ইচ্ছায় মাইলের পর মাইল হেঁটে দেখি
শুধু মাগীদের ভিড়
সাতাশ বছর — একা একা সাতাশ বছর
বেক্তিগত বিছানায় শুয়ে দেখি
সেবাহীন ভবিষ্যৎ জরাগ্রস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর পাশে কবির কবিতা
চারিধারে ঢিবি দেওয়ালের নিরেট নিঃশক্ত অন্ধকার"[৯]

কিংবা —

"উত্তরাধিকারহীন নৈরাজ্য থেকে যা এই সময়ের বৈশিষ্ট্যও বটে হাংরি সম্প্রদায়ের জন্ম। এই অননরূপতা তাদের জন্মের জন্য যেমন পুষ্টির জন্যও তেমন দায়ী। অতঃপর আমি কে, আমি কী, আমি কেন এবং আমি কেমন করে, ইত্যাদি এই মুহূর্তের অথচ শাশ্বত প্রশ্ন এবং সমস্যা যেমন এই দাহ্য জীবনকে সদা জাগ্রত রাখে এবং তাড়না করে বেড়ায় তেমন ঐ সব তৎপর প্রশ্নের চোট এবং বিস্ফোরণ ছাড়া কবিতার আর কিছুই করার থাকে না। স্বভাবত সমগ্র ব্যক্তি মানুষ ও কবিতার স্ব-স্বভাব, অস্তিত্বের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ছাড়া দেশ-কাল-পাত্রর জন্য কোনো শর্ত স্বয়ম্ভুরূপে স্বীকৃত হয় না। বস্তুত বেঁচে থাকাই বেঁচে থাকার কারণ ছাড়া অন্য কোনো মৌল হেতুতে হাংরি কবি সম্প্রদায় বিশ্বাসী নন। হাংরি কবিতা পজিটিভ নেগেশন"[১০]

'পজিটিভ নেগেশন' এই আশ্চর্য শব্দবন্ধের সামনে এসে আমরা থেমে যাই। খোঁজার চেষ্টা করি, শেষ পর্যন্ত হাংরি জেনারেশন কী 'পজিটিভ নেগেশন'এর সৌন্দর্য দিয়ে যায় বাংলা সাহিত্যের পাতায়? বেঁচে থাকাই তো বেঁচে থাকার কারণ। জীবন ছাড়া কিংবা আমি ছাড়া কবিতার বিষয় আর অন্য কি-ই বা হতে পারে হাংরিদের কাছে। তাই —

"কোনো শীতের রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে আমার যাওয়ার
সময় হবে পড়ে থাকবে কিছু আধপোড়া সিগারেট

ছাই ছেঁড়া জামা অভুক্ত খাবার ধূসর পাণ্ডুলিপি

ইস্ত্রিবিহীন পাজামা পড়ে নেব মনে পড়বে সেই কথা

এ কোনো বিদায় নয় কেবল অসমাপ্তের আত্মগোপন”[১১]

হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকে বিভিন্নভাবে এই আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আমরা যদি আলাদা করে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের চোখে এই আন্দোলন কেমন ছিল তা জানার চেষ্টা করি, তাহলে যা পাব, —

“সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় : — বস্তুত হাংরি জেনারেশন একটা আইডিয়া। হাংরি জেনারেশন মূলত কাব্য আন্দোলন। প্রায় ডজন দুই নতুন নাম দিয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যকে এখন উপদ্রুত অঞ্চল বলা চলে। কবিতায় কোনো রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই, স্পর্শ নেই, সুর নেই — সিম্বল, ইমেজ, রূপক বা অলঙ্কার — এমনকি সামান্য পয়ার পর্যন্ত ত্যাগ করে বাংলা কবিতা চির স্তব্ধতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

শম্ভু রক্ষিত : — কবির রক্ত-মাংস, ঘাম, ক্রোধ, ঘৃণা, ক্ষুধা — ভয়ঙ্কর প্যাশন কবিতা। কবি এক্কেবারে স্বাধীন। ক্ষুধায়, অপমানে কবিকে নোংরায় দুর্দশায় নেমে যাওয়া দরকার। কবির বেঁচে থাকার মানে ব্যক্তি আর তার গুপ্ত ফতোয়া জারি।

অরুণেশ ঘোষ — হাংরি বোধ চায় সৃষ্টি। স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপ হাংরি বোধ দেখাতে চায়। আর সমস্ত নীতি নিয়ম ও আদর্শের অবলুপ্তি চায় — নিজেকে সম্প্রসারিত করতে চায়।

সুবো আচার্য — সভ্যতার রূঢ় প্রকাশ, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান — সমগ্রভাবে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একে চ্যালেঞ্জ করে এর যথার্থ রূপ দেখার প্রবণতা — হাংরি আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। It was an adventure towards unknown.

ত্রিদিব মিত্র — হাংরি শরীরের ঘাম, পুঁজ, মামড়ি, কফ, যৌনাঙ্গ ব্যবহার সোজাসুজি ও শর্তহীন। তা অমোঘ, দুর্দমনীয়, নষ্ট, কলঙ্কিত ও এত ভয়াল। যুক্তি দিয়ে লেখা খাড়া করবার কোনোরকম যুক্তিই টেকে না। অহংকার ও আত্মবোধ থাকা দরকার।

সুভাষ ঘোষ — হাংরি সাহিত্য মনে করে ক্ষুধা জীবনের মূল ড্রাইভ। এই ক্ষুধা বা ক্ষুধার্ত চেতনা থেকেই অতীতে যা কিছু ঘটার ঘটে গেছে, আজও ঘটছে, আগামীদিনেও ঘটতে

থাকবে — হাংরিরাই প্রথম এই নিউক্লিয়াসটিকে সচেতনভাবে চিহ্নিত করে এবং তাবৎ ঐতিহাসিক চেতনায় তাকে যুক্ত করে। ক্ষুধাদি গ্রহণ বর্জন স্থির হয় আর এই চেতনা বোধ থেকেই তাবৎ সৃজনশীল মানুষের শোভাযাত্রা। ক্ষুধার যে যাচাই ও আগ্রাসী ক্ষমতা, হাংরি সাহিত্যের তাই।

বাসুদেব দাশগুপ্ত — আমার ক্ষুধা ছিল মানুষের সার্বিক মুক্তির ক্ষুধা — সেই স্বাধীনতার রাজ্য যেখানে আমরা পৌঁছতে চাই।

সুবিমল বসাক — ইর্র্যাশনাল অথচ বুদ্ধিবাদী, মগজ হাতে নিয়ে কাগজে নেমে আসাই হাংরি বৈশিষ্ট্য।

শৈলেশ্বর ঘোষ — হাংরি জেনারেশন আন্দোলন শুধুমাত্র সাহিত্য আন্দোলন নয়, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনাও এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। স্বাধীনতাই ছিল আমাদের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা। শোষণ ও মিথ্যা থেকে নিজেদের মুক্ত করাই ছিল হাংরিদের লক্ষ্য। হাংরি সাহিত্য তাই আর কোনো শিল্প নয়, হাংরি সাহিত্য জীবন অভিজ্ঞতার মুক্তি।

উৎপল কুমার বসু — আমরা চেয়েছিলাম সাঁজোয়া গাড়ি একথা ঠিক এবং কবিকে হতে বলেছিলাম নায়েব এবং শুল্ক দিতে চাইনি কিছু। কেবল এই পরম্পরাহীন পানিপথে নপুংসকদের উল্লাস ও হাহাকার শুনেছিলাম স্বপ্নের ভেতর। তাই প্রাতঃকালীন কবিতা লেখার দিকে ঝুঁকে পরে আমরা প্রথম শুনলাম দৈব আদেশ। সে আজ অনেকদিন হল, সেজন্যই কবিতা। নইলে ছিলেন তো রবীন্দ্রনাথ।

প্রদীপ চৌধুরী — পৃথিবীকে দেওয়ার মতো কোনো বাণী বা ম্যাসাজ কোনো লেখকের নেই। প্রাণ জিনিসটাই অসম্ভব। প্রাণ সৃষ্টি বিরোধী। পৃথিবীর কনসেপশনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ — এবং মৃতদেহ ছাড়া এর স্বরূপ কারুর কাছেই পরিষ্কার নয়। আমাদের সমগ্র বর্তমান বদলে গেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ ঐ একই রকম রয়ে গেছে, এক শূন্য গোঙানির দিকে আমাদের সৃষ্টি কল্পনা ঝুঁকে আছে। এই মুহূর্তের যাবতীয় ঘটনা আমাদের চোখের সামনে একই সঙ্গে জেগে ওঠে এবং মুছে যায় — এই অপ্রমাণিত ভালোবাসার সূত্রেই আমরা সারাজীবন সবকিছুর সঙ্গে ঝুলে থাকি। আমাদের অস্থিরতা, আমাদের ধ্বংস, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের উদাসীনতা — এই সবকিছুর ভেতর দিয়েই আমরা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কোনো বিচার বা বিশ্লেষণ নেই অথবা কোনো

> স্থূল আশাবাদ, কোনো নৈরাশ্য নেই — এই মুহূর্তের যাবতীয় মুখ ও মুখোশ, আমাদের ঘিরে রেখেছে যা — মনে হয় যেন এই তরল ঘটনাপ্রবাহকে অনুসরণ করাই একজন শিল্পীর কাজ, তাদের নিহিত অবয়ব, তাদের আগমন ও মুছে যাওয়ার আলো ছায়া সময়ের এই নামহীন যাত্রাকে লক্ষ্য করে যাওয়া শুধু। অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় চূর্ণ-বিচূর্ণ স্তম্ভ মিলেমিশে সব একাকার — একজন শিল্পী কি করে পৃথিবীকে রমণীয় করে তুলবে যে পৃথিবী মরতে পারছে না, তাই প্রতিদিনই মৃত্যুর অপেক্ষা করছে? কবিতা থেকে বিযুক্ত বলেই এই দুরারোগ্য অসুখ, মূল্যবোধের এই আধুনিক পতন বিরাট নাইটমেয়ারের মত আমাদের অস্তিত্বকে এত দারুণভাবে খেয়ে ফেলেছে মনে হয়। টেকনোলজি এবং ব্যবসা চুক্তির বাইরে জীবনের তৃতীয় অর্থ পরিষ্কার হয় একমাত্র কবিতাতেই। দর্শন ও আমাদের এই বিপুল অনুভূতি হননকে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। কারণ দর্শন কবিতার মতন অখণ্ড নয় — এই নামহীন যন্ত্রণা ও দিব্যচেতনাকে একসঙ্গে একই সময়ে মেলাতে পারে না দর্শন।”[১২]

এর পাশাপাশি, ‘হাংরি’ এই অভিধাটি নিয়ে অথবা এই অভিধার অর্থ নির্ধারণ নিয়ে কিংবা ‘ক্ষুধা’ এবং ‘ক্ষুধার্ত’ শব্দটিকে নিয়েও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মত প্রকাশ করেছেন একাধিক হাংরি আন্দোলনকারী। ১৩৯১ সালে *জিজ্ঞাসা* পত্রিকায় এই ‘হাংরি’ বিশেষণটি খুঁজে পাওয়ার প্রসঙ্গে মলয় রায়চৌধুরী বলেছেন, —

> “এই সময়ে, ‘মার্কসবাদের উত্তরাধিকার’ গ্রন্থটির জন্য নোটস সংগ্রহ করা কালে, আমি অস্ওয়াল্ড স্পেংলার বর্ণিত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের হদিস পাই। ওই বয়সে, স্পেংলার-এ যে আকর্ষণ আমি খুঁজে পাই, তা হলো এই উপপাদ্য যে, একটি সংস্কৃতি তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে যায় : আরোহণ, রেনেসঁস ও অবক্ষয়। প্রথম ধাপে তা সৃজনশীল এবং বাইরে থেকে কোনো প্রভাব গ্রহণ করে না, রেনেসঁসে অকল্পনীয় উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং অবক্ষয়তা বহিরাগত সংস্কৃতির মুখাপেক্ষী। সেই সময়ে ১৯৬১ সনে অবক্ষয়ের এই কনসেপ্ট বঙ্গসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত লাগসই মনে হয়। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ওরফে সর্বগ্রাস এই দার্শনিক সর্বগ্রাসে আরোপ হল চসার কথিত ‘হাংরি’। অবক্ষয়ের নির্বিচার দ্বিধাহীন আত্মসাৎ-প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য ‘হাংরি’

কথাটা। 'হাংরি' শব্দের কোনো যুতসই বাংলা আমি তখন খুঁজে পাইনি। ক্ষুধিত, ক্ষুৎকাতর, ক্ষুধার্ত-র মধ্যে হাংরির সামগ্রিক নির্ণয় পাইনি। পরে ১৯৬৪ নাগাদ আলোচকদের বিদেশী এই চেঁচামেচিকে ঠেকনো দেবার জন্য কখনো ক্ষুধিত, বা ক্ষুৎকাতর ব্যবহার করেছিলাম।"[১৩]

মলয় রায়চৌধুরী 'হাংরি' শব্দটির এরকম প্রেরণার কথা উল্লেখ করলেও হাংরির দ্বিতীয় বুলেটিন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পদ্যে 'সীমান্ত প্রস্তাব ১ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদিত' যে কবিতাটির শেষে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, —

"কবিতা ভাতের মতন কেন লোকে নিতেই পারছে না
যুদ্ধ বন্ধ হলে নেবে? ভিখারীও কবিতা বুঝেছে,
তুমি কেন বুঝবে না হে অধ্যাপক মুখ্যমন্ত্রী সেন?"[১৪]

এমনকি হাংরি জেনারেশন তৃতীয় বুলেটিন সমীর রায়চৌধুরীর লেখা 'ক্ষুৎকাতুর আক্রমণ' যার অন্যতম কথা —

"এই জীবনে আমরা প্রত্যেকেই অন্তত একটি সমান অনুভব বোধ করছি সবাই করে ক্ষুধা এমনই এক প্রাথমিক অনুভব।"[১৫]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, 'হাংরি' বা এই 'ক্ষুধার্ত' শব্দটিকে নিয়ে প্রথম থেকেই যে তত্ত্ব তৈরির চেষ্টা চলছিল, তা একাধিক ক্ষেত্রে একাধিক মাত্রা নিয়ে উপস্থিত। মলয় রায়চৌধুরী যেমন সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কনসেপ্টে একে খুঁজতে চাইছেন, তেমনই হাংরির দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বুলেটিনে নেহাতই এই ক্ষুধা খাদ্য আন্দোলন পরবর্তী ছয়ের দশকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মনে করিয়ে দেয়। বিশেষত 'মুখ্যমন্ত্রী সেন'কে উদ্দেশ্য করে হাংরির বুলেটিন দেশভাগ পরবর্তী ক্ষুধাজর্জর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের, জনজীবনের কষ্টের দিকে ইঙ্গিত করে। পরবর্তীকালে মলয় রায়চৌধুরী এবং শৈলেশ্বর ঘোষ তাঁদের একাধিক লেখালেখির মধ্য দিয়ে হাংরি আন্দোলনের মূল শর্ত বা দর্শনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৬১ থেকে '৬৪-র

বিভিন্ন সময়ে লিখিত *আমার জেনারেশনের কাব্য দর্শন* ১৯৬৫-তে প্রকাশিত হয়েছিল, হাংরি আন্দোলনের বুলেটিন *মৃত্যুমেধী শাস্ত্র* এই শিরোনাম দিয়ে। যেখানে মলয় রায়চৌধুরী শুরুতেই লিখেছিলেন, —

> "যুক্তিবাদ ও রোমান্টিসিজমের যুদ্ধ বাংলার শিল্প-সাহিত্যকে রেখে গেছে এক খাঁ খাঁ প্রান্তরে, রক্তের ধারা আরম্ভ হয়েছে সেখান থেকে, সেখান থেকে প্যারানথেসিস যুদ্ধ, পৃথিবীর মুখ বদলে দেয় না। বদলায় কৌম ও ব্যক্তিমানুষের মুখ, নিজের ও নিজের চতুর্দিকের ইমেজ তার মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় ও যেমন ভাবে পুষ্ট হয়।"[১৬]

এর আগে কবিতা রচিত হত হৃদয় দিয়ে, হৃৎপিণ্ডের ছল ছল দিয়ে, সবসময়ই কেমন যেন একটা সখী সখী ভাব নিয়ে, হাফ-আউল হাফ-বাউল সখ করে, ভেবে ভেবে। 'মৃত্যুমেধী শাস্ত্র' শিরোনামে হাংরি জেনারেশনের অন্যতম কবি মলয় রায়চৌধুরী আহ্বান জানালেন, 'কাটা হাতের যাত্রা সঙের টানাহ্যাচড়ার' মধ্যে থেকে বাংলা কবিতাকে তুলে আনতে হবে। গোটা বাংলা কবিতার মূল্যায়নে মলয়ের মতে মধুসূদন সব চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তিবাদী ও রোমান্টিকদের যুদ্ধের আগে যে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব এবং আজ পর্যন্ত তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের চেয়েও মধুসূদনের প্রবল ব্যক্তিত্ব তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর প্রাণশক্তি এক অর্থে তাঁর কবিতারও প্রাণশক্তি। বাংলা ভাষা থেকে প্রাণময়তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গিয়েছে। কেননা বাঙালি কবিরা মধুসূদনের এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন নি। মলয়ের বিচারে মধুসূদনের পর আরেকজন কবির আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর নাম জীবনানন্দ। বাংলা কবিতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণে এরকমই দৃষ্টিভঙ্গি মলয়ের। তাঁর মতে প্রথাগত ইতিহাস বিচার অর্থহীন, কেননা তা কেবলই ধারাবিবরণী। অনেকেই 'ধারাবিবরণী' আর 'ইতিহাস'-এর পার্থক্য জানে না, তাই, মলয়ের মতে কবিতা এখন বিশাল নিঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে, আর শিল্প এই মুহূর্তে 'পবিত্র সন্ত্রাসে স্নিগ্ধ'। কবিতা মার্বেল নয়, কবিতা রসেরও ব্যাপারও নয়, কবিতা আসলে কবিতা। আর সেজন্যই শব্দ-অর্থের ধাক্কাধাক্কি, ফাটাফাটি, টানাপোড়েন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আবির্ভাব হয় নিখুঁত কথা। পথ চলতি অর্থের ঢাকনি খুলে

অপূর্ব কৌটোর মধ্যে থেকে বের করে আনা গুঁড়ো হায়ারোগ্লিফ লিপি আসলে কবিতা। দিনের পর দিন বিপর্যস্ত মানুষ যেভাবে বেঁচে থাকেন, যেভাবে বেঁচে আছি এই আমরা, আমাদের জীবনের উদ্বৃত্ত জলছাপ তাই আসলে দখল করে রাখে কবিতার চিত্রভূমি। মলয়ের হিসেবে, —

"হাংরি কবিতায় আমরা যা চাইছি তা মোটামুটি এই,

এক. আমার সম্পূর্ণ আমিত্বের বর্বর আবিষ্কার,

দুই. কবিতা চলাকালীন আমার সম্মুখে আমাকে এবং আমার সমস্ত কিছুকে যত রকম ভাবে পারা যায় উপস্থাপিত করা,

তিন. কবিতায় আমাকে ঠিক সেই মুহূর্তে আটক করে ফাঁস করা যখন আমি কোনো না কোনো কারণে ফেটে পড়ছি আর আমার ভেতর দিকটা বেরিয়ে পড়েছে,

চার. নিজস্ব আমিত্ব দিয়ে প্রতিটি মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ, তারপর স্বীকার অথবা প্রত্যাখ্যান,

পাঁচ. সমস্ত কিছুকে বস্তু মনে করে আরম্ভ এবং প্রত্যেকটিকে নাড়িয়ে দেখে নেওয়া প্রাণবন্ত কিনা,

ছয়. সামনে এসে পড়া ব্যাপারকে যেমনকার তেমন গ্রহণ না করে তার প্রত্যেকটি দিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা।

সাত. পদ্যছন্দ, গদ্যছন্দ উভয়েরই অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটা সরাসরি নিজস্ব পাঠবিন্যাস ব্যবহার, যা ধাঁ করে ঢুকে যাবে যাকে বলা হচ্ছে তার মেজাজে।

আট. কথা বলার সময় যে ধরন, মাপ আর ওজনের শব্দ ব্যবহার করা হয়, কবিতাতেও অবিকল তাই।

নয়. কথা বলার সময় শব্দের ভেতরে যে ধরনের ধ্বনি পুরে দেওয়া হয়, কবিতাতেও সেই ধ্বনিকে আরও চাঁছাছোলা করে উন্মোচন করা।

দশ. পাশাপাশি দুটি শব্দের এতাবৎকালের প্রতিষ্ঠিত আঁতাত ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দেওয়া এবং তদ্দ্বারা অসবর্ণ এবং অবৈধ শব্দ এবং বাক্য তৈরি।

এগার. কবিতায় আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত সমস্ত রেডিমেড সাহায্য প্রত্যাখ্যান, আর বাইরের কোনো রকম ঘুষ না নিয়ে কবিতাকে নিজেই স্বয়ম্ভু হতে দেওয়া।

বারো. কবিতাই মানুষের সর্বশেষ ধর্ম সে ব্যাপারটা খোলাখুলি স্বীকার করা।

তের. তিরের মত বয়ানে অতিষ্ঠ ও অস্তিত্ব নঙমানস। প্রশ্নোত্তর আগাগোড়া শক্তি বার্তার মাধ্যমে ব্যক্ত করা।

চৌদ্দ. ব্যক্তিগত চরম পত্র।"[১৭]

মলয়ের খোঁজে আমি কী, আমি কে, আমি কেন, আমি কেমন করে, আমি কোথায় এই সব প্রশ্নের চোট ও বিস্ফোরণ ছাড়া কবিতার আর কিছু করার নেই। অস্তিত্বের সমস্ত অসম্ভবকে চিরে তার অন্তরমহল দেখার নিদারুণ অপ্রতিহত চেষ্টা থেকে কবিতা তৈরি হয়। তাই আমিই আমার থিম। প্রসঙ্গত মনে করব শৈলেশ্বর ঘোষও তাঁর কবিতার বিষয় বলতে গিয়ে বলেছেন, আমার কবিতার বিষয় আমি। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের এই অন্যতম দুই তাত্ত্বিক রূপকারের আলোচনা থেকে এই বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে নিয়ে আমরা তাই বলতে চাই, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের কাব্যদর্শনের অন্যতম বিষয় আসলে আত্মআবিষ্কার।

"না, মানুষের সঙ্গে আমার আর বিরোধ নেই কোনো —

এখন পাওনাদার দুর্ঘটনায় পড়লে তাকে নিয়ে যেতে পারি হাসপাতালে

প্রাক্তন প্রেমিকার স্বামীর কাছ থেকে অনায়াসে চাইতে পারি চারমিনার

দাড়ি গজানোর মত অনায়াস এ জীবনে আমি"[১৮]

১৯৮৫ সালে 'মহাদিগন্ত' থেকে প্রকাশিত *ইস্তেহার সংকলন*-কে মলয় রায়চৌধুরীর আরেকটি তত্ত্বগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। 'কবিতা', 'উদ্দেশ্য', 'ছোটগল্প', 'রাজনীতি', 'ধর্ম', 'জীবন', 'অশ্লীলতা', 'আন্দোলন' এবং 'স্বাধীনতা' পৃথক এই নয়টি রচনার সমাহারে এই বইটি এককথায় হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে মলয় রায়চৌধুরীর কাব্যদর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। 'উদ্দেশ্য' নামক লেখায় মলয় নির্দেশ দিয়েছেন অ্যারিস্টটলের বাস্তবতাকে নকল না করে নৈরাজ্যমূলক সক্রিয়তা আনতে হবে, নিজের কথা বলতে হবে। 'ছোটোগল্প' শীর্ষক লেখায় ছোটোগল্পের নতুন সংজ্ঞা দিয়ে গিয়ে মলয় বলছেন, —

> "ছোটোগল্প আসলে বর্ণনাবিরোধী সূক্ষ্ম একরকমের চোট, মানুষের ছোঁক প্রবৃত্তির প্রসার।"[১৯]

'রাজনীতি' শীর্ষক লেখায় মলয়ের বক্তব্য যে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের আত্মাকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। কোনো ধরনের রাজনীতিকে শ্রদ্ধা করা হবে না। তাই বলে রাজনীতি থেকে পালানোরও চেষ্টা করা হবে না। রাজনৈতিক বিশ্বাসের চেহারাই পালটে দেওয়া হবে। 'ধর্ম' বিষয়ে মলয়ের বক্তব্য, ঈশ্বর আসলে জঞ্জাল। ধর্ম মস্তিষ্কবিকার অথবা নেশা। —

> "ধর্ম হচ্ছে বস্তু এবং অবস্তুকে দখলে রাখার মন্তর। তাদের সঙ্গে লেপটে থেকে মানিয়ে নেওয়ার চালাকি।"[২০]

হাংরি জেনারেশনের লেখাপত্র বিষয়ে একাধিক মানুষের অভিযোগই আসলে এঁদের কবিতা, গদ্যে অশ্লীলতার ভরপুর উপস্থিতি বিষয়ে। মলয় রায়চৌধুরী এই ইস্তেহার সংকলনের অশ্লীলতা বিষয়ে নিজের বক্তব্যে বলেছেন যে অশ্লীলতা বলে কিছু নেই। একদল শ্রেণিসচেতন, ষড়যন্ত্রকারী, প্রাতিষ্ঠানিক মুরুব্বি তাদের শ্রেণিগত ধান্ধায় এই অশ্লীলতার তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন। —

> "সমাজের মালিকেরা একটা নুলো ভাষা তৈরি করে, নীচুশ্রেণির শব্দাবলীকে অস্বীকার করতে চায় যাতে বিভেদ রেখাটা পরিষ্কার থাকে।"[২১]

মলয় মনে করেন সমাজের সাধারণ ভাষার কথা বলা যদি কলুষতা ও বিকার হয়, অশ্লীলতা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অশ্লীলতাই কাম্য।

'আন্দোলন' বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আমৃত্যু কবিতা-প্রাণতার কথা এসে যায়। জীবিত লেখাই কবিতার বিষয়। জীবিত শিল্প, কবিতা মাত্রই আন্দোলন উদ্ভূত। মলয়ের কথায় —

> "ব্যক্তির নিজের জীবনই যথেষ্ট। কল্পনা অর্থাৎ বানানো গালগল্প ঢুকিয়ে কবিতার বাহার খুলবার দরকার আজকের দিনে আর নেই।"[২২]

তিনের দশকের পর থেকে বাংলা কবিতার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ এই সময়ে কবিতা যা বলেছে, তিনের কবিদের লেখার আগে থেকেই তা কোনো না কোনো ভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। আর এজন্যই হাংরি আন্দোলন। সামাজিক অভূতপূর্ব হিংস্রতা এবং ইন্দ্রিয়ের অসংযতিতে তাঁদের নতুন কবিতা রচনা।

এই সংকলনের শেষ বক্তব্য স্বাধীনতা সম্পর্কে। লেখক বা কবির স্বাধীনতা আসলে কি, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে সেই স্বাধীনতার মাপকাঠি কতদূর হতে পারে সে বিষয়ে মলয়ের ব্যক্তি মতামত পাওয়া যাবে এই রচনায়। হেনরি মিলারের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন মলয়। —

> "I do not call poets those who make verses, rhymed or un-rhymed. I call that poet who is capable of profoundly altering the world"[২৩]

ব্যবহার করেছেন আঁতোয়া আর্তোর উদ্ধৃতি —

> "The poet is a man who prefers to go mad in the social sense of the world. Rather than fourfeit a certain higher idea of human order."[২৪]

একাধিক লেখায় যৌনতার মুক্তি অথবা স্বাধীনতার প্রশ্নে গোটা বিশ্বকে বদল করার তীব্রতা ও উন্মাদনা। স্বাধীনতার প্রশ্নে সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণি তথা রাষ্ট্র তথা প্রতিষ্ঠানের চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান। আমাদের বিচারে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দিয়েই হাংরি আন্দোলন আসলে নৈরাজ্যের দর্শনের সঙ্গে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। শুধু মলয় রায়চৌধুরীই নয়, হাংরি আন্দোলন প্রসঙ্গেও যাঁরা কথা বলেছেন, তাঁদের উদ্ধৃতিতেও আমরা নৈরাজ্য সম্পর্কিত এই উচ্চারণের চিহ্ন পাবো।

ক্ষুধার্ত পত্রিকার তৃতীয় সংকলনে 'বিলম্বিত সওয়াল' নামে একটি লেখায় দেবেশ রায় তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চিহ্নিত করেছেন —

> "রাজনীতির নকশালপন্থার সঙ্গে বাসুদেবের লেখার (হয়তো সমগ্র হাংরি জেনারেশনের) দার্শনিক মিল আছে। সামাজিক ভাবে এই দুটি আন্দোলনেরই ভিত্তিভূমি নিম্নবিত্ত সমাজের হতাশা, ক্লান্তি আর অধৈর্য। দর্শনের দিক থেকে এই দুটি আন্দোলনেরই প্রতিভাভূমি তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা। আর কর্মপ্রণালীর দিক থেকে এই দুটো আন্দোলনেরই পদ্ধতি স্বতঃপ্রণোদনার ওপর নির্ভর করে। প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা এনে দেওয়া। তাই পুলিশ চিনতে ভুল করেনি যে ৬৫-৬৬ সালের এই সাহিত্য আন্দোলন বিশ্বের ক্ষেত্রে নকশালপন্থার প্রথম ইঙ্গিত। রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ক্ষেত্রের জন্য ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আরও বেশি অপেক্ষা করতে হত যদি পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী আন্দোলন রাজ্যসরকারের ক্ষমতার মদেই মাতোয়ালা হয়ে না যেত। যদি কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প হিসেবে বামপন্থী দলগুলির ওপর ভরসাটুকুও শেষ হয়ে না যেত।"[২৫]

এই উদ্ধৃতির শেষের দিকের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণকে সরিয়ে রেখেও আমরা এইটুকু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, শুধুমাত্র সাহিত্যকে ঘিরেই তাদের মতামত রেখেছিল এমন নয়। সাহিত্যকে সামনে রেখে কবিতা এবং গদ্যের বিভিন্ন ইস্তেহার রচনা করতে করতে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন আসলে ছয়ের দশকের এক বিস্তৃত কালপর্বের মানুষের হতাশা, ক্লান্তি অথবা অধৈর্যের চিৎকৃত রূপ হয়ে উঠতে পেরেছিল। আর এই রূপ হয়ে ওঠার কারণেই হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যে এত আয়োজিত বিশৃঙ্খলা, এত সুসজ্জিত নৈরাজ্য।

ইউরোপের নৈরাজ্যের ধারা থেকে শুরু করে উনিশ শতকের নৈরাজ্যবাদী একাধিক প্রকল্পনার দিকে তাকালে এটুকু অনুমান করা যায়, নৈরাজ্যের যাবতীয় দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে শিল্পের বরাবরই একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৮৬০-এ প্রুদঁ নৈরাজ্যবাদী শিল্পী গুস্তাভে করবেটের সমর্থনে প্রথম কলম ধরেছিলেন। একইরকম ভাবে

পিটার ক্রপটকিন তাঁর বিখ্যাত প্যামফ্লেট 'Appeal To The Young' ১৮৮০ সালে প্রকাশ করেছিলেন এবং শিল্পীদের আহ্বান করেছিলেন, নৈরাজ্যের পক্ষে সামিল হওয়ার জন্য। —

> "If your heart really beats in unison with that of humanity, if like a true poet you have an ear for Life, then, gazing out upon the sea of sorrow whose tide sweeps up around you face to face with these people dying of hunger, in the presence of these many corpses piled up in these mines and these mutilated bodies lying in heats on the barricades. In full view of the desperate battle which is being fought amid the cries of pain from the conquered and the orgies of the vactors, of heroism in conflict with cowardice, of novel determination face to face with contemptible cunning — you can not remain neutral. You will come and take the side of the oppressed, because, you know that the beautiful, the sublime, the spirit of life itself are on the side of those who fight for light, for humanity, for justice."[২৬]

আমরা এর পাশাপাশি মলয় রায়চৌধুরীর একটি উদ্ধৃতিকে রাখতে চাই —

> "আমি মনে করি কবিতা দেশবদল, পৃথিবীবদল, জন্মবদল, শরীর বদল, সভ্যতা বদল এবং এই সংকল্প ফেরত নেওয়া যায় না। পাঠককে প্রতিকূল করে দিয়ে ভাষার ও মনোভাবের সাহায্যে কলঙ্কিত ও প্ররোচিত না করতে পারলে তার ওপরে ছেয়ে যাওয়া যায় না। কবিতা আসলে হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক সৃজনশীলতা। অরাজকতা নয়, অভ্যুত্থান।"[২৭]

শিল্পীদের oppressed-দের পক্ষ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন ক্রপটকিন। তার প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি সময়ে কবিতাকে positive negation বা নাশকতামূলক সৃজনশীলতায় রূপান্তরিত করার কথা ভাবল হাংরি জেনারেশন। এজন্য নিজেদের কথায় বারবার নৈরাজ্যের অন্ধকার, নৈরাজ্যের চেতনা, নৈরাজ্যের শব্দ — এই কথাগুলোকে হাংরি জেনারেশনের একাধিক লেখক বা তত্ত্বনির্মাতারা ব্যবহার করেছেন অকাতরে। সামঞ্জস্য ও সংগতির সৌন্দর্যের বাইরেও অসংগত সময়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অসংগতির সৌন্দর্যকেও, অসুন্দরের সৌন্দর্যকেও, নৈরাজ্যের সৌন্দর্যকেও তুলে ধরতে চেয়েছে হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য। তাই হাংরি

জেনারেশনের কবিতায় স্বাভাবিক ভাবেই যে সৌন্দর্য আছে, আমাদের অভ্যাসের চোখে তাকে সংগত লাগে না, আপাত শৃঙ্খলাময় এই সভ্যতার সাপেক্ষে তা বিশৃঙ্খলাই বটে। —

> "সৌন্দর্য, এতকাল যাকে সৌন্দর্য বলা হয়েছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, যা দেখে অনেকের আলজিভ বলেছে 'আআহাহ্! প্রস্ফুটিত ফুল।' বলেছে 'বাঃ! জুড়ি নেই এর', সেই সৌন্দর্য আর অন্তিম এবং পরম উদ্দেশ্য এবং কাঙ্ক্ষিত নয়। কারণ বাংলা সাহিত্যের একটা বিরাট যুগ যার শেষ পঞ্চাশ ও ষাট দশকের মাঝামাঝি কোথাও মূল সৌন্দর্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ময়ূরের পালকের ওপর সুন্দরী প্রেমিকার বা সৌম্য প্রেমিকের সঙ্গে শুয়ে কোকিলের গান শুনে সারা জীবন কাটিয়ে গেল। প্রেম, দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ, সংযম, সমাজ, সংসার — এগুলি, ঐ যুদ্ধের পর, কেমন যেন ন্যাকামি আর ছেনালিতে বদলে দিয়ে গেল ঐ সময়কার কবিতা। মনে হয়, শুদ্ধ পেটেন্টেড পাউডার মাখানো ঐ ন্যালবেলে বাংলায় গাওয়া খ্যামটা ধাঁচের অমন পদ্যের জন্যই। যা দেখে অনেকে একদা দু-হাত তুলে আধুনিক বলে চিৎকার করেছিল, শীতকাঠিন্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করছিল বাংলা কবিতা।"[২৮]

এই শীতকাঠিন্য থেকে কবিতাকে তুলে আনার চেষ্টা করল হাংরি জেনারেশন —

> "ঘিলুর বীভৎস শাঁস থেকে, শাঁসের উত্তরাধিকারীহীন নৈরাজ্য থেকে, সারি সারি বিস্ময়কর শব্দপুঞ্জের ভেতরে নিক্ষিপ্ত অসংযত আত্মার অনুসন্ধানই কবিতা।"[২৯]

কবিতা এভাবেই হয়ে উঠল ছয়ের দশকে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক নৈরাজ্যের বয়ান। হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যের সৌন্দর্য বা দর্শন লিখে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আরেক জন মানুষ শৈলেশ্বর ঘোষ। 'প্রতিবাদের সাহিত্য' নামের বইটিতে তাঁর 'মুক্ত কবিতার ইস্তেহার' প্রকাশিত হয়েছে। এই ইস্তেহারটির মধ্যে হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য সম্পর্কে শৈলেশ্বর কি ভাবছেন তার আন্দাজ পাওয়া যায় —

> "কবিতা মানুষের শেষ ধর্ম।
>
> বুদ্ধ যিশু রামকৃষ্ণ নয় কবি/ কবিতা পৃথিবীকে স্বাধীন মুক্ত করতে থাকবে ক্রমশ
>
> কবিতা ব্যক্তিমানুষকে পুনরভ্যুত্থানের দিকে নিয়ে যায়

কবিতা অপরাধ চেতনা থেকে জেগে ওঠা গ্লানিহীন আত্মার সঙ্গীত — অন্ধকারে ফুটে ওঠা ফুল "[৩০]

কবিতায় কী চাইছেন শৈলেশ্বর?

"১) সমস্ত ভণ্ডামির চেহারা মেলে ধরা,

২) প্রকৃতির দাসত্ব না করা,

৩) শিল্প নামক তথাকথিত ভূষি মালে বিশ্বাস না করা,

৪) আপাদমস্তক কেবল নিজেকেই ব্যবহার করা,

৫) এস্টাব্লিশমেন্টের চাকর না হওয়া,

৬) যে কোনো প্রতিষ্ঠানকেই ঘৃণা করা,

৭) মানুষী অভিজ্ঞতার শেষ সীমা দেখে নেওয়া,

৮) সভ্যতার নোনা পলেস্তারা মুখ থেকে তুলে ফেলা,

৯) সত্যকে সরাসরি বলা,

১০) যুক্তির স্তর পার হয়ে গিয়ে দ্রষ্টা হিসেবে জীবনকে দেখা ও প্রকাশ করা,

১১) সাধারণ কথ্য ভাষাকে ব্যক্তিগত করে দুমড়ে মুচড়ে ব্যবহার করা,

১২) যা কিছু গড়ে তোলা হয়েছে তাকে সন্দেহ করা,

১৩) অভিজ্ঞতা ছাড়া সত্যকে ধরবার কোনো উপায় নাই — শুদ্ধ বুদ্ধি জীবন সত্যকে ধরতে পারে না,

১৪) সমাজ যে সব শব্দকে 'অশ্লীল' বলে বর্জন করে এবং যে চিন্তাকে দূষণীয় বলে ধিক্কার দেয়, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমসাময়িক জীবনের অনেক সত্য। এগুলিকে ব্যবহার করা, নিজেকে ক্রমাগত ভাঙা এবং মেলে ধরা, নিজেকে দেখাই জগৎকে দেখা, দেখাই জ্ঞান,

১৫) অস্তিত্বের গোপনতম প্রদেশে লুকানো যা কিছু, যা ক্রমাগত মানুষকে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়, মুখোসের দিকে নিয়ে যায়, তাকে প্রকাশ করা।

১৬) জীবনের ভয়ানক রিলেশনগুলি প্রকাশ করা,

১৭) যে জীবন দেওয়া হয়েছে তাকে ত্যাগ করে আবার নিজের স্বরূপের কাছে চলে আসা এবং সৃষ্টির মূল নিয়ম ও গতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা।

১৮) চেতনাকে অরাজক করে তুলে বুদ্ধির জগতের বাইরে বোধের জগতে চলে যাওয়া,

১৯) নার্ভ, মাথা ও সংবেদন শক্তিকে পর্যুদস্ত করে তান্ত্রিকের মত উঠে দাঁড়াতে হবে।

২০) অস্তিত্বের কেন্দ্রগত ভয়ের মূলবিন্দুকে স্পর্শ করা,

২১) মধ্যবিত্ত রুচি ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করা।

২২) সমস্ত বুর্জোয়া শিক্ষাকে অস্বীকার করা,

২৩) মৃত্যু আর যৌনতা যা মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, লেখায় সেই রুদ্ধ চেতনাকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া অবসেশনগুলিকে মুক্তি দিতে হবে। সেটাই বুর্জোয়ার বিপদ।

২৪) পৃথিবীর সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে ভয়ঙ্কর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তাকে প্রকাশ করতে হবে নিষ্ঠুর ভাবে।

২৫) জীবনকে ত্যাগ করে নয়, জীবনের কাদামাটি অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসা,

২৬) জীবনবিরোধী এই সভ্যতায় নিজেকে করে তুলতে হবে প্রতিবাদের প্রতীক।

২৭) বুর্জোয়ার সুখ ও সিকিউরিটি বর্জন করা।”[৩১]

শৈলেশ্বরের এহেন ইস্তেহারগুলি থেকে আমরা যদি কিছু মূল কথাকে তুলে নিতে চাই, কবিতা হচ্ছে অন্ধকারে ফুটে ওঠা ফুল, কিংবা কবিতার সম্পর্কে অশ্লীলতা, মধ্যবিত্ত রুচি ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করা, চেতনাকে অরাজক করে তোলা, সমাজ যে সমস্ত শব্দকে অশ্লীল বা দূষণীয় বলছে তাদেরকে বেশি করে ব্যবহার করা, সর্বোপরি স্বাধীনতার প্রশ্নে শৈলেশ্বরও একই রকম ভাবে কবিতাকে করে তুলছেন সমসাময়িক সমাজ এবং রাজনীতির সঙ্গে সংলগ্ন। এ

ইস্তেহার শুধুমাত্র কবিতাকে নিয়েই কথা বলছে তা নয়, এই ইস্তেহার আসলে অবদমন তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক যাবতীয় নিগড়ের বিরুদ্ধে একটি পক্ষ নেওয়ার ঘোষণা।

মলয় রায়চৌধুরী এবং শৈলেশ্বর ঘোষের কথা আলাদা ভাবে আলোচনা করা হল কারণ এঁরা দুজনেই হাংরি সাহিত্যের তত্ত্ব পরিসর নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। হাংরি সাহিত্যের নন্দনকে বুঝে নেওয়ার জন্য হাংরি আন্দোলনের বাকি ইস্তেহারগুলোকেও এই প্রসঙ্গে আমরা দেখে নিতে পারি।

ইস্তেহার

হাংরি জেনারেশন

কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আতস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়, নিরলস যুক্তিগ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে আবির্ভূত যে, জীবনের কোনো অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্মনিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবী-বিরোধীতার নয়, তা মানসিক, দৈহিক, শারীরিক। এ-ক্ষুধার কেবলমাত্র লালনকর্তা কবিতা, কারণ কবিতা ব্যতীত কী আছে জীবনে! মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়।

কবিতা থাকা সত্ত্বেও, অসহ্য মানবজীবনের সমস্তপ্রকার অসম্বদ্ধতা। অন্তরজগতের নিষ্কুণ্ঠ বিদ্রোহে, অন্তরাত্মার নিদারুণ বিরক্তিতে, রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে রচিত হয় কবিতা- উঃ তবু মানবজীবন কেন এমন নিষ্প্রভ ? হয়তো, কবিতা এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের অপ্রয়োজনীয় অস্তিত্ব এই সংকটের নিয়ন্ত্রক।

কবিতা বলে যাকে আমরা মনে করি, জীবনের মোহমুক্তির প্রতি ভয়ংকর আকর্ষণের ফলাফল তা কেবল নয়। ফর্মের খাঁচায় বিশ্বপ্রকৃতির ফাঁদ পেতে রাখাকে আর কবিতা বলা হয় না। এমনকী প্রত্যাখ্যাত পৃথিবী থেকে পরিত্রাণের পথরূপেও

কবিতার ব্যবহার এখন হাস্যকর। ইচ্ছে করে, সচেতনতায়, সম্পূর্ণরূপে আরণ্যকতার বর্বরতার মধ্যে মুক্ত কাব্যিক প্রজ্ঞার নিষ্ঠুরতার দাবির কাছে আত্মসমর্পণই কবিতা। সমস্ত প্রকার নিষিদ্ধতার মধ্যে তাই পাওয়া যাবে অন্তরজগতের গুপ্তধন। কেবল, কেবল কবিতা থাকবে আত্মায়।

ছন্দে গদ্য লেখার খেলাকে কবিতা নাম দিয়ে চালাবার খেলা এবার শেষ হওয়া প্রয়োজন। টেবলল্যাম্প ও সিগারেট জ্বালিয়ে, সেরিব্রাল কর্টেকসে কলম ডুবিয়ে, কবিতা বানাবার কাল শেষ হয়ে গেছে। এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে। সেহেতু এস্নু বলাৎকারের পরমুহূর্তে কিংবা বিষ খেয়ে অথবা জলে ডুবে 'সচেতনভাবে বিহ্বল' হলেই, এখন কবিতা সৃষ্টি সম্ভব। শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত। শখ করে, ভেবে-ভেবে, ছন্দে গদ্য লেখা হয়ত সম্ভব, কিন্তু কবিতা রচনা তেমন করে কোনোদিনই সম্ভব নয়। অর্থব্যঞ্জনা ঘন হোক অথবা ধ্বনি-পারম্পর্যে শ্রুতিমধুর, বিক্ষুব্ধ প্রবল চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি না থাকলে, কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা, ও ঈশ্বরীর মতো অনুন্মেষিনী হয়ে যেতে পারে।

হাংরি বুলেটিন

1st Hungry Bulletin

WEEKLY MANIFESTO OF THE HUNGRY GENERATION

Creator : Malay Roychoudhury

Leader : Shakti Chatterjee

Editor : Debi Rai

Poetry is no more a civilizing manoeuvre, a replanting of the bamboozled gardens; it is a holocaust, a violent and somnambulistic jazzing of the hymning five, a sowing of tempestual hunger.

Poetry is an activity of the narcissistic spirit. Naturally, we have discarded the blankely-blank school of modern poetry, the darling of the press, where poetry does not resurrect itself in a orgasmic flow, but words come up bubbling in an artificial muddle. In the prosed-rhyme

of those born-old half-literates, you must fail to find that scream of desperation of a thing wanting to be man, the man wanting to be spirit.

Poetry of the younger generation too has died in the dressing room, as most of the younger prosed-rhyme writers, afraid of the Satanism, the vomitous horror, the self-elected crucification of the artist that makes a man a poet, fled away to hide in the hairs.

Poetry from Achintya and Ananda and from Alokaranjan to Indraneel, has been cryptic, short-hand, cautiously glamours, flattered by won sensitivity like a public school prodigy. Saturated with self-consciousness, poems have begun to appear from the tomb of logic or the lier of unsexed rhetoric.

Published by Haradhan Dhara from 269 Netaji Subhas road, Howrah, West Bengal, India.

হাংরি আন্দোলনের ইশতিহার

১) আমার সম্পূর্ণ অহং-এর খাঁটি আবিষ্কার।

২) কবিতা চলাকালীন আমার সম্মুখে আমাকে এবং আমার সমস্ত কিছুকে যত রকমভাবে পারা উপস্থিত করা।

৩) কবিতায় আমাকে ঠিক সেই মুহূর্তে আটক করে ফাঁস-করা যখন আমি কোনো-না-কোনো কারণে ফেটে পড়েছি আর আমার ভেতর দিকটা বেরিয়ে পড়েছে।

৪) নিজস্ব অহং দিয়ে প্রতিটি মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ, তারপর স্বীকার অথবা প্রত্যাখ্যান।

৫) সমস্ত কিছুকে বস্তু মনে করে আরম্ভ, এবং প্রত্যেকটি নাড়িয়ে দেখে নেওয়া যে তা প্রাণবন্ত কিনা।

৬) সামনে এসে পড়া ব্যাপারকে হুবহু গ্রহণ না করে তার প্রত্যেকটি দিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা।

৭) পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দ উভয়েরই অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটা সহজসরল নিজস্ব শৈলীর ব্যবহার যা ধাঁ করে ঢুকে যাবে যাকে জানান হচ্ছে তার মেজাজে।

৮) কথা বলার সময় যে ধরন, মাপ আর ওজনের শব্দ ব্যবহার করা হয়, কবিতাতেও অবিকল তাই।

৯) কথা-বলার সময়ে শব্দের ভেতরে যে-ধরনের ধ্বনি পুরে দেওয়া হয়, কবিতাকে সেই ধ্বনিতে আরও চাঁছাচোলা করে উদঘাটন করা।

১০) পাশাপাশি দুটি শব্দের এতাবৎকালের প্রতিষ্ঠিত আঁতাত ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দেওয়া তদ্বারা অসবর্ণ ও অবৈধ শব্দ এবং বাক্য তৈরি।

১১) কবিতায় আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত সমস্ত সাহায্য প্রত্যাখ্যান, আর বাইরের কোনোরকম ঘুষ না দিয়ে কবিতাকে নিজেই মৌলিক হতে দেওয়া।

১২) কবিতাই মানুষের সর্বশেষ ধর্ম, সে-ব্যাপারটা খোলাখুলি স্বীকার করা।

১৩) তীরের মতো বয়ানে অতিষ্ঠ-অস্তিত্ব, বিবমিষা, বিরাগ আগাগোড়া তীব্রভাবে জানান।

১৪) অন্তিম প্রাতিস্বিকতা।

হাংরি জেনারেশন নং ১০

হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইশতিহার

১) অ্যারিস্টটলের বাস্তবতাকে কখনও নকল করা হবে না, কিন্তু বলাৎপ্রস্তুতির মাধ্যমে আচমকা জাপটে ধরতে হবে অপ্রস্তুত ছেনালি অস্তি।

২) নৈঃশব্দকে অটুট রেখে নির্বাককে বাঙ্ময় হয়ে উঠতে হবে।

৩) ঠিক সেই-রকম সৃষ্টি উন্মার্গে চালিত হতে হবে যাতে আগে থাকতে তৈরি পৃথিবীকে চুরমার করে পুনর্বার বিশৃঙ্খলা থেকে শুরু করা যায়।

৪) লেখকের চেতনাকে বর্জন করে প্রতিটি অন্য বোধ-জরায়ুকে কাজে লাগান হবে।

৫) ফাঁস করে দেওয়া হবে যে, কেবল কান্তি-সত্তা হিসেবেই জীবন ও অস্তিত্ব স্বীকৃত।

৬) অন্যের প্রদত্ত বোধ-জ্ঞানের চেয়ে বরং সমস্ত-রকম সন্দেহ ও অসহায়তাকে গ্রহণ করা হবে।

৭) দ্বিপদ উন্নতিকামী প্রাণীদের তাবৎ মূল্যবোধকে আক্রমণ করে ছারখার করা হবে।

৮) চরম সততার উদ্দেশ্য সবরকম চাটুকারদের মাগিদের শপথপূর্বক পরিত্যাগ করা হবে।

৯) আত্ম-আবিষ্কারের পর লেখা আর আঁকা ছেড়ে দেয়া হবে।

হাংরি জেনারেশন নং ১৫

হাংরি আন্দোলনের রাজনৈতিক ইশতিহার

১) প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের আত্মাকে রাজনীতিমুক্ত করা হবে।

২) প্রাতিস্বিক মানুষকে বোঝান হবে যে অস্তিত্ব প্রাক-রাজনৈতিক।

৩) ইতিহাস দিয়ে বোঝান হবে যে, রাজনীতি আহ্বান করে আঁস্তাকুড়ের মানুষকে, তার সেবার জন্যে টানে নান্দনিক ফালতুদের।

৪) এটা খোলসা করে দেয়া হবে যে গান্ধির মৃত্যুর পর এলিট ও রাজনীতিকদের মধ্যে তুলনা অসম্ভব।

৫) এই মতামত ঘোষণা করা হবে যে রাজনৈতিক তত্ত্ব নামের সমস্ত বিদগ্ধ বলাৎকর্ম আসলে জঘন্য দায়িত্বহীনতা থেকে চাগিয়ে-ওঠা মারাত্মক এবং মহান জোচ্চুরি।

৬) বেশ্যার মৃতদেহ এবং গর্দভের লেজের মাঝামাঝি কোথাও সেই স্থানটা দেখিয়ে দেয়া হবে যেটা বর্তমান সমাজে একজন রাজনীতিকের।

৭) কখনও একজন রাজনীতিককে শ্রদ্ধা করা হবে না তা সে যে-কোনো প্রজাতি বা অবয়বী হোক না কেন।

৮) কখনও রাজনীতি থেকে পালান হবে না এবং সেইসঙ্গে আমাদের কান্তি-অস্তিত্ব থেকে পালাতে দেওয়া হবে না রাজনীতিকে।

৯) রাজনৈতিক বিশ্বাসের চেহারা পালটে দেয়া হবে।

হাংরি জেনারেশন নং ৪৮

অনিল করঞ্জাই এবং করুণানিধান মুখোপাধ্যায় লিখিত

হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইশতিহার

সৃজনের প্রধান কাজ হল মানুষকে তার জীবনসংগ্রামে অনুপ্রাণিত করা। একজন চিত্রকর বিভিন্ন উপায়ে তাঁর সৃজনের মাধ্যমে এ-কাজ করতে পারেন। আমাদের প্রধান কাজ হল জীবনের সেই দিকগুলোর দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেগুলো আর্থসামাজিক অবস্থার জন্য অবহেলিত। একজন, চিত্রকর, অন্য সবায়ের মতই, জনগণের অংশ। তাই তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

সম্মিলিতের সমর্থন ছাড়া একজন চিত্রকর তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারেন না। আমাদের বর্তমান সমাজে যেখানে চবি আঁকার পৃষ্টপোষকতা প্রধানত ধনিক বর্গের কাছ থেকে আসে, বহু চিত্রকর তাঁদের পৃষ্টপোষকদের তত্ত্ববিশ্বে বশীভূত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। চিত্রকরের নৈতিক সাহস প্রয়োজন। তাঁর উচিত এই সমাজের ক্ষমতাধারীদের পৃষ্টপোষকতা বর্জন করে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকা।

ছবি আঁকা এমন একটি লোকায়ত মাধ্যম যার দ্বারা কোনোপ্রকার আপোস না করে সৃজনকর্মকে বৃহত্তর জনগণের কাচে পৌঁছে দিয়ে শিল্পের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরা যায়। একটি পেইনটিং বা ড্রইংয়ের প্রতিলিপি সূচনা হিসাবে কার্যকর হতে পারে কিন্তু তাতে মূল ছবির সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। তা ছবিটির বাস্তবকে বিকৃত করে। অন্যদিকে, চিত্রকর যেহেতু একটি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টির জন্য সম্মোহন ও কল্পনা করেন, তাতে সেরকম সুপ্ত বিবাদ থাকে না।

আত্মসম্মানবোধহীন চিত্রকর, নিজের কথা ভুলে গিয়ে, ধনী পুত্রকন্যাদের কথা মাথায় রেখে কেবল পার্থিব স্বাচ্চন্দ্য সুনশ্চিত করেন, তাদের রুচি ও প্রয়োজন আয়ত্ত করেন। হাংরি জেনারেশনের চিত্রকর সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর তুলির ডগায় আছে আলো। চিত্রকর হলেন আমাদের সমাজের বিবেক-রক্ষক, দ্রষ্টা, জাদুকর, অশুভের বিনাশকারী। ছবি আঁকার ভাণ করা অমার্জনীয়।

হাংরি জেনারেশন নং ৬৫

হাংরি আন্দোলনের ধর্মসম্পর্কিত ইশতিহার

১) ঈশ্বর জঞ্জাল।

২) মানুষের ভেতর ও বাইরের স্বখাদক-প্রণালীর দ্বন্দ্ব হল ধর্ম যা আত্মরেতঃপাত থেকে ঘোর কান্ডজ্ঞানহীনতায় মানুষকে নিয়ে যায়।

৩) ধর্ম ওরফে গারদস্থিত আমি, যে, ঈশ্বরকে মুন্ডু দিয়ে হাঁটতে শেখায়।

৪) ধর্ম হল খুন, ধর্ষণ, নেশা, অজাচার, বিষ, বলাৎকার, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, আসক্তি, অনিদ্রা, রূপান্তর এবং 'আমি চালিয়ে যাই'।

৫) ধর্ম হল বস্তু ও অবস্তুকে দখলে রাখার মন্তর, তাদের সাথে লেপটে থেকে মানিয়ে নেবার চালাকি। শ্রেষ্ঠ মানুষই নিজেকে শূন্যগর্ভ করে রাখে যাতে সমস্ত কিছু তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে ততক্ষণ সব-ই গ্রহণ করতে থাকে যতক্ষণ না সে নিজেই তাদের নায়ক হয়ে উঠছে।

৬) ধর্ম হল নঙদাসের আত্মফোঁপর।

৭) ধর্ম হল একটা বিশাল যৌনগহ্বর যা থেকে বের হয় আত্মহত্যার ক্ষিপ্ত অসুস্থতা যা আমার নিজত্বকে গেঁথে তোলে।

৮) ধর্ম একরকমের আইন যা ঘোষণা করে : যে নিজের রক্তমাংসে না বেঁচে অন্যের বানানো বিশ্বাস বাঁচে সে কুকুর।

৯) ধর্ম মানে আমার সঙ্গে আমি, আমার আমি, আমার থেকেই আমি, আমার দ্বারা আমি, আমাকে বাদ দিয়ে আমি, এবং আমিই আমি।

Hungry Generation Bulletin No. 15

The political Manifesto of Hungryalist Movement

1. To depoliticize the soul of each solitary individual.
2. To let every individual realize that existence is pre-political.

3. To let it be noted historically that politics invites the man of the third quality, aesthetically the most lowest substratum of society, at its service.
4. To make it clear that the conceptions of Elite and that of the politician differ absolutely after the death of Gandhi.
5. To declare the belief that all intellectual fakeries called political theory are essentially the founts of fatal and seductive lies erupting out of abominable irresponsibility.
6. To demarcate the actual position of a politician in a modern society, somewhere between the dead body of a harlot and a donkey's tail.
7. To never respect a politician, to whatever species or organism he may belong to.
8. To never escape from politics, and at the same time, neither let politics escape from the terror of our aesthetic being.
9. To remodel the basis upon which political creeds are founded.

MANIFESTO OF THE HUNGRY GENERATION

1. The merciless exposure of the self in its entirety.
2. To present in all nakedness all aspects of the self and things before it.
3. To catch a glimpse of the exploded self at a particular moment.
4. To challenge every value with a view to accepting or rejecting the same.
5. To consider everything at the start to be nothing but 'thing' with a view to testing whether it is living or lifeless.
6. Not to take reality as it is but to examine it in all its aspects.
7. To seek to find out a mode of communication, by abolishing the accepted modes of prose and poetry which would instantly establish communication between the poet and his reader.
8. To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation.
9. To reveal the sound of the word, used in ordinary conversation, more sharply in the poem.
10. To break loose the traditional association of words and to coin unconventional and here-to-fore unaccepted combination of words.

11. To reject traditional forms of poetry, and allow poetry to-take its original forms.
12. To admit without qualification that poetry is the ultimate religion of man.
13. To transmit dynamically the message of the restless existence and the sense of disgust in a razor-sharp language.
14. Personal ultimatum.[৩২]

যূথবদ্ধ আন্দোলনের সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে এই ইস্তেহারগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এই ইস্তেহারগুলি সাহিত্যে যেমন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জুড়ে দিয়েছে, তেমনই প্রতিবাদের স্পর্ধাকে আহ্বান করেছে। এই আন্দোলনের 'ভাষাচিন্তা' হল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মধ্য দিয়ে এর নৈরাজ্যিক প্রবণতা বুঝে নিতে পারি। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন 'ক্ষমতার ভাষা'কে চ্যালেঞ্জ করেছে ও তাকে উৎখাত করার কথা বলেছে —

"For anarchists, language is not just the passive 'repetition of familiar signs' (Vanigem 1994 : 101); it is also an 'action' (Goodman 1946b : 248)."[৩৩]

ভাষার অস্ত্র দিয়ে একদল মানুষ বাকি মানুষদের শাসন করছে। নিরাজ সমাজব্যবস্থার জন্য যেমন রাষ্ট্র, আইন, আদালত, ইত্যাদির উচ্ছেদ প্রয়োজন, তেমনই সাহিত্যের স্বাধীনতার জন্যও আধিপত্যবাদী ক্ষমতার ভাষাকে উচ্ছেদ করা দরকার। হাংরিদের কাছেও ভাষা তাই নেহাৎ পয়ার, দলবৃত্তে, যতিচিহ্নে, অনুচ্ছেদে সাজিয়ে পেশ করার জিনিস নয়— 'its an action'।

"হিমাঙ্কের ঘাড়ে ভর করে ডিসেম্বর পঁচিশের শীর্ষে এগিয়ে যায় রাত — ড্রাম বাজে, দামামা - বেল, ঘণ্টা টুপী ওড়াওড়ি করে — রুমাল — আলো আছড়াপাছাড়ি খায় — ক্যারল সঙ্গীত — মদ মেয়ে আলো ক্যারল ১০ কোটির হাতে ক্রমশ নোনা হতে থাকে — মেসিয়া —

প্রকৃতি পেষাই হতে থাকে উহাদের চাপে, আস্ফালনে — যীশু, গরিবের শিশু ওই — 'দুধে ভাতে'"[৩৪]

হাংরি আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার যতগুলি প্রকল্প প্রকাশিত হয়েছে তার একটিতেও এই আন্দোলনকে গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করা হয় নি। কারণ প্রচলিত কোনো তত্ত্বের ভিত্তিতে এদের ব্যাখ্যা করা যায় না, অভ্যাসের সৌন্দর্যবোধ নিয়েও এদের দিকে তাকানো যায় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রতিবাদের সাহিত্য বেঁচে আছে। কেননা, —

> "জীবনের নৈরাজ্যকে আক্রমণ করতে হলে কবিকেও নিতে হয় এক নৈরাজ্যের পথ। ...প্রচলিত বিশ্বাস, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, মানবিক সম্পর্কগুলিকে সে অস্বীকার করে নিজের সত্য চেহারা দেখতে চায়। এই অস্বীকারই নৈরাজ্য।"[৩৫]

যতদিন বাধ্যতার প্রাতিষ্ঠানিক ফতোয়া থাকবে, ততদিন বেঁচে থাকবে অবাধ্যতার চিহ্ন। হাংরি জেনারেশন-এর পরবর্তী কয়েক দশক জুড়ে একাধিক সাহিত্য আন্দোলনে উত্তাল বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালেই হাংরিদের অস্বীকারের সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নৈরাজ্যের নন্দনতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, অতীন্দ্র, ১৯৫৩ : ৩০৯

২. Antliff, Allan, 2007 : 133

৩. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা.), ২০১১ : ৯

৪. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ২০১৯ : ৩৬

৫. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, ২০১৭ : ৩২

৬. তদেব : ৩২

৭. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা.), ২০১১ : ২৮

৮. তদেব : ১১৮

৯. মিশ্র, বৈদ্যনাথ (সম্পা.), মার্চ–এপ্রিল ২০১৫ : ১৭

১০. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা.), ২০১১ : ১৫০

১১. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৯৪ : ৬৮

১২. চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার, ২০১৫ : ৩১৩

১৩. রায়, শিবনারায়ণ (সম্পা.), ১৯৯২ : ৫৭

১৪. দাস, উত্তম, ২০১৩ : ১১

১৫. তদেব : ১১

১৬. চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার (সম্পা.), ২০১৫ : ৩৪৭

১৭. তদেব : ৩৫৮

১৮. মিশ্র, বৈদ্যনাথ (সম্পা.), মার্চ-এপ্রিল ২০১৫ : ৩৫

১৯. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৮৫ : ১৮

২০. তদেব : ১০

২১. তদেব : ২৯

২২. তদেব : ৩৯

২৩. তদেব : ৪৮

২৪. তদেব : ৪৮

২৫. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা.), ২০১১ : ১৭৬

২৬. Antliff, Allan, 2007 : 12-13

২৭. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৮৫ : ৫৩

২৮. চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার (সম্পা.), ২০১৩ : ৩৪৯

২৯. তদেব : ৩৫০

৩০. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ২০১২ : ১৮

৩১. তদেব : ১৮-১৯

৩২. চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার (সম্পা.), ২০১৩ : ১১২-১১৮

৩৩. 'What is Anarchist Literary Theory?' by Jesse Cohn, https://www.academia.edu

৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০১৭ : ১৯৫

৩৫. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৯৫ : ১০৮

পঞ্চম অধ্যায়

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন : উত্তরকালে প্রভাব

৩ মে ১৯৬৫ কে বলা যায় হাংরি আন্দোলন ভেঙে যাওয়ার দিন। অর্থাৎ হাংরি আন্দোলনের জীবনকাল মোটামুটি ১৯৬১-৬৫।[১] মলয় রায়চৌধুরী এরকম মনে করেছিলেন কারণ তাঁর মতে এরপর বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। এই আন্দোলনকে যদি একটি যূথবদ্ধ প্রক্রিয়া হিসেবে ধরে নিই, তাহলে একজন মানুষের এরকম একটি নির্দিষ্ট দিনকে আন্দোলনের শুরু অথবা সমাপ্তি দিন হিসেবে ঘোষণা আমাদের কাছে অসংগত লাগে। অনুমান করা যায় বন্ধুদের দেওয়া মুচলেকা কিংবা তথাকথিত 'বিশ্বাসঘাতকতা' মলয় রায়চৌধুরীকে এই ঘোষণা করতে প্রেরণা দিয়েছিল। ১৯৬৫-তে স্তিমিত হয়ে গেলেও হাংরি আন্দোলন রেখে গেছে সঞ্চিত পলির দাগ যা বাংলা সাহিত্যকে পরবর্তী সময়ে দিয়েছে একের পর এক আন্দোলনের প্রেরণা। বিশেষত ১৯৬৫-র পর প্রকাশিত একাধিক স্বঘোষিত হাংরি পত্রিকা বা লেখালেখি এতটুকু জানান দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে এই আন্দোলন অথবা এই আন্দোলনের গর্ভ থেকে উঠে আসা নৈরাজ্যের সৌন্দর্য বাংলা সাহিত্যে ছাপ রেখে গেছে তার উত্তরকালেও।

১৯৬৭ সালের মধ্যে মলয় রায়চৌধুরী সম্পাদিত *জেব্রা* পত্রিকার দ্বিতীয় তথা শেষ সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে *হাংরি জেনারেশন স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত* পত্রিকাটি বার হয় বাসুদেব দাশগুপ্তের সম্পাদনায় অশোকনগর উত্তর চব্বিশ পরগণা থেকে। ১৯৭২-৭৩ এ প্রকাশিত দ্বিতীয় সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুভাষ ঘোষ। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা যথাক্রমে ১৯৭৫, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৮১ ও ১৯৮৪ তে প্রকাশিত হয়। প্রথম *ক্ষুধার্ত* পত্রিকা প্রকাশিত হবার সময়কালে *ক্ষুধার্ত চেতনা* বহনকারি ৫৭ টি পত্রিকার উল্লেখ করেছেন শৈলেশ্বর ঘোষ।[২]

১. *স্বকাল* (প্রদীপ চৌধুরী, ত্রিপুরা- এটি ২০ বৎসর কাল সক্রিয় ছিল)

২. *ফুঃ* (প্রদীপ চৌধুরী, ত্রিপুরা)

৩. *ক্ষুধার্ত খবর* (সুভাষ ঘোষ, চন্দননগর)

৪. *ক্ষুধার্ত-স্বকাল* (প্রদীপ চৌধুরী, ত্রিপুরা)

৫. *ক্ষুধার্ত সময়* (সাত্ত্বিক নন্দী, কলকাতা)

৬. *জিরাফ* (অরুণেশ ঘোষ, কোচবিহার)

৭. *কারুবাসনা* (সব্যসাচী সেন, কলকাতা)

৮. *নিষাদ* (সুবীর মুখোপাধ্যায়, কলকাতা)

৯. *বিকল্প সাহিত্য* (প্রদীপ চৌধুরী, কলকাতা)

১০. *কুরুক্ষেত্র* (সমীরণ ঘোষ, শিলিগুড়ি)

১১. *উত্তরকাল-এই বিষ অর্জুন-*(শুভঙ্কর দাস, কলকাতা)

১২. *উদ্বাস্তু* (অশেষ রায়, কলকাতা)

১৩. *বর্ণ পরিচয়* (ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা)

১৪. *মানুষের বাচ্চা* (সুব্রত সেন, কলকাতা)

১৫. *দন্দশূক* (সূর্য মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর)

১৬. *ফুঃ দ্বিভাষিক* (প্রদীপ চৌধুরী, কলকাতা)

১৭. *অজ্ঞাতবাস* (অরুণ বসু, নবদ্বীপ)

১৮. *উলুখড়* (প্রিতম মুখোপাধ্যায়, হাওড়া)

১৯. *সমবেত আর্তনাদ* (শুভঙ্কর দাশ, কলকাতা)

২০. *আর্তনাদ* (দেবী রায় চৌধুরী, ত্রিপুরা)

২১. *দশদিগন্ত* (আশিষ ভট্টাচার্য, কোচবিহার)

২২. *কনসেনট্রেশন ক্যাম্প* (রাজা সরকার, শিলিগুড়ি)

২৩. *মমার্ত* (সাত্ত্বিক নন্দী, ত্রিপুরা)

২৪. *মত্ত নীল ডানা* (অরূপ দত্ত, ত্রিপুরা)

২৫. *জঠর* (শঙ্খপল্লব আদিত্য, ত্রিপুরা)

২৬. *আস্পর্দ্ধা* (সোমা ভট্টাচার্য, কলকাতা)

২৭. *জখম* (রত্নময় দে, ত্রিপুরা)

২৮. *কালামাটি* (অজিত রায়, আসানসোল)

২৯. *পাগলা ঘোড়া* (বিজয় দে, জলপাইগুড়ি)

৩০. *খনন* (সুকুমার চৌধুরী, নাগপুর)

৩১. *অনার্য* (সেলিম মুস্তাফা, ত্রিপুরা)

৩২. *টার্মিনাস* (অনুভব সরকার, মাথাভাঙা)

৩৩. *সময়সূত্র* (মলয় ঘোষ, জলপাইগুড়ি)

৩৪. *পাঁক ঘেটে পাতালে* (তড়িৎ চৌধুরী, গৌহাটী)

৩৫. *নিম সাহিত্য* (মৃণাল বণিক, দুর্গাপুর)

৩৬. *রোবট* (জীবতোষ দাস, কোচবিহার)

৩৭. *শব্দভেদী* (অশোক অধিকারী, কলকাতা)

৩৮. *গেরিলা* (অরুণ বণিক, ত্রিপুরা)

৩৯. *সৃজন* (সুমিতেশ ঘোষ, কোচবিহার)

৪০. *কবিতা ক্রিয়া ইন্ডিয়ানা* (উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়)

৪১. *BAD* (তপন পালিত, কলকাতা)

৪২. *ক্রমশ* (অলোক গোস্বামী, শিলিগুড়ি)

৪৩. *কবিতা পত্র সংবর্ত* (সমর ঘোষ, অশোক নগর)

৪৪. *এখন এ-রকম* (ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা)

৪৫. *তৌর্যতিক* (মলয় মজুমদার, শিলিগুড়ি)

৪৬. *সাপ্তাহিক গ্রাফিত্তি* (শর্মী পান্ডে, কলকাতা)

৪৭. *একলব্য* (দেবব্রত ভট্টাচার্য, কোচবিহার)

৪৮. *বাইসন* (শ্যামল রায়চৌধুরী ও প্রদীপ দত্ত চৌধুরী, ত্রিপুরা)

৪৯. *ঢিল* (রত্নময় দে, ত্রিপুরা)

৫০. *ঋদ্ধ* (সুব্রত পাল, নবদ্বীপ)

৫১. *ব্যাস* (স্নিগ্ধন্দু ভট্টাচার্য ও অনমিত্র রায়, কলকাতা)

৫২. *তিতির* (সঞ্জয় সাহা, মাথাভাঙা)

৫৩. *চিদাত্মা* (অরূপ দত্ত, ত্রিপুরা)

৫৪. *প্রস্তুতিপর্ব* (শুভেন্দু সমাজদার, বালুরঘাট)

৫৫. *দ্রোহ* (দিবাকর ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়ি)

৫৬. *প্রতিসর্গ* (অশোক অধিকারী, কলকাতা)

৫৭. *নান্দিমুখ* (স্বপন সেনগুপ্ত, ত্রিপুরা)

এই সমস্ত পত্রপত্রিকা কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এমন কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও গল্প, কবিতায় হাংরি দর্শন কে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট ছিল। হাংরি জেনারেশন যেন একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তীব্র চিৎকারে, আর্তনাদে, লাগামহীনতার ব্যাকরণে। এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের শরীরে যে ছিদ্রগুলি করতে সমর্থ হয়েছিল তারই মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল ভবিষ্যতের আরও একাধিক সাহিত্য আন্দোলন। ১৯৬৫ সালে পাঁচ তরুণ কবি পুস্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, অনন্ত দাস, পরেশ মণ্ডল ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায় — এঁদের যৌথ আন্দোলনের শরিক হয়ে 'শ্রুতি আন্দোলন' আত্মপ্রকাশ করে *শ্রুতি* পত্রিকার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৫ -র এপ্রিল মাস থেকে ১৯৭১ এর আগস্ট মাস পর্যন্ত মোট ১৪-টি সংখ্যায় বাংলা

কবিতা বিষয়ক একাধিক প্রস্তাবনা ও ইস্তেহার প্রকাশিত হয়। কেন এই শ্রুতি আন্দোলন তার উত্তর দিতে গিয়ে তাত্ত্বিক নেতা পুস্কর দাশগুপ্ত বলেছেন—

> "প্রচলিত আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আমরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিছু চমক আর চটক মিশিয়ে ছাপার মতো 'আধুনিক কবিতা' লেখা যে খুব সহজ ব্যাপার, কিছুদিনের ছন্দ-মিলের চর্চার পর তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। আর এই বাংলাদেশে, আর যাই কঠিন হোক না কেন আধুনিকতার তৈরি ডিকশন মেনে চলনসই কবিতা ছাপানোটা মোটেই শক্ত নয়। আমরাও এরকম কবিতা নিয়ে, ছাপিয়ে অবশেষে ক্লান্ত এবং বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লাম। আমরা এই গতানুগতিকতার চর্চা থেকে বেরিয়ে সব কিছু পাল্টে দিতে, কবিতাকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে চাইলাম। আমরা কয়েকজন, যারা কবিতা লেখার সূত্রের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম – নতুন করে কবিতা লেখার প্রেরণায়, মানসিকতার সাধর্ম্যে ঘনিষ্ট হয়েছিলাম ; আমরা কয়েকজন যারা কফিখানায়, চায়ের টেবিলে, পথের ভিড়ে চলতে চলতে কবিতার নতুন পথের কথা ভাবলাম, তা নিয়ে আলোচনা করতাম, তর্ক করতাম। নতুন করে কবিতা লেখার তাগিদে আমরা মিলিত হলাম। অবশেষে আমাদের চিন্তা এবং চেষ্টা এক হল। শ্রুতি বেরোল। প্রচলিত আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে 'শ্রুতি' প্রথম প্রতিবাদ—"[৩]

শ্রুতি আন্দোলনে গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবিতাকে ভেঙেচুরে গড়ার স্পর্ধা ছিল, সর্বোপরি ছিল আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। হাংরি আন্দোলনের মতই একাধিক ইস্তেহার প্রকাশ করে শ্রুতির কবিরা কবিতা সম্পর্কে তাদের অবস্থান বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথম ইস্তেহার -

> "একদঙ্গল কবির পাঠ্য-অপাঠ্য রাশি রাশি কবিতা ছাপিয়ে সাহিত্য-সমাজে সামাজিকতা করার উদ্দেশ্য শ্রুতির নেই। শ্রুতির কিছু নির্দিষ্ট লেখক আছে, আর কবিতার স্পষ্ট নিজস্বতা এবং ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র সত্বেও তাঁদের কবিতা বিষয়ক বিশ্বাস ও চিন্তার কিছু মৌলিক মিল রয়েছে। এরই ভিত্তিতে এসব তরুণ কবি এসময়ে কবিতার ক্ষেত্রে অক্ষম কলরব এবং আশিক্ষিত হুজুগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাব্য-আন্দোলনের প্রয়াসী। শ্রুতি এই প্রচেষ্টার মাধ্যম। ইতিপূর্বে প্রকাশিত শ্রুতির

চারটি সংখ্যা এবং আলাদা একটা ঘোষণাপত্রে কবিতা সম্পর্কে যে সব প্রত্যয়ের কথা বলা হয়েছে তা খুব সংক্ষেপে এভাবে উপস্থিত করা যায় :

১. কোনো রকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই।

২. চিৎকার বা বিবৃতি-এর কোনোটাই কবিতা নয়। রাজনীতি প্ররোচিত সামাজিকতা বা ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর জৈবমত্তার স্থান আর যেখানেই থাকুক কবিতায় নেই।

৩. ব্যক্তির কল্পনাময় আন্তরিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রকাশে ব্যক্তিত্বের পরিমন্ডল রচনাই কবিতা। তাই কবিতা হবে – ব্যক্তিগত মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী।

৪. এছাড়া কবিতায় কোনো একমুখী বক্তব্য বা একটিমাত্র বিষয় থাকে না, থাকে বহু অনুভবের মিলনে জটিল উপলব্ধির আবহ।

৫. ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য দরকার ব্যক্তিগত রচনারীতি। আর রচনাপদ্ধতি এবং রচনার বিষয় অবিচ্ছেদ্য। তাই বিবৃতধর্মী জীর্ণ প্রকাশ পদ্ধতি ত্যাগ করে সবসময় উপযুক্ত প্রকাশ-রীতি খুঁজতে হবে, যার মাধ্যমে রচনা করা যায় যে ব্যক্তিত্যের সেই রহস্যময় পরিমন্ডল যাতে থাকে দৃশ্য-শব্দ-স্বাদ-স্পর্শের ব্যাখ্যাতীত সমন্বয়।

৬. সবশেষে বলা দরকার যে চরিত্রের স্থবিরতার চেয়ে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীলতাই আমাদের লক্ষ্য। এবং এসব বিশ্বাসে স্বাভাবিক সমর্থন রয়েছে এরকম তরুণ কবিরা শ্রুতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাতে পারেন। কবিতা ভালো হয়েছে কিনা এটাই কবিতা ছাপানোর ব্যপারে প্রথম বিচার্য এবং সে ব্যাপারে শ্রুতির পরিচালকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।”[৪]

শ্রুতির দ্বিতীয় ইস্তেহার-

“ভেঙে ফেলতে হবে সমস্ত প্রথার শাসন, ছিন্ন করতে হবে সংস্কারের সমস্ত বন্ধন। শব্দকে ব্যবহৃত বাক্যবন্ধের আবর্জনা এক এক করে বেছে নিতে হবে। তৈরি করতে হবে ব্যক্তিগত এবং অনন্য, এক প্রচলনমুক্ত বাকরীতি।

ইতিপূর্বের সমস্ত শিল্পতাত্ত্বিক মতবাদই আমাদের কাছে মূল্যহীন। তা শুধু পুরানো দিনের ইতিহাস। আমরা সে ইতিহাসের অনুবর্তন করতে চাই না।

পূর্ববর্তীদের পদচিহ্ন দেখে ছকে বাধা পথে চলা অর্থহীন। আমরা চাই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে। প্রচলিত ধারণা আর তৈরি ডিকসন মেনে প্রেম, পাপ, দুঃখ, যৌনতা, সমাজসমস্যা, যুগযন্ত্রণা ইত্যাদি নিয়ে কবিতার যান্ত্রিক উৎপাদনে আমাদের কোনো আকর্ষণ নেই। শ্লীল, অশ্লীল, উদীপ্ত, সমাজসচেতন বা পলায়নপর প্রভৃতি লেবেল আঁটার যোগ্য তথাকথিত আধুনিক কবিতা আমাদের ক্লান্ত করে, আমাদের বিরক্তি জাগায়।

আমরা এই গন্ডী ভেঙে বেরিয়ে এসেছি। আমরা নতুন কবিতা লিখতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি,

কবিতা চিৎকার নয়, নিবিষ্ট উচ্চারণ।

কবিতা কারিগরী নির্মাণ নয়, শিল্পসৃষ্টি।

কবিতা বক্তৃতা বা প্রচার নয়, নিবিড় অভিজ্ঞতা।

কবিতা বুদ্ধির চমক নয়, ব্যকুল সন্ন্যাস।

আমরা বিশ্বাস করি কবিতা হয়ে ওঠা ছাড়া কবিতার আর কোনো চেষ্টা বা উদ্দেশ্য নেই। কোনো বাণী, বিধান বা নীতি-প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নয়। কেননা ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি বা সমাজচিন্তার স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে; কবিতায় এসব বিষয় নিয়ে গম্ভীর বাগ্মীতা বা তরল উচ্ছ্বাস হাস্যকর। আর এ প্রসঙ্গে মহাকাব্যের নজির টানা অর্থহীন। কেননা, মহাকাব্যের যুগ বিগত।

কবিতাকে তত্ত্ব ও তথাকথিত মহৎ ভাবনার আরোপ থেকে মুক্ত করতে হবে। আমরা পুর্ণ স্বাধীনতা চাই। যে কোনো মতবাদের দাসত্ব আমাদের অসহ্য। আনধিকার প্রবেশকারী দার্শনিক, বুদ্ধিজীবি এবং রাজনীতি প্রচারকদের কবিতার রাজ্য থেকে উৎখাত করতে হবে। শিল্পসৃষ্টি বিধান মানে না, যুক্তি মানে না। কবিতার একমাত্র অবলম্বন কবির / ব্যক্তির বিশেষ মানসিকতা এবং আন্তরিক অভিজ্ঞতা। স্বপ্ন, কল্পনা, আনির্দিষ্ট আকাঙ্খা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিরূপায়ণের মধ্যে দিয়ে কবিতা ব্যক্তিগত পরিমন্ডল রচনা করে। কবির সৃষ্টির মধ্যে গড়ে ওঠে একটি ব্যক্তিগত জগৎ।

নির্দিষ্ট বাণী বা বক্তব্য কবিতায় থাকে না। কবিতার হয়ে ওঠা শিল্পরূপের মধ্যে যে বলার সংকেত তৈরি হয় তা শুধু একটা গভীর অনুভব, উপলব্ধির ক্ষণিক স্রোত, কখনো বা মানসিকতার বিশেষ আবহ।

রচনা-পদ্ধতি এবং রচনার বিষয় আলাদা কোনো ব্যাপার নয়। ব্যক্তিগত জগৎসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত উচ্চারণ পদ্ধতি। প্রচলিক ছক, ভাষা, ছন্দ সমস্ত অব্যবহার্য। এ সমস্ত ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে নতুন উচ্চারণপদ্ধতি। সজীব এবং স্বাভাবিক সেই উচ্চারনকে কণ্ঠস্বরের মতোই আলাদা করে চেনা যাবে, অনুভব করা যাবে। তাই কবিতার ভাষা হবে অকৃত্রিম, নিবিড়। ছন্দ, মিলের প্রয়োজনে কবিতার ভাষা নিয়ন্ত্রিত হবে না। স্বরভঙ্গির স্বাভাবিক স্পন্দনের ভিত্তিতে তেরি হবে প্রত্যেক কবির নিজস্ব ছন্দ।

সমস্ত মিলিয়ে আমরা এক নতুন সৃষ্টিশীলতার সূচনা করতে চাই ; যাতে থাকবে স্রোতের পরিবর্তন প্রবণতা। প্রচলিত চেহারার কিছু রচনা ছাপিয়ে সাময়িক বাহবা এবং পিঠ চাপড়ানো পাওয়ার চেয়ে নতুন সৃষ্টির অস্বীকৃতি, এমন কি ব্যর্থতাও আমাদের আনেক বেশি কাম্য।”[৫]

শ্রুতির তৃতীয় ইস্তেহার-

“প্রচলিত আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আমরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিছু চমক আর চটক মিশিয়ে ছাপার মতো আধুনিক কবিতা লেখা যে খুব সহজ ব্যাপার, কিছুদিনের ছন্দ-মিলের চর্চার পর তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। আর এই বাংলাদেশে, আর যাই কঠিন হোক না কেন আধুনিকতার তৈরি ডিকশন মেনে চলনসই কবিতা ছাপানোটা মোটেই শক্ত নয়। আমরাও এরকম কবিতা নিয়ে, ছাপিয়ে অবশেষে ক্লান্ত এবং বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লাম। আমরা এই গতানুগতিকতার চর্চা থেকে বেরিয়ে সব কিছু পাল্টে দিতে, কবিতাকে ভেঙেচুড়ে নতুন করে গড়তে চাইলাম। আমরা কয়েকজন, যারা কবিতা লেখার সূত্রের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম – নতুন করে কবিতা লেখার প্রেরণায়, মানসিকতার সাধর্ম্যে ঘনিষ্ট হয়েছিলাম ; আমরা কয়েকজন যারা কফিখানায়, চায়ের টেবিলে, পথের ভিড়ে চলতে চলতে কবিতার নতুন পথের কথা ভাবলাম, তা নিয়ে আলোচনা করতাম, তর্ক করতাম। নতুন করে কবি লেখার তাগিদে আমরা মিলিত হলাম। অবশেষে আমাদের চিন্তা এবং চেষ্টা

এক হল। শ্রুতি বেরোল। প্রচলিত আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে শ্রুতির প্রথম প্রতিবাদ।

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ –এর মধ্যে শ্রুতির মোট ন'টা সংখ্যা বেরিয়েছে। প্রথম সংখ্যা থেকেই এই ক্ষীণ-কলেবর কবিতা-পত্রিকাটির চরিত্র স্পষ্ট। সাহিত্যের আসরে সামাজিকতার চলতি রীতিকে শ্রুতি উপেক্ষা করে এসেছে। অর্থাৎ দলগত নির্বিশেষে তাবৎ কবির কবিতা ছাপিয়ে শ্রুতি বাংলাদেশের আর দশটা বাজারচলতি কাগজের একটা হয়ে ওঠেনি। কবিতা সম্পর্কিত বিশেষ বিশ্বাসের ভিত্তিতে শ্রুতির আন্দোলন; এবং সে বিশ্বাসে বিশ্বাসী কয়েকজনের কবিতাই শ্রুতিতে স্থান পেয়েছে। তাই কাউকে অসম্মান না জানালেও বাংলা সাহিত্যের চণ্ডীপণ্ডপী রীতিতে দাদাদের আশীর্বাদী লেখা না চাওয়াতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আবার তাঁদের কাব্যকৃতিকে পেছনে ফেলে নতুন সৃষ্টির গতিশীল প্রয়াসে সন্ত্রস্ত হয়েছেন। তাই তথাকথিত বড় কাগজগুলিতে শ্রুতি বা শ্রুতির কবিদের সম্পর্কে কখনো কোনো আলোচনা হয়নি। (অবশ্য এসব কাগজে কখন কিভাবে কোন কাগজ বা বইয়ের আলোচনা হয় তা সবার জানা বলেই আমাদের ক্ষোভ হয়নি)। আবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পত্রিকা থেকে শ্রুতির কবিদের কাছে লেখা চাওয়া বন্ধ হয়েছে। (অনেক জায়গায় লেখা চাপানোর ব্যাপারে আমরা সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম)।

কিন্তু শ্রুতি বন্ধ হয়নি। শ্রুতির কবিদের নতুন করে লেখার প্রয়াসও একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। ন'টি সংখ্যায় শ্রুতি বাংলা কবিতার পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। শ্রুতির প্রকাশ প্রচলিত আধুনিক কবিতার ক্লান্তিকর একঘেয়েমির সমাপ্তি ঘোষণা করল। নতুন কবিতার জন্য চাই নতুন আঙ্গিক। তাই শব্দ ও বাক্যের প্রকাশের সীমাবদ্ধতা এবং ব্যবহার-জীর্ণতাকে পার হওয়ার প্রয়োজনবোধে আমরা শ্রুতিতে কবিতার আঙ্গিকের পরিবর্তনের সূচনা করেছিলাম। আমরা যা করেছি তার মধ্যে ছিল—

১. নতুন ধরণের মুদ্রণ বিন্যাসের সাহায্যে কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য (visual) অনুষঙ্গ সৃষ্টি।

২. ছেদচিহ্নের বিলোপ। প্রয়োজনমত স্পেস ও বিশেষ পংক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে কোথায় থেমে পড়তে হবে তার নির্দেশ। কবিতার ভাষায় মুখের কথার স্বাভাবিক ব্যঞ্জনাসৃষ্টি।

৩. অনুভবের অবলম্বন বিশেষ শব্দের গুরুত্ব অনুসারে তাকে অন্য শব্দের সাথে জুড়ে বা বেশি স্পেস দিয়ে একেবারে আলাদা করে দেখানো; অথবা বিশেষ কোনো শব্দকে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হরফ থেকে আলাদা হরফে ছাপিয়ে তার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ। কখনো বা শব্দের প্রতিটি বর্ণকে স্পেসের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে গানের লয়ের মতো উচ্চারণবৈশিষ্ট্য তৈরি করা। সমস্ত মিলিয়ে কবির অনুভবের ক্রমভেদে উচ্চারণের ওঠানামার নির্দেশ দেওয়া।

৪. ব্যকরণের বিরোধিতা। ভাষা ব্যবহারে বাক্যপ্রকরণের যুক্তিনির্ভরতার বর্জন। শব্দকে বাক্যের অংশ বা পদ হিসেবে না ভেবে প্রতিটি শব্দকে একক গুরুত্বে ব্যবহার করা। সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ, বিশেষণ ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় ভারসৃষ্টিকারী শব্দকে যথাসম্ভব পরিহার করা।

৫. প্রচলিত ছন্দকে বর্জন করে বা ভেঙে কবিতার ভাষায় ব্যক্তিগত উচ্চারণের স্বতন্ত্র ছন্দ-স্পন্দন সৃষ্টি।

শ্রুতির কবিদের রচনা বাংলা কবিতার ঋতুপরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল। তাই শ্রুতিতে ব্যবহৃত আঙ্গিকের উপকরণগুলি শ্রুতির বাইরের কবিদের রচনায়ও ছড়িয়ে পড়ল। বোধহয়, অনেকেই বুঝলেন, অন্তত কবিতার বাইরের চেহারাটা না পালটালে এবার আর চলছে না। বেশ কয়েকজন কবির শ্রুতির প্রকাশের পূর্ববর্তী (১৯৬৫ ও তার আগের) এবং পরবর্তী কবিতার তুলনামূলক পাঠ ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করে। আঠারো মাত্রার সমপয়ারে সনেট বা ছদ্মধ্রুপদী ধাঁচের কবিতার যান্ত্রিক উৎপাদনের যে বিস্তার দেখা গিয়েছিল তার ভাঁটা পড়ল। কিন্তু যাঁরা শুধু কবিতার বাইরের চেহারাটা পালটাতে চেয়েছিলেন তাদের তাগিদটা ছিল নিতান্তই বাইরের পোশাকের ফ্যাশনেবল হওয়ার। তাঁদের কবিতার আসল চরিত্র তাতে পালটায় নি। তাঁদের কবিতা মুলত বিবৃতিধর্মী এবং বাণীপ্রচারকই থেকে গেছে। কিন্তু শ্রুতির কবিরা চেয়েছেন যথার্থ নতুন কবিতা লিখতে, কবিতাকে সামাজিক, অসামাজিক, দার্শনিক বা রাজনৈতিক বাণীপ্রচারের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে। কবিতা তাঁদের কাছে জটিল ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রতিরূপায়ণের শিল্প-মাধ্যম। এবং ব্যক্তিগত জগৎ-সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন প্রথামুক্ত স্বতন্ত্র রচনারীতি। উপযুক্ত রচনারীতির উদ্ভাবনের জন্যই তাঁরা কবিতার উচ্চারণকে প্রচলিত প্রকাশ-রীতির জীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন,

কবিতার প্রকরণগত পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। এছাড়া শ্রুতির কবিরা সূচনাতেই থেমে থাকেননি। ক্রমপরিবর্তনের পথ ধরে তাঁদের কবিতা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

না, আমরা আত্মসন্তুষ্ট নই। আজ আমাদের মনে হচ্ছে, শ্রুতির গত ন'টি সংখ্যার মধ্য দিয়ে আমরা শুধুমাত্র একটা প্রস্তুতির পর্ব পার হয়েছি। এবার আমাদের যথার্থ আন্দোলন। আমাদের সংগ্রাম কবিতার মুক্তির জন্য। সংস্কারের বন্ধন, ব্যাকরণ আর অলংকারের বিধান, ন্যায়শাস্ত্র আর তত্ত্বচিন্তার অধীনতা থেকে আমরা কবিতাকে মুক্ত করতে চাই। আমরা কবিতার মুক্ত অঞ্চল গড়ে তুলব। আমাদের কবিতা হবে মুক্ত অঞ্চলের কবিতা।"[৬]

১৯৬৬ সালে *সাম্প্রতিক* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত হয় 'ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন'। সুকোমল রায়চৌধুরী, প্রভাত চৌধুরী, অঞ্জন কর, কাননকুমার ভৌমিক, দীপেন রায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের সমবেত চেষ্টায় গতানুগতিক কবিতা চর্চার বিরুদ্ধে তৈরি হয়েছিল 'ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন'। ধ্বংসকালীন কবিতার প্রস্তাবনা :

"১. কবিতা শুধু সংগতিহীন চিত্রচিত্রণ নয়, আবার বাগ্মীতার শিরোচ্ছেদ চাই। প্রকৃতির মতো উদার আর অকৃত্রিম হবে কবিতা, ভালো হবে, মন্দ হবে, প্রচলিত কোনো আদর্শই কবিতার বাধা হতে পারবে না।

২. জীবন ও জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজনিত উপলব্ধির নামই শিল্প, নাম কবিতা।

৩. কবিতাই কবির জীবনদর্শন যা না থাকলে অযৌক্তিক হাস্যকর বাক্যগঠন শিল্প পদবাচ্য হতে পারে না।

৪. সমস্ত অতীত ঐতিহ্য মন্থন করে নতুন বোধে উত্তরণই আমাদের লক্ষ্য, ছিন্নমূল প্রলাপ ভাষণের নাবালক ভূমিকা শিল্পীর নয় বলেই আমরা মনে করি।

৫. আমরা যা তাই আমাদের কবিতা। আমরা যা নই তা আমাদের কবিতায় নেই। অকৃত্রিমতাই আমাদের উপাস্য।

৬. মানবসভ্যতার ক্রান্তিমুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রজ্ঞাময় উপলব্ধির মহৎ উচ্চারণই ধ্বংসকালীন কবিতা।"[৭]

সাম্প্রতিক পত্রিকার দশম সংকলনে ইস্তেহারের মধ্যদিয়েও এই আন্দোলন নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে চেয়েছে-

"১. জীবন ও জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট বা আপাত অস্পষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজনিত উপলব্ধির নামই শিল্প, ধ্বংসকালীন সময়চেতনার উত্তীর্ণ বোধ-সজ্ঞাত মন্ত্র।

২. সমস্ত অতীত ঐতিহ্য মন্থন ক'রে নতুনতর বোধে উত্তরণই আমাদের লক্ষ্য, ছিন্নমূল প্রলাপ ভাষণের নাবালক ভূমিকা শিল্পীর নয় বলেই আমরা মনে করি।

৩. অস্বিত্ব বা অপর অর্থে জীবানুসন্ধানের জন্যই শিল্পীর প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকা।

৪. অকৃত্রিমতাই আমাদের উপাস্য।

৫. গতিশীল পৃথিবীর যাবতীয় পার্থিব অপার্থিব বস্তুসংঘাতে আমাদের পটভূমিকা, অর্থাৎ শিল্পের সংজ্ঞায় অখণ্ড সময়প্রবাহের উর্দ্ধে উঠেও আমরা সময়ের কাছে নতজানু।

৬. মানবসভ্যতার ক্রান্তিমুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রজ্ঞাময় আত্মবোধের স্বনির্ভর উচ্চারণে আমরা বিশ্বাসী।

৭. এবং ধ্বংসকালীন সেই অর্থে সৃষ্টিকালীন"।[৮]

ধ্বংসকালীন বিপন্ন সময়ে কবিতাই গড়ে দেবে কবির জীবনদর্শন। মানব সভ্যতার ক্রান্তিমুহূর্তে 'ধ্বংসকালীন কবিতা' একদল তরুণ কবির প্রজ্ঞাময় উপলব্ধির মহৎ উচ্চারণ। সমসময়ের বিপন্নতার মুখোমুখি পবিত্র মুখোপাধ্যায় উচ্চারণ করলেন 'ইবলিশের আত্মদর্শন'—

"ইবলিস, প্রান্তর নেই
সব প্রান্তরের শেষে তুষার প্রাচীর
পৃথিবীর চতুষ্পার্শে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উদ্যত বুলেট
জ্বলন্ত লোহার শিক ফুঁড়ে দিয়ে গেছে কারা পৃথিবীর বুকে

জন্ম হতে শুনি শুধু আহত শূকর করছে অন্তিম চীৎকার"[৯]

মাত্র দু'বছর স্থায়ী এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল এই ভাবনার বীজ। পুরনো মূল্যবোধ কিংবা ফর্ম সর্বস্বতার বিরোধিতা এই আন্দোলনের অন্যতম সুর। ধ্বংসকালীন আন্দোলনে হাংরি ও শ্রুতি আন্দোলনের প্রভাব অথবা পূর্বোক্ত দু'টি আন্দোলনের সাথে এই আন্দোলনের পার্থক্য চিহ্নিত হয়েছে, আন্দোলনকারীর দৃষ্টিতেই,

> "হাংরি জেনারেশন যেমন সময় ও পারিপার্শ্বিক সচেতন ছিলো না, ছিলো না সামাজিক দায়বোধে উদ্দীপ্ত ; ব্যক্তিগত ক্রোধ, স্বেচ্ছাচারকেই ব্যক্তির মুক্তি বলে চালাতে চেয়েছিলো, শ্রুতিগোষ্ঠী তেমনি শিকড় উচ্ছিন্ন শব্দের চাতুর্যকেই কবিতা বলে চালাতে গিয়েছিলো ; ধ্বংসকালীন কবিগোষ্ঠী কিন্তু ছিলো সমাজ, পরিপার্শ্ব, ইতিহাস সচেতন ; ফলত তারা মানবীয় মূল্যবোধের ক্রম অবনমনকে ঠেকাতে না গিয়ে, তার ধ্বংসই চেয়েছিলো ; ... আর তারই উপরে নতুনের জন্ম যদি হয় হোক, এরকম একটা স্পষ্ট বোধে পৌঁছেছিলো।"[১০]

স্বতোৎসার ও *কবিসেনা* পত্রিকার মধ্য দিয়ে 'প্রকল্পনা সর্বাংগীন কবিতা আন্দোলন' সূচিত হয় ১৯৬৯ সালে। মূলত কবিতার আঙ্গিকগত এই আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন চন্দন ভট্টাচার্য। এই আন্দোলনের মূল কথাগুলি হল-

ইস্তেহার

অটোমেটিক রাইটারদের স্বতোৎসারিত প্রকল্পনা :

" এক) সাহিত্যে এযাবত প্রচলিত কোনো নির্দিষ্ট ফর্মে বিশ্বাসী নই আমরা।

দুই) কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি সমস্ত গতানুগতিক রচনারীতি এবং প্রথার শৃঙ্খল থেকে রোদনার্ত সাহিত্যকে মুক্ত করতে চাই আমরা প্রকল্পনা আন্দোলনের মাধ্যমে।

তিন) আমাদের বিশ্বাস সাহিত্য স্বতোৎসারিত অনুভব ও চৈতন্য প্রবাহের (stream of consciousness) যথার্থ রেকর্ড (Automatic writing) ।

চার) পাঠকদের সঙ্গে রচনার সমগ্র এবং সম্পূর্ণ একাত্মতা সৃষ্টি (Involevment of the readers with the writing-total and complete) আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

পাঁচ) বিভিন্নতার ভিতর বিভিন্নতা (Diversity in diversity)- একই রচনা বা দৃশ্যের প্রতি বিভিন্নজনের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা।

ছয়) জীবন সম্পর্কে নির্মোহ দৃষ্টি Exploration of our outlook towards life as it is.

সাত) ঘটনা দৃশ্য বা অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের অনুভূতির অনাবৃত উন্মোচন।

আট) প্রচলিত বাক্-রীতির আমরা ঘোর বিরোধী। শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ আমাদের ভাবনার এবং তাৎক্ষণিক অনুভূতি ও কবিতার (Instant poetry) একান্ত বাহনমাত্র। আমাদের লক্ষ্য শব্দের সীমানা অতিক্রম।

নয়) জীবন সম্পর্কে কোনো কথাই শেষ কথা নয়। বিশেষ কোনো মন্তব্য বা দার্শনিককে আঁকড়ে থাকা আমাদের কাছে হাস্যকর।

দশ) সাহিত্য কি উত্তরণের পথ নির্দ্দেশ করে? জীবনের অবিকৃত ও বিশ্বাস্য সত্য উদ্ঘাটনের মধ্যেই উত্তরণের যথার্থ অর্থ নিহিত বলে আমরা মনে করি"।[১১]

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত এই ইস্তেহারের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয় যে 'প্রকল্পনা সর্বাংগীন কবিতা আন্দোলন' ছিল এক অর্থে প্রথা সর্বস্বতার বিরুদ্ধে জেহাদ। *স্বতোৎসার* পত্রিকায় কবিতা সম্পর্কিত এদের ইস্তেহারে পাই -

"১. সত্ত্বার সামগ্রিক উন্মোচন যদি ১টি লেখায় কর্তে হয় তবে প্রচলিত কোনো ১টি আংগিকে তা সম্ভব নয় / সমস্ত আংগিক থেকে প্রয়োজনীয় প্রকাশভংগী আহরোণ কর্তে হবে (অর্থাৎ এক একটি সময়ে একটি রচনার ১টি অংশ যে ফর্মের সাহায্যে লিখলে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায় -> সেই আহরণই প্রকল্পনা-প্রবন্ধের 'প্র' কবিতার 'ক' গল্পে : 'ল্প' নাটকের 'না' -> সাহিত্যে আমাদের সৃষ্ট নবতম বেপরোয়া ফর্ম

২. আমাদের আবিষ্কৃত দর্শন চেতনাভ্যাস--> প্রচলিত ধারণার বিপক্ষে আমাদেরই প্রাপ্ত বিশ্বাস যে মানুষের সামগ্রিক জগৎ সম্পূর্ণভাবে তার সচেতনতার উপর নির্ভরশীল নয় / জন্মাবার পরই জীবশিশু আক্ষরিক অর্থে হলেও প্রকৃত অর্থে সচেতন হয়ে ওঠে না / তার অবস্থানগত সমাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং নিজস্ব জৈবিক গঠন তাকে করে তোলে ক্রমশ সচেতন- যা ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে প্রাত্যহিক ব্যবহারের ফলে শুধুমাত্র চেতনার স্তরে থাকে না / বারবার ক্রিয়াশীল অভ্যাসের দ্বারা তা হয়ে ওঠে চেতনাভ্যাস= চেতনা + ব্যবহারিক অভ্যাস যা চেতনার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রত নয়--> যা সম্প্রসারণশীল।

৩. আমাদের অ্যান্টি পত্রিকা স্বতোৎসার- কি অর্থে? স্বতোৎসার বলতে আমরা বোঝাতে চাই অনারোপিত রচনার শিল্পসম্মত রূপ (অবশ্যই প্রথাগত অর্থে নয়)

৪. স্বতোৎসার অ্যান্টিপত্রিকা- কি অর্থে? স্বতোৎসার আকৃতিতে কুঠার ফলকের প্রতীকে গতানুগতিকতার মূলে কুঠারাঘাত হানে, আর প্রকৃতিতে ফর্মের দিকে সাহিত্যের নবতম প্রকল্পনা এবং তত্ত্বের দিকে নবতম তত্ত্ব চেতনাভ্যাসবাদের আবিষ্কারের দ্বারা প্রচলিত পত্রিকার গতানুগতিক ধারণার বাস্তুভিটের ঘুঘু চরায় আমাদের বর্ণপরিচয় + দৃষ্টি পরিচয় :-->

৫. গতানুগতিক রচনারীতি এবং প্রথার শৃংখল থেকে রোদনার্ত সাহিত্যকে যুক্ত কর্তে চাই আমরা/ প্রচলিত বাকরীতির আমরা ঘোর বিরোধী/ শব্দ বাক্য বা বাক্যাংশ আমাদের অনুভূতি ও ভাবনার একান্ত বাহনমাত্র/ আমাদের লক্ষ্য শব্দের সীমানা অতিক্রম

৬. সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ সবকিছুরই মূল্য আছে, এ মূল্য আপেক্ষিক, নির্দিষ্ট এবং সমগ্রতায় পরিমাপযোগ্য নয়।

৭. বাঁচার তাগিদে প্রতিটি মানুষের একের অন্যের স্বার্থে অমিল, নিজস্ব অনুসন্ধান আছে

৮. মূলগত সত্যের প্রকৃত + যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটনের স্বার্থে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের যাচাই + পরিশোধনের দ্বারাই ব্যক্তি বস্তু ক্রিয়া ভাবনা-ইত্যাকার সবকিছুর পূর্ণমূল্যায়ণ প্রয়োজন

৯. চেতনাভ্যাসবাদে অবিচল থেকে প্রকল্পনা গোষ্ঠির লেখকদের স্বকীয়তা রক্ষার জন্যে বিভিন্নতার মধ্যে বিভিন্নতা

১০. জীবন সম্পর্কে কোনো কথাই শেষ কথা নয়"।[১২]

সাতের দশকের গোড়ায় *আজকাল* পত্রিকার মাধ্যমে নৈহাটির তরুণ কবিদের নেতৃত্বে শুরু হয় 'আজকাল কবিতা আন্দোলন'। বাণী সমাদ্দার, আলোক সোম ও বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী এই আন্দোলনের মূল সংগঠক। এই সময় অন্যান্য সাহিত্য আন্দোলনের মতো এরা ইস্তেহার লিখে কবিতা সম্পর্কে নিজেদের মতামত বলেননি বরং পূর্বসূরীদের কবিতাকে বিশ্লেষণ করে এবং বর্তমানের কবিতাকে সমীক্ষার মধ্য দিয়ে কবিতা বিষয়ক নতুন সিদ্ধান্তে আসতে চেয়েছেন। ১৯৭৮ –এ প্রকাশিত এই গোষ্ঠীর 'আত্মপক্ষ' শিরোনামের সম্পাদকীয়টিকে এই আন্দোলনের মূল কাঠামো বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

> "বাংলা কবিতার গৌরবময় অতীতকে নিরুপায় অবলম্বন ভেবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বচ্ছ আলোকে ততবেশি নয়, এমনকি মূল সুরটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে, সমকালে এক গরিষ্ট সংখ্যক কবি, নিবেদনের ভঙ্গিতে নিবিষ্ট রাখছেন তাদের কাব্যসাধনা। আশ্চর্য না হয়ে পারি না, ভাবলে বিমর্ষ হই, বাঙালি মানসতার পক্ষে পুষ্টিকর ও পরিচিত কবিতার- এই প্রধান ধারাটিকে, একমাত্র আশ্রয়ের ও বেড়ে ওঠার মন্ত্র হিশেবে ব্যবহার করে সমস্ত অতীতকে অতিক্রমের ইচ্ছা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের সময়ের পক্ষে যা কিছু অনিবার্য গ্রহণীয় হ'য়ে উঠছে এবং ভবিষ্যকালের যা কিছু হ'তে পারত তা অতীত অভিজ্ঞতায় মিশে গিয়ে আর এক কবিতার ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে। অথচ এসব হচ্ছে না। অন্তরের কোনো নির্দিষ্ট তাগিদ থেকে নয়, কোনো শিক্ষিত মন, অন্তর্জ্ঞান বা অনুভবের স্পষ্টতায় কবিতাকে ধরা নয়। বরঞ্চ একঘেয়ে শব্দ ও অনুষঙ্গের ক্লান্তিকর পৌন:পুনিকতায় , তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির মুগ্ধতায় রচিত হচ্ছে অধিকাংশ কবিতা'... 'কবিতা কবি নিজেই লেখে। দল বা মতের আদর্শ বা চিন্তা কবিতায় কখনই প্রতিবিম্বিত হয় না তবু, বিষয়ে ও চিন্তায় পরস্পরের থেকে উল্লেখ্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, যদি, কখনও কোনো আপাত সাযুজ্য চোখে পড়ে কারুর, জানতে হবে বুঝতে হবে, তা আসলে মূল ধারাটিকে অন্যস্রোতে বইয়ে

দেবার সমগ্রতা- একটা বড় ছবিকে অস্বীকার করার একতা। আমরা কমবেশি সংলগ্ন এখানেই।"[১৩]

নতুনভাবে কবিতা লেখার উৎসাহ নিয়ে *টাইরেসিয়াস* পত্রিকার মধ্য দিয়ে জুলাই ১৯৭৪ –এ শুরু হয় 'নিওলিট মুভমেন্ট'। সমকালীন কবিতার ভিত্তিভূমি 'আপাত অভিজ্ঞতা', তাই কবিতার সঙ্গে জীবনের সমগ্রতার কোনো সম্পর্ক নেই। এই সংকট ও অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য প্রয়োজন হয় 'নিওলিট মুভমেন্ট'। *টাইরেসিয়াস* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় হিসেবে এই আন্দোলনের ইস্তেহার :

" নিওলিট মুভমেন্ট মনে করে,

১) কবিতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার, যা উঁচু ও গভীর, যার কণ্ঠস্বর সহজেই পাঠকের সাথে কথা বলতে পারবে।

২) আমরা কবিতায় আপাত অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক বাস্তবতার প্রবেশ বিশ্বাস করি না। আমাদের লক্ষ্যও চেতনায় সমগ্রতা। তাই প্রয়োজন লৌকিক ও দূরলৌকিক অর্থাৎ অন্য ভাষায় বহিজগৎ ও অন্তর্জগতের ভেদরেখা বা সীমারেখা মুছে দিয়ে উভয়ের সংমিশ্রণে দ্বান্দ্বিক ও বিস্তৃত বাস্তবতা। এর ফলেই সম্ভব ও সহায়ক হবে মানুষের জীবন ও চেতনার সাহসী ও ক্ষমতাশালী বিস্তার।

৩) আমরা আরও মনে করি যে কোনো মুহূর্ত বা সময়খণ্ডের এবং অসীম কালের বা সময়ের মধ্যে যে ভেদ বা সীমারেখা রয়েছে তা মুছে দিতে হবে। ঐ ক্ষুদ্র সময়খণ্ডের আধারে বিশাল সময়ের চেতনার অস্তিত্ব ধরার প্রয়াসে কালগত সীমা ভেঙে যাবে।

৪) বিমূর্ততার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সুস্থ ও প্রাণবন্ত মূর্ততা ফুটিয়ে তুলতে হবে, যা সহজে ও গভীরভাবে ভাব ও ভাবনাকে উদ্দীপিত করবে, মাটি-মানুষ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার সঠিক অস্তিত্ব সম্পর্কে তাকে সচেতন করবে।

৫) কবিতার গঠন আপাত-আলগা মনে হতে পারে, কিন্তু বিষয় আঙ্গিক অর্থাৎ শব্দচয়ন, ধ্বনি, ভাবনা ও উপস্থাপনা ইত্যাদি কোথাও একটা ঐক্যতানে দৃঢ়সংবদ্ধ থাকবে এবং সব মিলিয়ে উঠে আসবে কবিতা।

৬) কবিতার কোন পংক্তি কিম্বা কোন কোন শব্দ তার পুরনো অর্থ নিয়ে উপস্থিত না-ও হতে পারে, তার ফলে পাঠকের কাছে তা আপাতভাবে অর্থহীন মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং গভীর বাস্তবতার সঠিক অর্থময়তা ও ব্যঞ্জনা থাকা দরকার।"[১৪]

কবিপত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শৈবাল মিত্রের সম্পাদনায় শুরু হল 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলন'।

" থার্ড লিটারেচার : প্রয়োগবাদীকবিতা : ম্যানিফেষ্টো

১) দৈন্যন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার শিল্পরূপই কবিতা। ভাবাবেগ যথাসম্ভব বর্জনের চেষ্টা, যান্ত্রিকভাবে তত্ত্ব প্রয়োগের প্রবণতা ত্যাগ।

২) মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধ ও সেই বোধের আলোকে জীবনকে দেখার বৈজ্ঞানিক প্রণালী থাকবে ; সামাজিক সমস্যায় জড়িত কবি নিজের অভিজ্ঞ চোখকেই কাজে লাগাবেন যথাসম্ভব ব্যক্তিগত অহং বর্জন কোরে-

৩) পাঠকের সঙ্গে সহজ হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য চলতি কালের ভাষার ব্যাপক ব্যবহার, কথা বলার ঢঙে বাক্য গঠন, কাব্যি করার প্রবণতা রোধ;- পাঠকের সঙ্গে সম্পর্ক ছলনার নয়, সহমর্মিতার সহযোদ্ধার, তা মনে রাখা-

৪) কবিতাও উদ্দেশ্যমূলক। কোনো অভিজ্ঞতা অনুভূতি পাঠকের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য কবিতা ; কবিরা গান করেন, পাঠক তা আড়ি পেতে শোনে- এজাতীয় আত্মম্ভরিতা বর্জন-

৫) ছুঁৎমার্গী বিশুদ্ধবাদ বর্জন, জীবনের সঙ্গে জড়িত অনিবার্য তাবৎ কর্ম-কাণ্ডকেই কবিতার বিষয় রূপে গ্রহণ-

৬) কবিরা সমাজের বিবেক, প্রজাপতিব্রহ্মার সঙ্গে একাত্ম, বিশেষ সম্মানের অধিকারী, এ জাতীয় মনোভাব পরিত্যাগ ; নিজেকে সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখতে শেখা-

৭) লোকশিল্পের সহজ উপস্থাপনাকৌশল আয়ত্ত করা ও জীবনধর্মিতা-

৮) অতিরিক্ত সরলীকরণ বিরোধিতা ; ব্যক্তিকবির স্বতন্ত্র চরিত্র রাখা, ব্যক্তিগত স্টাইল আবিষ্কার যা কমিষ্ঠ মানুষের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির স্বচ্ছন্দ উচ্চারণ, যান্ত্রিক তত্ত্বের শব্দসংস্থান নয়-

৯) অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য, যা কবিকে দূরে সরিয়ে রাখে তা বর্জন, কবি ও পাঠক একই ভূমিকায়, দুজন আলাদা নয় তা ভাবতে শেখা-

১০) শব্দের ব্যায়াম প্রদর্শন নয়, জীবনের চলমান কর্মকাণ্ডই কবিতা"।[১৫]

সম্পাদকীয়তে লেখা হল,

> "কী বিশ্রী আর বন্ধ্যার সময় চলছে ভাবুন এখন গল্প উপন্যাস লিখে যেকোনো হাফগেরস্থ লেখকও বাড়ি-গাড়ি বানাচ্ছে, একটা লেখা নিয়ে তাবৎ শ্রম ও প্রতিভা বছরের পর বছর ব্যয় করছে এমন একজন লেখকও নেই।"[১৬]

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, শৈবাল মিত্রের নকশাল আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, অমর মিত্রের বাংলা সাধারণ মানুষের সঙ্গে চাকরি সূত্রে দীর্ঘকাল মেশার অভিজ্ঞতা এবং স্বয়ং পবিত্র মুখোপাধ্যায় এই মিলিয়েই 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলনের' তত্ত্ব তৈরি হয়েছিল। ধোঁয়াটে ভাবালুতা বা অতীন্দ্রিয় দুষ্প্রাপতা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা ভেবেছিল 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলন'। অনেকেই পত্র-পত্রিকায় এই আন্দোলনকে নানাভাবে আক্রমণ করলেও অমর মিত্র এই আন্দোলনের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে লেখেন,

> "একটি মৃত্যুকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে থার্ড লিটারেচারের লেখক যতটা গভীরে যেতে চান, সেকেন্ড লিটারেচারের লেখক ততটা যাবেন না। তিনি সর্বক্ষণ প্রস্তুত হয়ে আছেন এই মৃত্যু সম্বন্ধে তার বিদ্রোহকে উগরে দিতে। তাঁর সহনশক্তি কম, তিনি লেখার আরম্ভেই তার উদ্দেশ্যটিকে প্রকাশ করে শিল্প কর্মটিকে একহাট লোকের সামনে দাঁড় করিয়ে চিৎকার করতে থাকেন। তারপর ক্রমশ পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে সাজেশান দিতে থাকেন। এতে বিশ্বাসী নয় থার্ড লিটারেচারের লেখকেরা। হাতুড়ে উত্তেজনা আদপেই গ্রহণযোগ্য নয়।

থার্ড লিটারেচার অবশ্যই বদলে দেওয়ার সাহিত্য। কিন্তু রেকটিফিকেশন-এর কাজ নয়। কেননা থার্ড লিটারেচার শিল্পের প্রতি এবং কারণ অনুসন্ধানের প্রতি, বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বস্ত। সুতরাং থার্ড লিটারেচার শিল্পকর্মকে, সাহিত্যকে যেভাবে দ্যাখে, সেইভাবে দেখা ফার্স্ট লিটারেচার-এ হতে পারে না। কেননা থার্ড লিটারেচার বিজ্ঞান মনস্ক। তার কর্ম বদলানো, তার শব্দ বাক্য ব্যবহার কোনোটাই আকাশ থেকে পড়া নয়। প্রত্যেকটাই তার বাস্তবকে বিশ্বাস থেকে আসে। প্রয়োজন থেকে আসে।"[১৭]

কবিতা বিষয়ক ধ্যান ধারণাকে বদলে নেওয়ার জন্য উচ্চবিত্তের ড্রইংরুমের সেলফে বা মধ্যবিত্তের ভাবালুতায় বদ্ধ ডোবা থেকে কবিতাকে মুক্ত করার জন্য পাঠক এবং কবিকে একই স্তরে রাখার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের কবিরা 'Applied Poetry' বা 'প্রয়োগবাদী' কবিতা তৈরি করার চেষ্টা করেন।

"আল থেকে উঠে দাঁড়াও আরুনি জল-
গড়িয়ে যাক খরায় জ্বলে যাওয়া
ক্ষেতে জল-
ভিজিয়ে দিক গলা শুকনো
মাটির তুমি

উঠে দাঁড়াও আল থেকে
কে দেবে দাম এই বশ্যতার এই-
নিঃস্বার্থ আত্মদান কে বুঝবে এর
ইংগিতে ? তোমার –
আত্মদানে প্রভুর
গোলা উঠবে ভরে – আর

মুষড়েপড়া মানুষগুলোর সংসার

একটা খড়ও

সঞ্চয় করতে পারবে না।”[১৮]

এছাড়াও *জনপদ, আলোচনাচক্র, লালনক্ষেত্র, গাঙ্গেয়পত্র, ক্যাকটাস* প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে ১৯৮৫ সালে অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন, বীরেন্দ্র চক্রবর্তীর প্রস্তাবনায় বাংলা কবিতায় যুক্ত হয় উত্তর আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গ। ১৯৮৮ সালে মলয় আদকের প্রচেষ্টায় *অস্ত্রী* পত্রিকা কবিতা সম্পর্কিত ‘মালোভী কাব্য আন্দোলন’-এর ইস্তেহার প্রকাশ করেন। এই আন্দোলনও দীর্ঘ দিনের স্থিতাবস্থা বা নিস্তরঙ্গতার বিরুদ্ধে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার কথা বলে এবং স্থিতাবস্থাকে কাটিয়ে তোলার জন্য বিরুদ্ধাচারণের কথা ভাবে। এই আন্দোলন যুগের দাবি অনুযায়ী অজস্র সম্ভাবনা তথা বস্তুতান্ত্রিক ধারাগুলিকে সংযোজন ও গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে একটি সংহতি আনার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। যার মূল কথাগুলি ছিল-

“১) আমরা এমন কবিতা লিখতে চাই না যা কেবলমাত্র কয়েকজন বুঝতে পারবেন বা বুঝতে পারার ভান করবেন। আমরা চাই কবিতা আরও বেশি বেশি মানুষের বোধগম্য হোক।

২) সমাজকে আলোড়িত করে যে সাময়িক এবং সুদূরপ্রসারী ঘটনাবলী তাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করে সময় ও অন্তরের মাঝে স্থাপিত করতে চাই। ফলে যাবতীয় ঝুকি গ্রহণ করার স্পর্ধা থাকাটাও এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শর্ত।

৩) কবিতার চাই ম্যাজিকাল ট্রিটমেন্ট, তবে তা রহস্যময়তা সৃষ্টি করবে না। বরং উন্মোচনের সহায়ক। রহস্য দিয়ে রহস্যকে ধ্বংস করে গভীর ও পবিত্র অনুভূতির জন্ম দেওয়াই এই সম্মোহনের উদ্দেশ্য।

৪) সব কিছুর উৎসে যে লোকজীবন স্থিতাবস্থার সমর্থনের বিপরীতে তাকে বাঞ্ছিত করাই আমাদের অভিপ্রেত। সেই জন্য চাই লৌকিক শব্দ ও মীথের প্রাণবন্ত

ব্যবহার। তার মানে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে কবিতায় কতগুলি লৌকিক শব্দ বা মীথ রয়েছে তার উপর নির্ভর করবে সেই কবিতার উৎকর্ষ।

৫) প্রকৃতি দ্বন্দ্বময়। জলপ্রপাত, সমুদ্র ও মেঘের গর্জনের বিপরীতে অরণ্যের সংগীতময়তা, বৃষ্টি পতনের শব্দ, পাখির কলতান, ভ্রমরের গুঞ্জন-এই কড়ি ও কোমলের অনুকম্পন চাই কবিতার শরীরে।

৬) প্রেম ও যৌনতার প্রতি কোন ছুতমার্গ নেই আমাদের বরং প্রেম ও যৌনতা যদি জীবনমুখী হয় তবে সাদরে গৃহীত হবে। আমরা বিকারের বিরোধী কাপুরুষতার বিরোধী।

৭) নাটকীয়তা কবিতাকে আবেদনগ্রাহ্য করে তোলে, তাই প্রয়োজন মত ক্লাইম্যাকস, অ্যান্টিক্লাইম্যাকসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে।

৮) স্বত্বাব্যঞ্জক ছন্দের তীব্র অনুশীলন চাই গদ্য কবিতায়। পাশাপাশি প্রথাগত ছন্দ চর্চার দরজাও খোলা থাকবে।"[১৯]

তথাকথিত সমাপ্তি ঘোষিত হয়ে যাওয়ার পরেও বাংলা সাহিত্যের অন্দরে এতগুলো কবিতা বিষয়ক আন্দোলন নিঃসন্দেহে জানান দেয় হাংরি জেনারেশন যে বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছিল স্থবিরতার বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তার প্রেরণা পরবর্তী বহুকাল বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন মহিমায় উপস্থিত ছিল। শুধুমাত্র কবিতা বিষয়ক আন্দোলন নয় হাংরি আন্দোলনের প্রায় সমকালে অথবা তার পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য একাধিক গল্প আন্দোলনেরও সাক্ষী হয়েছে।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে *এইদশক* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় 'শাস্ত্র-বিরোধী ছোটগল্প আন্দোলন'। প্রথম প্রকাশিত সংখ্যায় 'শাস্ত্র-বিরোধী ছোটগল্প' নামক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়-

"সময় হয়েছে যা কিছু পুরানো তাকে বর্জন করবার, সময় হয়েছে যা কিছু নতুন তার জন্য প্রস্তুত হওয়ার। আলমারি থেকে সব বই নামিয়ে ফেল। আমাদের জন্যে এবার একে একে তাকগুলো খালি করে দাও। তথাকথিত মহৎ উপন্যাস এবং গল্প গুলোকে ট্রাঙ্কে তাড়াতাড়ি পুরে ফেল ওগুলো আর দরকার নেই। ওগুলো এখন আবেদনহীন এবং বিরক্তিকর। মনে রেখো আর্তো-র সেই বিখ্যাত উক্তি

> 'Masterpieces of the past are good for the past, they are not good for us'.
>
> ছোটগল্প আজ থেকে সমস্ত শর্তের বিরুদ্ধে সমালোচকের সমস্ত সংজ্ঞার বেড়া ভেঙে সে বেরিয়ে এসেছে। ছোটগল্প এখন কবিতার মতোই স্বাধীন এবং মুক্ত। আমরা যা লিখব যেমন করে লিখব তাই ছোটগল্প।
>
> শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বাউল। আমরা শিল্পের শাস্ত্রবিধি মানি নি। আমাদের কোন সামাজিক দায় নেই। বাউলের মতো আমরাও বলি, 'মরলেই সব দায় ঘুচে যায়। তোমাদের দৃষ্টিতে আমাদের মৃত মনে করো'। আমরা মরমী। অন্তরাত্মার জটিল অনুভবই আমাদের গল্পের বিষয়"।[২০]

প্রথম *এই সংখ্যায়* লেখকসূচিতে পাঁচজনের নাম ছিল সুব্রত সেনগুপ্ত, রমানাথ রায়, শেখর বসু, কল্যাণ সেন ও আশিস ঘোষ। পরবর্তীকালে *মুক্ত অঞ্চল* নামে যে ইস্তেহার প্রকাশিত হয় তার প্রথম লেখা শাস্ত্র-বিরোধী ছোটগল্প এবং দশটি ঘোষণা রমানাথ রায়ের নামে মুদ্রিত। যেহেতু সাহিত্য স্থবিরতা পছন্দ করে না এবং যেহেতু শাস্ত্র-বিরোধীরা মনে করছেন বাংলা কথা সাহিত্যে একটা পরিবর্তনের দরকার আর তাই ছয়ের দশকের শারীরিক বিদ্রোহের চেতনা নিয়ে যেন শুরু হয়েছিল শাস্ত্র-বিরোধী আন্দোলন। শাস্ত্রের বিরোধীতা করার যুগে সাহিত্যও হবে শাস্ত্র বিরোধী। এই দশকের ওই প্রথম সংখ্যাতে প্রচ্ছদে মার্ক টোয়েন কে কাজে লাগিয়ে শাস্ত্র বিরোধীরা লিখেছিলেন একটা নোটিশ-

> "এই বিবৃতির মধ্যে যারা কোনো উদ্দেশ্যের খোঁজ করবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে, যারা উপদেশের খোঁজ করবে তাদের নির্বাসনে পাঠানো হবে আর যারা কোনো কাহিনির খোঁজ করবে তাদের গুলি করে মারা হবে।"[২১]

বাংলা দেশের লেখক ও পাঠকদের সামনে গল্প লেখার এই ভিন্ন প্রস্তাব যথেষ্ট সারা ফেলেছিল সেই সময়। ধর্মতলার কর্পোরেশন বিল্ডিং-এর পাশে একটা পার্কে চিত্রশিল্পীরা যে ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন সেখানে *এই দশক* পত্রিকার তরফের যে স্টল তাতে পত্রিকার সঙ্গে রাখা

হয়েছিল টোম্যাটো, ফুলকপি, বেগুন ইত্যাদি। সাহিত্য শিল্প সম্পর্কে লেখক শিল্পীদের মধ্যে যে বস্তাপচা বুর্জোয়া ন্যাকা ন্যাকা ভাবনা কাজ করে তাকেই আঘাত করতে চেয়েছিলেন শাস্ত্রবিরোধীরা কিংবা বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে পত্র-পত্রিকার স্টলে একটি দাঁড়িপাল্লা করেছিলেন একবার শাস্ত্রবিরোধীরা। যাতে একদিকে ছিল কমার্শিয়াল গল্প-উপন্যাস আর একদিকে ছিল কাঁচকলা, এঁচোড় প্রভৃতি। অর্থাৎ বাজারে যে উপন্যাস যে গল্প বিকোয় তার স্বরূপ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন শাস্ত্রবিরোধীরা। শাস্ত্র-বিরোধী সাহিত্যের *দশ বিধি* প্রচার করেছিলেন রমানাথ রায়-

"১) শিল্পের রাজ্য থেকে সমস্ত তত্ত্ব ও দর্শনের আমূল উৎখাত।

২) যা ছিল এতকাল গম্ভীর এবং যুক্তিপূর্ণ তাই হাস্যকর।

৩) শিল্প ও সাহিত্যে শাস্ত্রসম্মত পথকে বর্জন করতে হবে। শিল্পের ইতিহাস আঙ্গিকের বিবর্তনের ইতিহাস।

৪) জীবন সম্পর্কে কোন রকমের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা করা বা মত দেওয়ার আমরা বিরোধী।

৫) সৎ, অসৎ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, পাপ, পূণ্য ইত্যাদির ধারণা রীতিমত সংস্কারাচ্ছন্ন এবং বিরক্তিকর। এসব শব্দগুলো আমাদের কাছে এখন একেবারে অর্থহীন।

৬) পরীক্ষামূলক সাহিত্য কথাটা একেবারে নির্বোধের উক্তি। সাহিত্য আর যাই হোক গবেষণাগার নয়।

৭) মহৎ সাহিত্য বা চিরকালের সাহিত্য বলে কোন সাহিত্য নেই সব সাহিত্য নিজের কালের এবং যুগের।

৮) গল্প ও উপন্যাস থেকে পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক বা আঞ্চলিক সমস্যা, মনস্তত্ত্ব, প্রেম বা অপ্রেম, ভাবুকতা এবং বুদ্ধিমত্তাকে বর্জন করতে হবে।

৯) সাহিত্য থেকে সেকেলে কার্যকারণবাদকে ছুঁড়ে ফেলা হোক।

১০) সাহিত্য দীর্ঘ দিনের সংস্কার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হোক।"[২২]

মলয় রায়চৌধুরীর মতে,

> "হাংরিরা মাস সারকুলেশন কাগজপত্রের সুযোগ সুবিধা পায়নি তেমন। শ্রুতি শাস্ত্রবিরোধীরা কেউ কেউ নিজের চেষ্টায় ওইসব জায়গায় ঠাঁই করে নিতে পেরেছেন। হাংরি শ্রুতি শাস্ত্রবিরোধী যারই শরিক হন না কেন আগের দশকের তুলনায় ষাটের কবিরা অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন। যার দরুণ সমবেত ভাবে লেখালেখি করা সত্ত্বেও তারা নিজেরা একটুতেই লড়ে গেছেন। নানা আন্দোলন হলেও ষাটের কবি লেখকরা সেভাবে একজোট হতে পারেননি। যেভাবে চল্লিশ বা পঞ্চাশের বিভিন্ন লবির বিভিন্ন ধারণার বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন পার্টির বিভিন্ন খবরের কাগজের কবি লেখকদের নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া ছিল।"[২৩]

গল্পের নতুন বিষয় ও ফর্মের কথা বললেও শাস্ত্র বিরোধীদের প্রস্তাব কখনোই হাংরিদের মতো এত চিৎকৃত ছিল না। তবে মলয় রায়চৌধুরীর কথা অনুযায়ী প্রায় পাশাপাশি সময়ের এই দু'টি আন্দোলন গড়ে উঠলেও এদের মধ্যেকার মিল বা অমিল বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ধারার আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কলকাতা থেকে অনেক দূরে দুর্গাপুর শিল্প নগরীতে ১৯৭০ সালে সুধাংশু সেন, রবীন্দ্র গুহ, বিমান চট্টোপাধ্যায়, মৃনাল ভৌমিক প্রমুখের চেষ্টায় শুরু হয়েছিল 'নিম সাহিত্য আন্দোলন'। *নিম সাহিত্য* পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলায় না সাহিত্য, অল্প সাহিত্য, তিক্ত-বিরক্ত সাহিত্যের সূচনা হয়। গোটা পত্রিকা জুড়ে এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বলার চেষ্টা করছেন নানা স্লোগান- 'সাহিত্য অভিজ্ঞতার ফর্ম নয়', 'অবিকৃত অভিজ্ঞতাই সাহিত্য' আথবা 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ইশারায় বলে দিন' অথবা 'না সাহিত্যে গোপনতা বা চতুরতা বলে কিছু নেই'। *নিম সাহিত্যে* - র মূল কথাগুলিকে সংক্ষেপে সূত্রায়িত করতে গেলে-

> "১) নিম গল্পই মানুষের একমাত্র বজ্রমেরুদণ্ড। সমগ্র শরীর উলঙ্গ করে মস্তিষ্কের ভিতর কেউ যদি স্থাপনা করে উদগ্র ছোরা, বুকের মধ্যে অবাস্তব হৃদয়ের পাশে

উড়িয়ে দেয় তটস্থ বিষফড়িং, এবং আকছার চাঁদ নয় শুধুই নগ্ননীল মাতাল ফানুস তাহলে কেমন হয়।

২) লেখকের লেখনী থেকে কখনো বেরোয় তিক্ত বিরক্ত গরল ভেদবমি কখনো কটু প্রস্রাব আবার কখনো মাতৃস্তন্যের মত ধবল দুধের ধারা। মানুষের সুখের ভাষা আর হাতের কলম আজ সমান শক্তিশালী।

৩) ঘন্টায় ঘন্টায় আকাশের চেহারার মত মানুষের সুখের রঙও পাল্টায়।

৪) আপ্তবাক্যের সাথে সহমত পোষণ না করেই নির্দ্বিধায় বলা যায় জীবনের যাবতীয় স্থাবর দুর্ঘটনাই- নিম সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু।

৫) জীবনের কোন ব্যাখ্যা নেই কার্য কারণের ভবিষ্যৎ নেই জীবনের কোন ধর্ম নেই কার্য কারণের কোনো ব্যাখ্যা নেই।

৬) নিমভাষার গদ্যছন্দ বলে কোনো কথা নেই, যখন যা কিছুর দ্বারা সংক্রামিত গু মুত থুতু লালা অগ্নি গরল রক্ত প্রেম হিংসা সাহিত্যের শরীরে লেপে দিন। জামার হৃদপিণ্ডের নীচে চাবি। হৃদপিণ্ডের নীচে নিম সাহিত্য অপল্কা মানুষ ক্রমশঃ শিল্পহীনতার দিকে বন্ধনহীনতার দিকে।”[২৪]

ইস্পাত নগরীর কলকারখানায় কাজ করা একদল সাহিত্যপ্রেমী তরুণের হাতে তৈরি হওয়া এই আন্দোলনের অন্যতম বিমান চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচারণা করেছেন-

“একচুল অন্যমনস্ক হলেই অ্যাকসিডেন্ট। যদিও জ্ঞানভারী এক সেফটি ডিপার্টমেন্ট মিটিয়ে দেয়, হাত কাটা গেলে এত- পায়ের এত- আঙুলের, ডেটলের পয়সা শুধু। মৃত্যুর দাম কিছু বেশি। কিন্তু এসবই আইনসম্মত। ফলে ক্ষুধার দাম আরও অনেক বেশি। অতঃপর তারা জেদি, তারা বেপরোয়া! কিন্তু ক্ষমতা কতটুকু? রাজা ক্যানিউট নয় তারা - যে বলবে, খবরদার পার্লামেন্ট, স্টপ রোলিং, মন্ত্রী স্টপ মেল্টিং, ম্যানেজমেন্ট স্টপ নাইট শিফট, অতএব এই অ্যাঙ্গার এই খেদ-ভেন্টিলেশনের প্রবল চাপ। সত্তর দশকে তখন নকশাল আন্দোলন। খুন-খারাবিতে পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল। খতমের তালিকায় নিম লেখকদেরও নাম। কারণ নিম অপসংস্কৃতি। দেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা। নৈরাজ্য। নীতিবাগিশদের বক্তৃতা এসবও প্রভাবিত করল তাদের মানবিক সম্পর্ক বিন্যাসের উপলব্ধিকে”[২৫]

হাংরি জেনারেশনের ঢেউ থেমে গেলেও ক্ষুধা কিংবা নৈরাজ্যের বাতাবরণ ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য আকাশ থেকে মুছে যায়নি। আর যায়নি বলেই একের পর এক নতুন ভাবনা নতুন আন্দোলন গল্প এবং কবিতার ক্ষেত্রে ছয়ের দশক কিংবা সাতের দশক কিংবা তারপরেও আমরা গড়ে উঠতে দেখব যার অন্যতম প্রেরণা অবশ্যই 'নৈরাজ্যের হাংরি জেনারেশন আন্দোলন'।

শাস্ত্রবিরোধী গদ্যকার হিসেবে আগেই প্রসিদ্ধি পাওয়া সুব্রত সেনগুপ্তের সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ১৯৭০ সালের মে মাসে *গল্প* পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে সূচনা করে 'গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী গল্প আন্দোলন'। কেন হঠাৎ এই আন্দোলন? *গল্প* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছেন-

> "সাহিত্য ক্রমশঃ চাকরদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। এদের কেউ রাজনীতির আবার কেউ বক্তব্যের চাকর। আমরা চাই সাহিত্যকে চাকরদের হাত থেকে মুক্ত করতে। আমাদের পত্রিকা সাহিত্যকে মুক্ত করার এই আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠুক। কিন্তু সাহিত্যকে আমরা কোন কিছুর হাতিয়ার করতে চাই না।"[২৬]

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের প্রচলিত গল্পের বিরোধিতা করে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পায় সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল *গল্প* পত্রিকা। সুব্রত সেনগুপ্ত, পার্থ গুহবক্সী, আশিস মুখোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর নন্দী, তাপস চৌধুরী, সমীর কান্তি বিশ্বাস, প্রিয়ব্রত বসাক, অতীন্দ্রিয় পাঠক, হেমন্ত প্রধান, সুকুমার ঘোষ, সুনীল জানা, বলরাম বসাক, সুব্রত নিয়োগী, সুবিমল মিশ্র প্রমুখরা এই *গল্প* পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'গল্পতন্ত্র নিপাত যাক' একটি নিবন্ধে গল্পের ছক ও গল্প তত্ত্বের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন যে যে ফতোয়া জারি করার চেষ্টা করেছে সেগুলি হল-

> "ক) গল্পে থাকতে হবে সাধারণ ও অসাধারন মানুষদের সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন, ভয়, ভালোবাসার কাহিনী।

খ) প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলা এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পাত্র-পাত্রীর যেরকমটি হওয়া উচিত ঠিক সেরকম কার্যকলাপ দেখিয়ে দেওয়া।

গ) কোন বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগে লেখকের খেয়ালখুশিমত চরিত্রদের মানসিক বিশ্লেষণ করা।

ঘ) গল্পের ছোট পরিসরে 'হৃদয়ের গভীর আবেদন', 'সমাজব্যবস্থার অসমতার ইঙ্গিত' ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া এবং পাঠকের মন করুণরস কিংবা রৌদ্ররসে ভরিয়ে দেওয়া।

ঙ) গল্প জুড়ে নির্দিষ্ট কোন সমাপ্তির ভিত তৈরী করা এবং গল্পের শেষে মোড় ঘুরিয়ে পাঠককে চমকে দেওয়া।

চ) ... ...

উপযুক্ত গল্পতন্ত্র বা চাকর সাহিত্যের বিরোধিতা করে 'একেবারে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এই ফতোয়া জারি করা হলঃ

১) এখন থেকে লেখক কিভাবে একটি গল্প গড়ে তোলেন, সেই বিশেষত্বের উপরে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২) গল্প পড়ার আগে থেকেই কোন নির্দিষ্ট প্রত্যাশাকে পুষে রাখা চলবে না। কোন লেখক অমুকভাবে গল্প লিখেছেন, তিনি কেন তমুকভাবে আরেকটি গল্প লিখলেন ; এই ধরণের অভিযোগ করা ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু নয়।

৩) অন্যের জীবনকাহিনীর বদলে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা গল্পের মধ্যে পাওয়া গেলে, লেখক কি বলতে চেয়েছেন তা নিয়ে হইচই করা চলবে না।

৪) লেখক যদি বাস্তব জগৎ এবং নিজের মনোমত জগৎ, এই দুটিকে একাকার করে দেন, তবে সেই জগৎকেই পাঠককে নিজের করে নিতে হবে।

৫) লেখক পাঠককে কোন অসমাপ্ত জায়গায় ছেড়ে দিতে পারেন, যেখানে পাঠককেই রহস্য ভেদ করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

৬) প্রতিদিন অন্তত একটি গল্প পড়ার অভ্যাস তৈরী করতে হবে।"[২৭]

গল্প লেখার চিরাচরিত পদ্ধতিকে অস্বীকার করে অচিন্ত্য কুমার সাঁতরার নেতৃত্বে *এবং নৈকট্য* পত্রিকার মধ্য দিয়ে সাতের দশকের সূচনায় 'ঘটনা প্রধান গদ্য আন্দোলন' শুরু হয়। এই পত্রিকার প্রচ্ছদে লেখা হত "ঘটনা প্রধান 'এবং নৈকট্যে' গল্প বা গপ্পো অথবা ঐ জাতীয় কিছু ঠাট্টা মস্করা পাঠানো বন্ধ রাখলে কৃতজ্ঞ থাকবো।"[২৮] 'গল্প' শব্দের বদলে এরা উৎসাহী ছিলেন 'ঘটনা' শব্দের ব্যবহারে এবং আবহমান গল্প কীভাবে ভাঁওতা দিয়ে পয়সা রোজগারের ফিকির অথবা পাঠক ও লেখকের মধ্যে শুদ্ধ নির্বিকার ঘটনারই নামান্তর সে বিষয়ে এ আন্দোলন মনোনিবেশ করেছিল। 'সাহিত্যে গপ্প গল্প বড়োগল্প ছোট গল্প ঘটনা' এই শীর্ষক দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে এঁদের মূল বক্তব্য বুঝে নেওয়া যেতে পারে —

> "মানুষের জীবনকে নিয়ে আর কতদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নাম করে গপ্পো ফাঁদবেন? আর কতদিন সহানুভূতির ন্যাকা মুখোশ পরে স্যাণ্ডউইচ খেয়ে থুতু দিয়ে চোখের পাতা ভেজাবেন? আর কতকাল এভাবে ঈশ্বর সেজে সর্বজ্ঞ হয়ে অত্যাচার চালাবেন???"[২৯]

বাংলা ছোট গল্পের ধারায় এতকাল পর্যন্ত প্রায় রাজনীতি সমাজনীতি মনস্তাত্ত্বিক দর্শন ইত্যাদি সমস্ত কিছুই জায়গা পেয়েছে, যা জায়গা পায়নি তা কেবলমাত্র 'গল্পের আত্মার কথা'। তাই বর্তমানে দরকার গল্পের গল্পত্ব সরিয়ে ফেলা, story-র পাল্টা anti story তৈরি করা। *এবং নৈকট্য* পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৯৭৩-এর শেষ প্রচ্ছদে প্রকাশিত ইস্তেহারটি এরকম—

> "কেন গল্প নয়-শুধু সাহিত্যশ্রয়ী ঘটনা, কেন কেউ নয়-শুধু আমি।
>
> যেহেতু কোনো মাধুর্যই কোনো মানুষের অন্তরঙ্গ জগতের কোন খোঁজ পায় না-তাই, এতকাল ধরে মানুষের সুখ, দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, প্রেম প্রভৃতি নিয়ে লেখার মধ্যে যে ধরণের দেবতাইজমের ছড়াছড়ি চ'লে আসছে- সাধারণের কাছে সেগুলোর সংজ্ঞা ঠিকই, অর্থাৎ বানিয়ে বানিয়ে তৈরী একটা গপ্প ; যা কিনা পুরোপুরি মিথ্যের ওপর দাঁড় করান। কেননা জনমানসে 'গল্প' শব্দটা একটা সময়কাটান,

খোসমেজাজী, কপট রাগ কিংবা দুঃখ কিংবা আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে। আর এ কারণেই কারুর জীবনের কোন ঘটনাকে আমরা 'গপ্প' বলে সস্তা করে দিতে চাই না- বদলে বলব 'ঘটনা'। যার মূল সূত্রঃ ১) লেখকের শোনা, ভাবা, দেখা খানিকটা সময়, ২) চারপাশের দৃষ্টিগ্রাহ্য, শ্রুতিগ্রাহ্য কোন বস্তু বা ব্যক্তি এবং লেখক, ৩) লেখকের আত্মা এবং লেখক। আর এগুলোর সত্যতা নির্ভর করছে 'আমি' নামক শব্দের মূখ্য ভূমিকায়। 'আমি' হল আমারই জটিল মানসিকতা অর্থাৎ লেখার মধ্যে সাবজেকটিভ ভূমিকার আবির্ভাব। ঘটনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বিষয় নিরপেক্ষতা। প্রকৃত ঘটনায় তাই দার্শনিকতা, মনস্তত্ব, ধারণা, ধর্মীয় আচরণ, ন্যায়নীতি, রাজনীতি ইত্যাদির স্থান থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। তাই আমাদের বক্তব্য : সমস্ত রকমের 'গল্প' সরিয়ে বিষয়-নিরপেক্ষ ঘটনাই উল্লেখিত করা। অথচ যার মধ্যে নিহিত রয়েছে সাহিত্যের আত্মমগ্নতা, সত্যতা এবং সৌন্দর্য।"[৩০]

ছয়ের দশকের একদম শুরুতে হাংরি জেনারেশন কবিতায় শব্দ ব্যবহারের কিংবা গল্পে প্রকরণ বিন্যাসের যাবতীয় নিয়মকে পালটে ফেলতে চেয়েছিল। সমাজ, পৃথিবী, মানুষ দেখবার চোখকেও পালটে ফেলার একাধিক প্রস্তাবনা তৈরি করেছিল 'হাংরি জেনারেশন'। এর কত বছর পর ১৯৭৮ সালে বাংলা সাহিত্যে একটি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল যার নামই 'নতুন নিয়ম'। আশিস মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশনায় *নতুন নিয়ম* পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা। 'গল্প রীতি' প্রসঙ্গে এই পত্রিকাটি ১০ টি সূত্র হাজির করার চেষ্টা করেছিল-

১. পুরানো কোন নিয়মকে আশ্রয় করে সৎ এবং শুদ্ধ সাহিত্য রচনা অসম্ভব।

২. কাহিনী বা প্লট আর নয়।

৩. গল্পে থাকবে শুধু শব্দ। শব্দই আজ ছোট গল্পের প্রধান উপকরণ শব্দচয়ন শব্দগঠন শব্দস্থাপনকেই জরুরী মনে করি।

৪. শব্দই নির্দেশ দেবে চরিত্র বা চরিত্ররা কোথায় কখন কিভাবে বসবে দাঁড়াবে চলবে থামবে এবং কথা বলবে। শব্দ যেখানে গিয়ে একেবারে থামবে অর্থাৎ

যতদূর গিয়ে তার আর এগিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকবে না, গল্প সেখানেই শেষ হবে।

৫. গল্পে কাহিনী নয় বিষয় থাকবে যা শব্দের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

৬. বক্তব্য বা তত্ত্বপ্রচারের ক্ষেত্র আর যাই হোক, গল্প নয়।

৭. নতুন শব্দ ও নতুন বিষয় সার্থক ছোট গল্প হয়ে ওঠে যখন সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নতুন আঙ্গিকের ওপর নিজস্ব আঙ্গিক তৈরী করতে হবে লেখককে।

৮. অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচন করাই হবে আমাদের প্রধান কাজ।

৯. পাঠকও লেখকের অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে চায়।

১০. পাঠক গতানুগতিক কাহিনীর ঘোলা জল থেকে নিষ্কৃতি চাইছে। উপমা, অলংকার ও বিশেষণের ব্যবহার বিরক্তিকর। আবেগময় প্রাকৃতিক বর্ণনায় তারা ক্লান্ত বোধ করছে। লেখকের কোন কিছুতে উচ্ছ্বাস করাকে তারা ভাল চোখে দেখছে না।"[৩১]

চেনা নিয়মের বাইরে গল্পকে নিয়ে যেতে, সাহিত্যের নতুন বিন্যাস তৈরি করতে নতুন নিয়মভঙ্গকারীরা নিয়ম বর্জন করতে চেয়েছেন যুক্তিসঙ্গত ভাবে, বস্তুকে বিশ্লেষণ করে। প্রচলিত মানসিকতার বিরুদ্ধ চর্চাকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাদের 'নতুন নিয়ম আন্দোলনে'। ১৯৭৩ এর জুলাই মাসে *ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো* পত্রিকা প্রকাশ করে অমল চন্দ বলতে চান,

"কোন সমস্যা নিয়ে গল্প লেখার দিন আর নেই, কিন্তু গল্প লেখার সমস্যাটা আছে, থেকে যাবে। ইচ্ছে হলে একটা গল্প ফাঁদা চলে গল্প লেখা চলে না। দ্বিতীয়টা নিয়ে সমস্যা, প্রথমটা ছাঁচে ঢালা। ছাঁচে ঢেলে দিলে প্রথমটা হতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টার বেলায় কোনো ছাঁচ নেই বলেই ভাবতে হয় কেমন করে লিখব।"[৩২]

গল্প বা উপন্যাস লেখার যাবতীয় তত্ত্বের ছাঁচকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল এই আন্দোলন। ১৯৬৯ সালে অজিত দেব ও সুধীর দাস 'সমন্বয়-ধর্মী গল্প আন্দোলন' শুরু করেন গতানুগতিক গল্প ধারার বিপরীতে। এঁদের বক্তব্য ছিল-

"১. সমন্বয়-ধর্মী গল্প আদি-মধ্য-অন্ত নিয়ে গঠিত কোন গল্প নয়।

২. সমন্বয়-ধর্মী গল্প যে সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রচলিত শিল্পগুণ-সম্মত হবে, তাও নয়।

৩. সমন্বয়-ধর্মী গল্প প্লটলেশ, দীর্ঘ সংলাপহীন, কেবলমাত্র অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল, তাও নয়।

৪. আমরা চাই উভয়ের সমন্বয় সাধন। এমন গল্প যা টগবগ করে ফুটবে। এতে কী থাকবে কী থাকবে না তা নির্ভর করবে গল্পের ফর্ম ও তার বিষয়বস্তুর ওপর। আমাদের গল্প হবে গল্প জগতের সকল প্রকার সংস্কার মুক্ত। যার নাম সমন্বয়-ধর্মী গল্প।"[৩৩]

১৯৮০ তে *ছয়* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে শুরু হয় 'গাণিতিক গল্প আন্দোলন'। চিরঞ্জয় চক্রবর্তী, অনুপ সেনগুপ্ত, অরিন্দম দাস, মানস বসু, প্রবুদ্ধ ভট্টাচার্য ও ঐন্দ্রিলা সেনগুপ্তার প্রচেষ্টায় গাণিতিক সাহিত্যের মুখপত্র হিসেবে 'ছয়-৬' প্রকাশ পেয়েছিল। 'গাণিতিক গল্প আন্দোলন' আলাদাভাবে কোনো 'ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ না করলেও পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে গাণিতিক গল্প বিষয়ে তাদের অবস্থান জানাতে চেয়েছেন। গল্প লেখা হয় আসলে একটা সময়কে কেন্দ্র করে, এই সময়ের ধারণাই সেই গল্পের ভেতরকার পাত্র-পাত্রী এবং পরিবেশকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। সময়ের ধারণার সঙ্গেই মিলে আছে গণিতের হিসেব। তাই গণিত এবং সাহিত্য পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।

"এখন থেকে সব কিছু ছয় সংখ্যক করুন। কারণ সত্তরের দশক পর্যন্ত পাঁচ তারকা ছিল এখন ছয় তারকা। ছয় চান। ছয় নিন। ছয় বলুন। ছয় পড়ুন। ছয় পড়ান। ছয় দেখান। ছয় বানাবার কথা বলুন এবং ছয় হোন। জীবন ছয়ময় করুন। এবং অবশ্যই ছয়ময় করার আগে পাঁচময় হোন। তারও আগে চারময় তারও আগে...। নতুবা জীবন ছয়ময় করলেও আপনাকে পাঁচময় মতো দেখাবে, শোনাবে এবং বলাবে। ধাপে ধাপে আসুন। আমরা ধাপ বর্জনকারীদের পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে হত্যা করব মনস্থ করেছি।

অনেকেই স্থিতিশীল জীবন চায়, ছয় চায় না। সুতরাং যারা স্থিতিশীল জীবন চাইছেন, অথচ ছয় সেজে বসে আছেন, তাঁরা নিপাত যান। তাঁরা পাঁচময় হোন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে পঞ্চমপৃষ্ঠায় তাঁদের স্থান হোক।

> ছয়-২ পড়ার পর যদি মনে হয় আপনার শরীর অথবা মন অস্থির হয়ে পড়েছে, ওষুধ প্রয়োজন। জানবেন এর একমাত্র ওষুধ দ্বিতীয়বার ছয়-২ পড়া"।৩৪

চিরঞ্জয় চক্রবর্তী প্রচারিত এই বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে যায় পাঠকের কাছে তবু এই বক্তব্যে স্থিতিশীল অবস্থার বিরোধিতা যে করা হয়েছে তা স্পষ্ট এবং তার জন্যই 'ছয়' পড়া জরুরী।

কবি অরুণ মিত্রের মতে,

> "বাংলা সাহিত্যে একটি নির্দিষ্ট ম্যানিফেস্টোর ভিত্তিতে আন্দোলনের সৃষ্টি করা, তার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন সেটা কিন্তু হাংরি জেনারেশন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য বা গন্তব্য সম্পর্কে মতদ্বৈধতা থাকতেই পারে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তারা একটা অধ্যায় এটা মানতেই হবে।"[৩৫]

সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের আবহমান ফর্ম, প্রকরণ বিন্যাসকে ভাঙার ডাক দিয়েছিল হাংরি জেনারেশন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একে একে সেই আন্দোলনকারীরা সরে গেছেন তাদের অবস্থান থেকে। পারস্পরিক বিশ্বাসঘাতকতায় একে অপরের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন কখনো কখনো। কিন্তু তবুও ছয়ের দশকের শুরুতে যে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিল এই আন্দোলন পরবর্তী কয়েক দশক জুড়ে যেন তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে। এজন্যই আমরা যে আন্দোলনগুলোর উল্লেখ করলাম তাদের নামের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যাবে বিদ্রোহ এবং স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই আন্দোলনগুলোর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। কোনটা 'নিম সাহিত্য আন্দোলন', কোনটায় 'শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' কোনটায় 'ছাঁচ ভেঙে ফেলার আহ্বান' কিংবা কোন আন্দোলনে 'ধ্বংসকালীন কবিতার' প্রস্তুতি। এই সমস্তই আসলে হাংরি জেনারেশন যে নৈরাজ্য তথা নতুন সাহিত্যের দিশারি হয়ে উঠতে পেরেছিল তারই অনিবার্য পরিণতি।

তথ্যসূ :

১. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৯৪ : ৭৯

২. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ২০১১ : ২৯

৩. ঘোষাল, ধনঞ্জয়, মাইতি, প্রগতি ও মজুমদার, দেবাশিস (সম্পা.), ২০১৪ : ৩৪

৪. তদেব : ৩৬-৩৭

৫. তদেব : ৩৯-৪০

৬. তদেব : ৪১-৪৩

৭. দত্ত, সন্দীপ, ১৯৯৩ : ৮-৯

৮. তদেব : ৯

৯. ঘোষাল, ধনঞ্জয়, মাইতি, প্রগতি ও মজুমদার, দেবাশিস (সম্পা.), ২০১৪ : ৫৭

১০. তদেব : ৫৯

১১. দত্ত, সন্দীপ, ১৯৯৩ : ১০

১২. তদেব : ১১-১২

১৩. তদেব : ১৪-১৫

১৪. তদেব : ১৫-১৬

১৫. তদেব : ১৭

১৬. ঘোষাল, ধনঞ্জয়, মাইতি, প্রগতি ও মজুমদার, দেবাশিস (সম্পা.), ২০১৪ : ২৩

১৭. তদেব : ২৪

১৮. তদেব : ২৬

১৯. তদেব : ২২-২৩

২০. দাশ, উত্তম, ২০১৩ : ৯৬

২১. ঘোষাল, ধনঞ্জয়, মাইতি, প্রগতি ও মজুমদার, দেবাশিস (সম্পা.), ২০১৪ : ১৭

২২. দাশ, উত্তম, ২০১৩ : ১০৬

২৩. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৯৪ : ৭৪

২৪. দত্ত, সন্দীপ, ১৯৯৩ : ৩৭

২৫. গোস্বামী, গৌতম, ২০১৫ : ৩৯-৪০

২৬. দত্ত, সন্দীপ, ১৯৯৩ : ৩৯

২৭. তদেব : ৪০-৪১

২৮. তদেব : ৪১

২৯. তদেব : ৪২

৩০. তদেব : ৪৫

৩১. দত্ত, সন্দীপ, ১৯৯৩ : ৪৬

৩২. তদেব : ৪৮

৩৩. তদেব : ৪৯

৩৪. তদেব : ৫০

৩৫. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৯৪ : ২৫

উপসংহার

সমাজ যে শৃঙ্খলা তৈরি করে, যে নিয়ম বানায়, তা আসলে কিছু নির্দিষ্ট মানুষের সুবিধা ভোগের জন্যই। যে কোনো ব্যক্তি মানুষ যিনি আসলে স্বাধীনতা পছন্দ করেন, যিনি আসলে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাকে এই তথাকথিত সামাজিক শৃঙ্খলার বিচারে বিশৃঙ্খলই বলা হবে। যুগে যুগে নৈরাজ্যের দার্শনিকদের প্রতি তথাকথিত সমাজকর্তারা এই বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তথাকথিত সাহিত্যবেত্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই রকম মতামত পোষণ করেছেন। তথাকথিত সৌন্দর্যের তত্ত্ব, তথাকথিত আবহমান পাঠের অভ্যেস, সমাজ যে সমস্ত শব্দকে দূষণীয় বলে মনে করে, বর্জনীয় বলে মনে করে তাদেরকেই গদ্যে বা পদ্যে তুলে আনার প্রবণতা — এই সমস্ত কিছুকেই চিহ্নিত করে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় নাকচ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন মূল ধারার একাধিক সাহিত্য সমালোচক। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈরাজ্যের মধ্যে অসহায় হতাশ মানুষের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর পাল্টা নৈরাজ্যই হতে পারে একমাত্র আত্মপ্রকাশ তথা আত্মপরিচয় গড়ে তোলবার অস্ত্র এবং এই অস্ত্রে ভর করেই বাংলা সাহিত্যের ধারায় যুক্ত হয়েছিল হাংরি জেনারেশন আন্দোলন। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের তৈরি হওয়া, তার বিস্তার এবং এই আন্দোলনের ফলে তৈরি হওয়া বিভিন্ন সাহিত্যিক নমুনাগুলোকে সামনে রেখে আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম যে শব্দবিন্যাস থেকে শুরু করে বিষয় প্রকরণ পর্যন্ত কিভাবে বিশৃঙ্খলার সৌন্দর্য তৈরি করতে চেয়েছিলেন এই হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লেখকরা। সুন্দরের ধারণার যে তথাকথিত মেকি চাদর নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে তৈরি করে রেখেছে, তাকে সরিয়ে দিয়ে, চিৎকৃত অসুন্দরের সৌন্দর্যকে হাংরি জেনারেশন আমাদের সামনে তুলে ধরে। ছয় ও সাতের দশকের ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক বাস্তবতা এই আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার

পক্ষে অনিবার্য ছিল। পাশাপাশি এই আন্দোলন শুধুমাত্র যে সাহিত্যকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল তাই নয়, '৬১-'৬২-র এই আন্দোলন সৃষ্টি হওয়া, '৬৫ সালে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত অভিযান, মামলা, এই সমস্ত ঘটনার কয়েক বছরের মধ্যেই গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আর এক রাজনৈতিক নৈরাজ্যের আহ্বান আমরা শুনতে পাই। সাহিত্যক্ষেত্রে এই আন্দোলন যেমন প্রথাকে ভেঙে ভিন্ন পথে হাঁটতে চেয়েছিল, রাজনীতির ক্ষেত্রেও এইরকম একদল তরুণ তুর্কিরা প্রথাকে ভেঙে নতুন পথে পৃথিবীকে তথা দেশকে সাজিয়ে নেওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে কৃষক বিদ্রোহের নিশান তুলতে চেয়েছিলেন গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। ইস্তেহার লেখা, রাতের অন্ধকারে বা বিভিন্ন সময়ে গোপনে সেসব ছড়িয়ে দেওয়া, সংগঠকদের মধ্যে নিজস্ব মতের বিভ্রান্তি, তর্ক এবং শেষ পর্যন্ত হঠাৎ জ্বলে উঠেই সেই আন্দোলনের শেষ হয়ে যাওয়া আমাদেরকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গে নকশালবাড়ির রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আশ্চর্য সমাপতন মনে করিয়ে দেয়। আমাদের অনুমান, নৈরাজ্যই এই সময়ের সেই অমোঘ প্রবণতা যা একই সঙ্গে সাহিত্য এবং রাজনীতিকে প্রতিবাদে মাথা তুলে দাঁড়াতে প্রভাবিত করেছিল, প্ররোচিত করেছিল। এই প্রতিবাদের স্পর্ধাতেই শব্দ ব্যবহারের, বিষয়চিন্তার, আঙ্গিকসজ্জার প্রতিবাদী একাধিক বিচিত্র ধরন তথা এক্সপেরিমেন্টের মধ্য দিয়ে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন তার পরবর্তী সময়ের সাহিত্যে বেঁচে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৬৭, *জন্মনিয়ন্ত্রণ,* কলকাতা, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী।

২. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৭৪, *অপরাধীদের প্রতি,* কলকাতা, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী।

৩. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৮০, *দরজাখোলা নদী,* কলকাতা, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী।

৪. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ২০০০, *আমাদের জীবনানন্দ তাহাদের জীবনানন্দ,* কলকাতা, প্রতিভাস।

৫. ঘোষ, শৈলেস্বর, ১৯৯৫, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, কলকাতা, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী।

৬. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ২০১২, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৭. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ২০১২, *প্রতিবাদের সাহিত্য,* কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

৮. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ২০১১, ক্ষুধার্ত সংকলন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৯. ঘোষ, অরুণেশ, ২০১৩, *আমার কবিতাযাত্রা,* কলকাতা, নাটমন্দির।

১০. ঘোষ, অরুণেশ, ২০১৪, *গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা, নাটমন্দির।

১১. চৌধুরী, প্রদীপ, ১৯৮৩, *কালোগর্ত,* কলকাতা, স্বকাল ফুঃ।

১২. চৌধুরী, প্রদীপ, ১৯৯৯, *রচনাবলী ১,* কলকাতা।

১৩. বসাক, সুবিমল, ২০১৪, *এখনও কোনো ব্যবস্থা হয়নি,* কলকাতা, ভাষালিপি।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, সেন, সব্যসাচী (সম্পা), ২০১৭, *সুভাষ ঘোষ ১,* কলকাতা, গাঙচিল।

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০১৯, সুভাষ ঘোষ বইসংগ্রহ ২, কলকাতা, গাঙচিল।

১৬ বসু, শেখর (সম্পা.), ২০১০, *শাস্ত্রবিরোধী গল্প,* কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

১৭. ভট্টাচার্য, তন্ময়(সম্পা.), ২০১৬, সুবিমল বসাক সংকলন, হাওড়া, সৃষ্টিসুখ প্রকাশন।

১৮. মিশ্র, বৈদ্যনাথ, ২০১৫, *মলয় রায়চৌধুরীর দীর্ঘ কবিতা জখম অবিনির্মাণ ও বিশ্লেষণ,* কলকাতা, চন্দ্রগ্রহণ।

১৯. রায়, দেবী, ১৯৯৮, *নির্বাচিত কবিতা,* কলকাতা, দীপ প্রকাশন।

২০. রায়, ফাল্গুনী, ১৯৯৬, *আমি অপদার্থ,* কলকাতা, গ্রাফিত্তি।

২১. রায়চৌধুরী, মলয় , ১৯৯৪, *হাংরি কিংবদন্তী,* প্রকাশক সমীর রায়চৌধুরী।

২২. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৮৫, *ইশতাহার সংকলন,* মহাদিগন্ত।

২৩. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১২, *প্রবন্ধ সংগ্রহ,* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, আবিষ্কার প্রকাশনী।

২৪. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৫, গল্প সংগ্রহ, কলকাতা, কবিতীর্থ।

২৫. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৬, *নখদন্ত,* গুরুচণ্ডালী।

২৬. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৬, *অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস*, কলকাতা, একটি গুরুচণ্ডাল প্রকাশনা।

২৭. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৭, *মাথা কেটে পাঠাচ্ছি, যত্ন করে রেখো,* কবিতীর্থ।

২৮. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৯, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, কলকাতা, আবিষ্কার।

২৯. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০২০, *আলাপচারিতায় কবি শৈলেশ্বর ঘোষ,* কলকাতা, লিবের ফিয়েরি।

৩০. সাহা, অপূর্ব (সম্পা.), ২০১৭, বাসুদেব দাশগুপ্ত রচনা সমগ্র, কলকাতা, গাঙচিল।

৩১. সাহা, অপূর্ব (সম্পা.), ২০১৯, বাসুদেব দাশগুপ্ত রচনা সমগ্র ২, কলকাতা, গাঙচিল।

সহায়ক গ্রন্থ :

বাংলা

১. আচার্য, অনিল (সম্পা.),২০১৪, *সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, অনুষ্টুপ।

২. আইয়ুব, সালাহউদ্দীন, ২০১৪, *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

৩. ইসলাম, আমিনুল, ২০১৯, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

৪. ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল, ১৯৯৫, *নন্দনতত্ত্ব,* ঢাকা, বাংলা একাডেমি।

৫. কবিরাজ, নরহরি, ২০১৪, *কাকে বলে উত্তরাধুনিকতাবাদ?,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী।

৬. গুপ্ত, অতুলচন্দ্র, ১৪০৯, *কাব্যজিজ্ঞাসা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

৭. ঘোষ, দেবব্রত, নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা), ২০১৫, *প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শতবর্ষে ফিরে দেখা,* কলকাতা, দীপ প্রকাশন।

৯. ঘোষাল, ধনঞ্জয়, মাইতি, প্রগতি, মজুমদার, দেবাশিস (সম্পা), ২০১৪, *বাংলা সাহিত্য আন্দোলন,* কলকাতা, ইসক্রা।

১০. চক্রবর্তী, অমিয়, ১৯৬৩, *সাম্প্রতিক,* কলকাতা, নাভানা।

১১. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ১৯৮১, *রূপ, রস ও সুন্দর*, কলকাতা, ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া।

১২. চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার (সম্পা.), ২০১৫, *হাংরি সাহিত্য আন্দোলন : তত্ত্ব, তথ্য, ইতিহাস*, কলকাতা, প্রতিভাস।

১৩. চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন (সম্পা.), ১৯৯৫, *সাহিত্য শিল্প ভাবনা*, কলকাতা, নবমন প্রকাশন।

১৪. চৌধুরী, সুচেতা, ১৯৮৮, *সঙ্গীত ও নন্দনতত্ত্ব*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

১৫. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, কলকাতা, রূপা প্রকাশনী।

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪২৪, *সাহিত্যের পথে*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ।

১৭. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, ১৯৮৪, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

১৮. দত্ত, সন্দীপ, ১৯৯৩, *বাংলা গল্প কবিতা আন্দোলনের তিন দশক*, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।

১৯. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ২০১৯, *সৌন্দর্যতত্ত্ব*, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন।

২০. দাশ, উত্তম, ২০১৩, *হাংরিশ্রুতি ও শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন*, বারুইপুর, মহাদিগন্ত।

২১. দাশ, জীবনানন্দ, ১৯৫৪, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, নাভানা।

২২. দাশ, জীবনানন্দ, ১৯৯০, *কবিতার কথা*, কলকাতা, সিগনেট প্রেস।

২৩. দাশ, শিশিরকুমার, ১৩৯২, *গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

২৪. দে, বিষ্ণু, ১৯৭৫, *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

২৫. দে, বিষ্ণু, ১৯৮০, *সেকাল থেকে একাল*, কলকাতা, বিশ্ববাণী।

২৬. দে, অরুণকুমার, ১৯৯৩, *কবিতা-আন্দোলন*, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।

২৭. নন্দী, প্রদীপকুমার (সম্পা.), ২০১৪, *শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব*, ঢাকা, অবসর।

২৮. নন্দী, সুধীরকুমার, ১৯৭৯, *নন্দনতত্ত্ব*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

২৯. নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল (অনু.), ২০০২, *শিল্পের স্বরূপ*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৩০. পাল, রবিন, ২০১৪, *কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প*, কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল, ২০১৪, *উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক*, কলকাতা।

৩২. বন্দোপাধ্যায়, হিমবন্ত, ১৯৯৯, *বিষণ্ণতাবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা*, কলকাতা, বিবেক ভারতী।

৩৩. বসু, অতীন্দ্রনাথ, ১৯৬৩, *নৈরাজ্যবাদ*, কলকাতা, রূপা অ্যান্ড কম্পানি।

৩৪. বসু, বুদ্ধদেব, ১৯৮৪, *কবিতার শত্রু ও মিত্র*, কলকাতা, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ।

৩৫. বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পা.), ১৪২০, *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্য সংসদ।

৩৬. বিবেকানন্দ, স্বামী, ১৩৮৭, *বাণী ও রচনা* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।

৩৭. ভট্টাচার্য, জ্যোতি, ১৯৯৬, *নন্দনতত্ত্ব ও মার্কসবাদ*, কলকাতা, অগ্রণী বুক ক্লাব।

৩৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০০০, *মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব,* কলকাতা, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

৩৯. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, ২০২১, *বাঙালির নতুন আত্মপরিচয় সমাজসংস্কার থেকে স্বাধিনতা,* কলকাতা, অবভাস।

৪০. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, ২০২১, *দ্বন্দ্বতত্ত্ব জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, অবভাস।

৪১. ভট্টাচার্য, সাধন কুমার, ১৯৬০, *শিল্পতত্ত্বের কথা*, কলকাতা, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড।

৪২. ভট্টাচার্য, সাধন কুমার (অনু.), ১৩৭৬, *শিল্পতত্ত্ব*, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৩. ভট্টাচার্য, সৌরীন, ২০০৭, *আধুনিকতার সাধ-আহ্লাদ,* কলকাতা, তালপাতা।

৪৪. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, ২০১৭, *মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব,* কলকাতা, অবভাস।

৪৫. ভৌমিক, ননী (অনু.), ২০১৪, *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস,* ঢাকা, অধুনা প্রকাশন।

৪৬. মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পা.), ২০০৯, *নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৪৭. মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, ১৯৯৯, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭)*, কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

৪৮. মুখোপাধ্যায়, বিমল কুমার, ১৯৯১, *রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব*, কলকাতা, দে'জ।

৪৯. মুখোপাধ্যায়, রমেশ, ২০১৮, *পোস্টমডার্নিজম,* কলকাতা, ধ্যানবিন্দু।

৫০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ২০০০, *বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৫১. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পা.), ২০০৪, *মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা,* কলকাতা, সোনার তরী।

৫২. রায়, শিবনারায়ণ (সম্পা.), ১৯৯২, *জিজ্ঞাসা সংকলন*, কলকাতা, প্যাপিরাস।

৫৩. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, ২০১৪, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৫৪. রায়, শিবনারায়ণ, ১৯৯২, *জিজ্ঞাসা সংকলন,* কলকাতা, প্যাপিরাস।

৫৫. সেন, নবেন্দু (সম্পা.), ২০০৯, *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*, কলকাতা, রত্নাবলী।

৫৬. সেল্‌সাম হাওয়ার্ড, ২০১৩, *কাকে বলে দর্শন ?* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কম্পানী।

৫৭. সেন, সুকুমার, ২০১৩, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৫৮. সেন, সুকুমার, ১৯৯৮, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৫৯. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, ১৯৯৭, *জোয়ারভাটার ষাট সত্তর*, কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স।

৬০. সরকার, পবিত্র, ২০১৬, *গদ্যরীতি পদ্যরীতি,* কলকাতা, সাহিত্যলোক।

৬১. সরকার, পবিত্র, ২০০১, *লোক সংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

৬২. সান্যাল, অবন্তীকুমার, ২০০৯-২০১০, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*, কলকাতা, রূপলেখা প্রকাশনী।

৬৩. সিকদার, অশ্রুকুমার, ১৩৮৬, *আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়*, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী।

৬৪. হক, মাসুদুল, ২০০৮, *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী প্রেস।

ইংরেজি

1. Ackelsberg, Martha, 1991, *Free Women of Spain*: *Anarchism and the for the Emancipation ofWomen*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
2. Albro, Ward S. 1992 *Always a Rebel*: *Ricardo Flores Magón and the Mexican Revolution*. FortWorth TX: Texas Christian University Press,
3. Albro, Ward S. 1996 *To Die on Your Feet*: *The Life, Times, and Writings of Práxedis G. Guerrero*.Fort Worth, TX: Texas Christian University Press.
4. Alexandre J.M.E., Christoyannopoulos, ed,2011 *Religious Anarchism*: *New Perspectives*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
5. Amster, Randall. 2012, *Anarchism Today*. Santa Barbara, CA: Praeger,.
6. Antliff, Allan, 2007, *Anarchy and Art*, Canada, Arsenal Pulp Press.
7. Bakunin, Mikhail (Marshall S. Shatz, tr.) 1990, *Statism and Anarchy*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
8. Bayer, Osvaldo (Paul Sharkey, tr.), 2015 *The Anarchist Expropriators*: *Buenaventura Durruti andArgentina's Working-Class Robin Hoods*. Oakland, CA: AK Press.
9. Berkman, Alexander, 1976 *Prison Memoirs of an Anarchist*. New York: Schocken,.
10. Berkman, Alexander. 1977 *ABC of Anarchism*. London: Freedom Press,.
11. Barclay, Harold. 1997 *Culture and Anarchism*. London: Freedom Press.
12. Barclay, Harold. 1998 *People without Government*: *An Anthropology of Anarchy*. London: Kahn &Averill.
13. Bird, Stewart, Dan Georgakas, and Deborah Shaffer. 1985, *Solidarity Forever*: *An Oral History ofthe IWW*. Chicago, IL: Lakeview.
14. Bowen, James and Jonathan Purkis, eds.2004, *Changing Anarchism*: *Anarchist Theory andPractice in a Global Age*. Manchester: Manchester University Press.
15. Bray, Mark. 2013, *Translating Anarchy*: *The Anarchism of Occupy Wall Street*. Winchester, UK:Zero Books.
16. Brenan, Gerald. 1950, *The Spanish Labyrinth*: *An Account of the Social and Political Background ofthe Spanish Civil War*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2nd ed.
17. Buber, Martin (R.F.C. Hull, tr.) 1950, *Paths to Utopia*. New York: Macmillan.

18. Butterworth, Alex. 2011, *The World That Never Was*: *A True Story of Dreamers, Schemers,Anarchists, and Secret Agents*. New York: Vintage.

19. Cahm, Caroline. *Kropotkin*: *And the Rise of Revolutionary Anarchism, 1872-1886*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

20. Caldwell, John Taylor. 1988, *Come Dungeons Dark*: *The Life and Times of Guy Aldred, GlasgowAnarchist*. Edinburgh: Luath Press.

21. Caldwell, John Taylor. 1999, *With Fate Conspire*: *Memoirs of a Glasgow Seafarer and Anarchist*.Bradford: Northern Herald.

22. Camus, Albert (Anthony Bower, tr.) 1991, *The Rebel* (*L'homme révolté*). New York: Vintage..

23. Cassirer, W. H. (Trans.), 1938, *Critique of Judgment*, New York, Routledge.

24. Clark, John P. 2013, *The Impossible Community*: *Realizing Communitarian Anarchism*. London:Bloomsbury.

25. Clark, John and Camille Martin, eds. 2013, *Anarchy, Geography, Modernity*: *Selected Writings ofElisée Reclus*. Oakland, CA: PM Press.

26. Cockcroft, James D. 1868 *Intellectual Precursors of the Mexican Revolution, 1900-1913*. Austin,TX: University of Texas Press.

27. Cohn, Jesse. 2015 *Underground Passages*: *Anarchist Resistance Culture, 1848-2011*. Oakland, CA:AK Press.

28. Coles, Robert. 1973, *A Spectacle Unto the World*: *The Catholic Worker Movement*. New York:Viking.

29. Crowder, George.1991, *Classical Anarchism*: *The Political Thought of Godwin, Proudhon, Bakuninand Kropotkin*. Oxford, UK: Oxford University Press.

30. Cuddon, J.A, Habib, M.A.R, 2015, *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, USA, Penguin Books.

31. Curran, Giorel.,2006, *21st Century Dissent*: *Anarchism, Anti-Globalization, and Environmentalism*.New York: Palgrave Macmillan.

32. Cutler, Robert, ed 1985, . *From Out of the Dustbin*: *Mikhail Bakunin's Basic Writings, 1869-1871*.Ann Arbor, MI: Ardis.

33. Daring, C.B., J. Rogue, Deric Shannon, and Abbey Volcano, eds, 2010, *Queering Anarchism*:*Addressing and Undressing Power and Desire*. Oakland, CA: AK Press.

34. Dark Star Collective, eds. 2012, *Quiet Rumours*: *An Anarcha-Feminist Reader*. Oakland, CA: AKPress, 3rd ed.

35. Day, Richard J.F. 2005, *Gramsci is Dead*: *Anarchist Currents in the Newest Social Movements*.London: Pluto Press.

36. de Cleyre, Voltairine (Sharon Presley and Crispin Sartwell, eds.)2005 *Exquisite Rebel*: *The Essays of Voltairine de Cleyre—Anarchist, Feminist, Genius*. Albany, NY: State University ofNew York Press.

37. Dennison, George. 1969 *The Lives of Children*: *The Story of the First Street School*. New York:Random House.

38. Ellis, Marc. 1979 *A Year at the Catholic Worker*. New York: Paulist Press..

39. Ellsberg, Robert, ed. 1983, *By Little and By Little*: *The Selected Writings of Dorothy Day*. NewYork: Alfred A. Knopf.

40. Ellul, Jacques (Geoffrey W. Bromiley, tr.) 1991, *Anarchy and Christianity*. Grand Rapids, MI:Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

41. *Encyclopedia Britannica* (Vol. I), 1974, USA.

42. Esenwein, George. 1989 *Anarchist Ideology and the Working-Class Movement in Spain, 1868-1898*.Berkeley, CA: University of California Press.

43. Falk, Candace. *Love, 1984 Anarchy, and Emma Goldman*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

44. Farrell, James J. 1997, *The Spirit of the Sixties*: *The Making of Postwar Radicalism*. New York:Routledge.

45. Gallagher, Dorothy. 1988, *All the Right Enemies*: *The Life and Murder of Carlo Tresca*. NewBrunswick, NJ: Rutgers University Press.

46. Gambs, John S. 1932, *The Decline of the I.W.W*. New York: Columbia University Press.

47. Gans, Chaim., 1992, *Philosophical Anarchism and Political Disobedience*. Cambridge, UK:Cambridge University Press.

48. Garner, James. 2016, *Goals and Means*: *Anarchism, Syndicalism, and Internationalism in the Originsof the* Federación Anarquista Ibérica. Oakland, CA: AK Press.

49. Glassgold, Peter, ed. 2012, *Anarchy*! *An Anthology of Emma Goldman's* Mother Earth. Berkeley,CA: Counterpoint.

50. Godwin, William (Isaac Kramnick, ed.), 1976, *Enquiry Concerning Political Justice* (3rd ed.)Harmondsworth, England: Penguin Press.

51. Halperin, Joan. 1988, *Félix Fénéon, Aesthete and Anarchist in Fin de Siècle Paris*. New Haven, CT:Yale University Press.

52. Hart, John M. 1987, *Anarchism & The Mexican Working Class, 1860-1931*. Austin, TX: Universityof Texas Press.

53. Haworth, Robert H., ed., 2012, *Anarchist Pedagogies*: *Collective Actions, Theories, and CriticalReflections on Education*. Oakland, CA: PM Press.

54. Illich, Ivan. 1971, *Deschooling Society*. New York: Harper & Row.

55. Jensen, Derrick. 2006, *Endgame*, Vol. 2: *Resistance*. New York: Seven Stories Press,

56. Joll, James. 1980, *The Anarchists*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2nd ed.,.

57. Kinna, Ruth, ed.2012, *The Bloomsbury Companion to Anarchism*. New York: BloomsburyAcademic.

58. Klein, Hilary. Compañeras: 2015, *Zapatista Women's Stories*. New York: Seven Stories Press.

59. Knapp, Michael, Anja Flach, and Ercan Ayboga (Janet Biehl, tr.), 2016, *Revolution in Rojava*: *Democratic Autonomy and Women's Liberation in the Syrian Kurdistan*. London: Pluto Press.

60. Kozol, Jonathan. 1972, *Free Schools*. Boston, MA: Houghton Mifflin Co.

61. Marshall, Peter, 2008, *Demanding the Impossible, A History of Anarchism*, London, Harper Pernnial.

পত্র-পত্রিকা :

১. দাসাধিকারী, স্বপন (সম্পা.), ২০০৭, 'ধ্বংস ও নির্মাণ : পোষ্টমডার্নিজম এবং ঞগুগি', *এবং জলার্ক,* কলকাতা, এবং জলার্ক প্রকাশনা।

২. নিয়োগী, সঞ্জীব, উপাধ্যায়, পার্থসারথী (সং.), *বিনির্মাণ-১৮,* 'বিষয় অরুণেশ ঘোষ', মুর্শিদাবাদ, বিনির্মাণ যৌথ পরিবার।

৩. ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পা.), ১৪১৮, গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ-আত্মকথা-সাক্ষাৎকার-আলোচনা-স্মৃতিচারণায় অরুণেশ ঘোষ স্মরণ, *কবিতীর্থ,* কলকাতা।

৪. ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পা.), ১৪২৬, 'মলয় রায়চৌধুরী', *কবিতীর্থ,* ৬৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা।

৫. ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পা.), ১৪২৭, 'উদয়ন ঘোষ শম্ভু রক্ষিত মৃতুভাবনা কবিতা কথা আলেখ্য', *কবিতীর্থ,* কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা।

৬. মিশ্র, বৈদ্যনাথ (সম্পা.), ২০১৫, 'ফাল্গুনী রায় সমগ্র এবং কিছু লেখালেখি', *চন্দ্রগ্রহণ,* বসন্ত সংখ্যা, কলকাতা।

৭. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০০৯, 'প্রতিবাদের সাহিত্য ও প্রত্যাখ্যানের ভাষা', *কারুবাসনা,* দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা।

৮. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০১২, *আভাঁগার্দ,* কলকাতা, কারুবাসনা প্রকাশনী।

৮. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০১৮-২০১৯, 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন', *কারুবাসনা,* তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, কারুবাসনা পাবলিশিং।

৯. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০০৮, শৈলেশ্বর ঘোষ সংখ্যা, *কারুবাসনা,* ১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা।

১০. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ১৪১৮, 'নৈরাজ্য', *কারুবাসনা,* ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা, কলকাতা, ৬১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট।

১১. রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পা.), ২০১৩, 'পোস্টমডার্ন গদ্য-কবিতা-প্রবন্ধের প্রাঙ্গনপত্র', *হাওয়া ৪৯,* কলকাতা, হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী।

১২. হালদার, রঞ্জন স্বপন (সম্পা.), ২০১৭, সুভাষ ঘোষ সংখ্যা, *বাঘের বাচ্চা ৩,* কলকাতা।

১৩. হালদার রঞ্জন স্বপন (সম্পা.), ২০১৬, বাসুদেব দাশগুপ্ত সংখ্যা, *বাঘের বাচ্চা ২,* , কলকাতা।